পরিচয়

বৈদিক ভৌতিকী

(বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ গ্রন্থের সার)

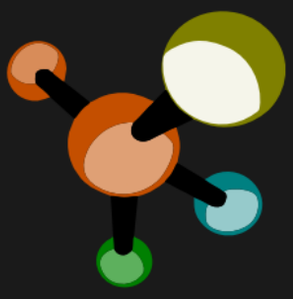

বিশাল আর্য

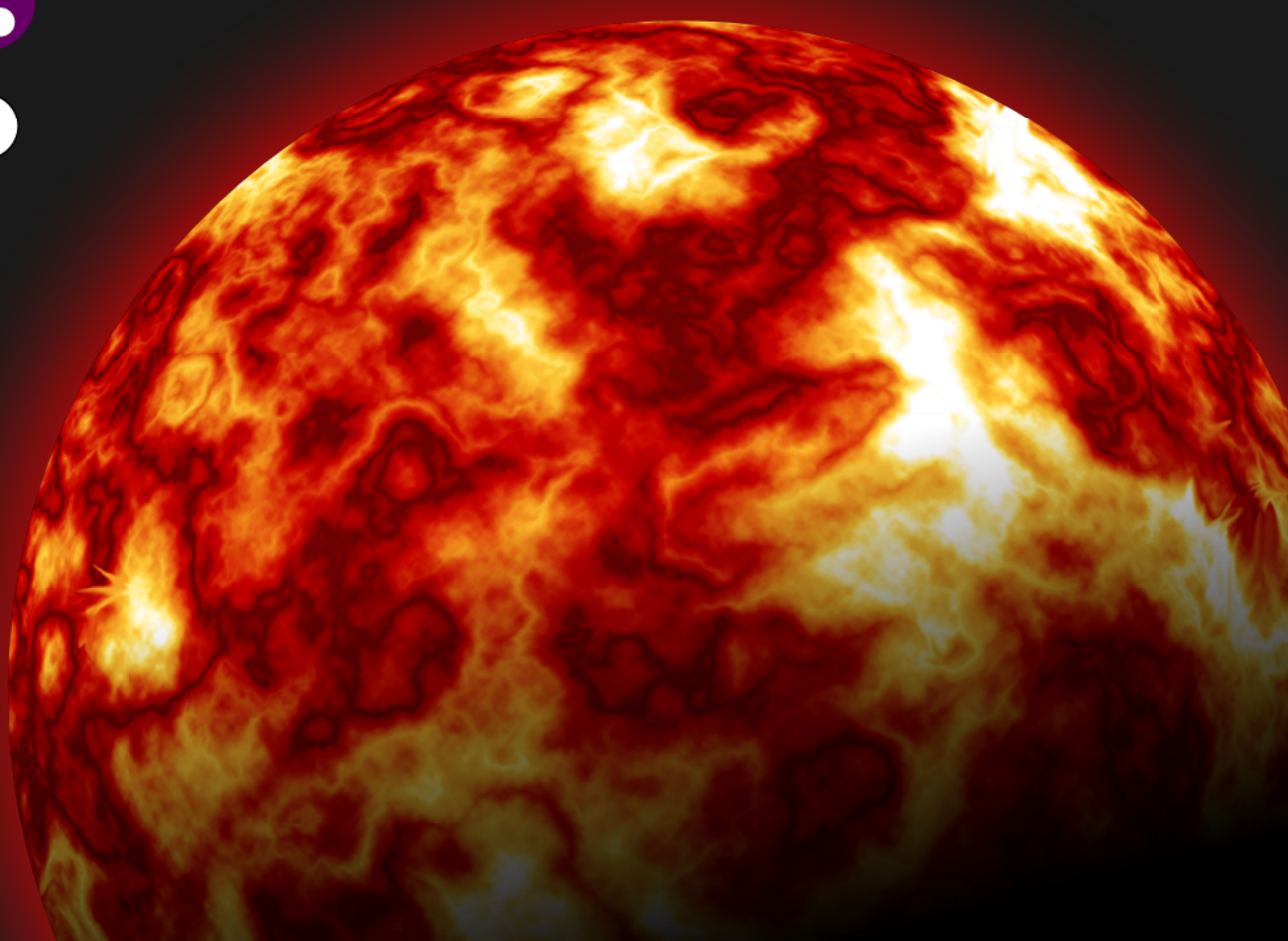

ওঽম্

পরিচয়

বৈদিক ভৌতিকী

(বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ গ্রন্থের সার)

লেখক

বিশাল আর্য

উপাচার্য, বৈদিক এবং আধুনিক ভৌতিকী শোধ সংস্থান

(শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস দ্বারা সঞ্চালিত)

অনুবাদক

আশীষ আর্য

দ্য বেদ সায়েন্স পাবলিকেশন

ভীনমাল (রাজস্থান)

প্রথম সংস্করণ বর্ষ 2021
দ্বিতীয় সংস্করণ বর্ষ 2026

পৌষ শুক্ল প্রতিপদা, বিক্রম সম্বত্ ২০৭৭
14 জানুয়ারি 2021

Copyright © 2021 Vishal Arya

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the writer, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright act 1957 and rules 1958 copyright law. To request permission, write to the publisher at the address below.

This book must not be circulated in any other binding/cover.

সম্পাদন এবং ডিজাইনিং আদি : বিশাল আর্য

মূল্য : **₹600/-** (Paperback)
: **₹700/-** (Hardback)

প্রকাশক : **দ্য বেদ সাইন্স পাবলিকেশন**
বেদ বিজ্ঞান মন্দির, ভাগলভীম, ভীনমাল
জেলা – জালোর (রাজস্থান) – 343029
ওয়েবসাইট : www.thevedscience.com, www.vaidicphysics.org
ইমেল : thevedscience@gmail.com
সম্পর্ক সূত্র : 9530363300

শ্রদ্ধাপূর্ণ সমর্পণ

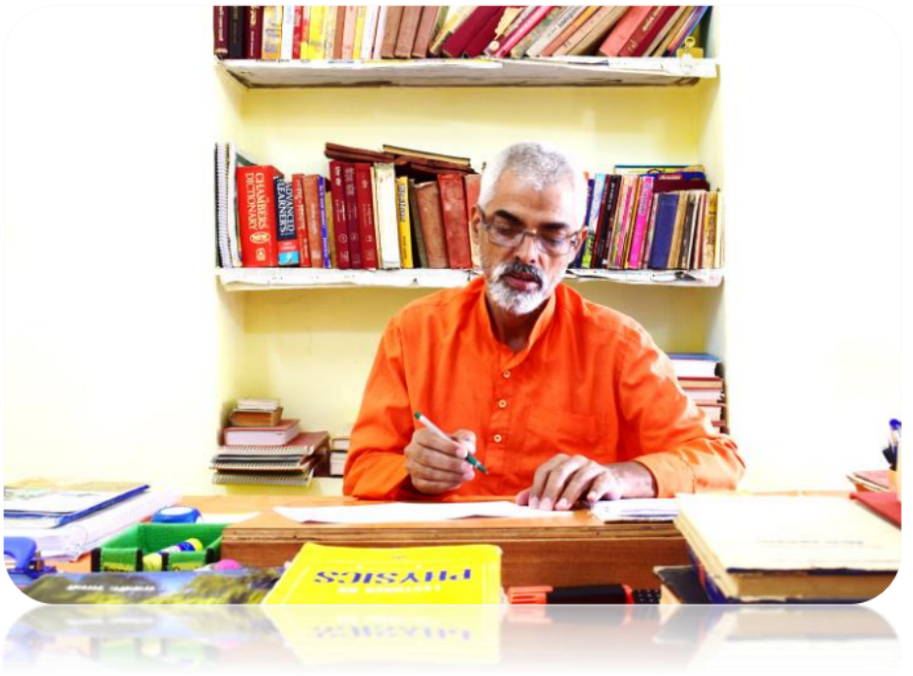

আমার পূজনীয় পিতামহ স্বর্গীয় শ্রীমান মহাশয় ইকরাম সিং জি চৌধুরীর স্মৃতিতে আমার ঋষিতুল্য গুরুদেব (পূজ্য আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক জি)-এর সেবায় আমি এই পুস্তকটি শ্রদ্ধার সাথে সমর্পিত করছি।

এর সাথে আমি এই পুস্তকটি বিশ্বের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ প্রজন্মকেও সমর্পিত করছি।

– **বিশাল আর্য**

আশীর্বচন

डॉ. सत्यपाल सिंह
संसद सदस्य (लोक सभा) बागपत, उत्तर प्रदेश
सभापतिः
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

सत्यमेव जयते

218, ब्लॉक 'बी', संसदीय सौध एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष: 011-23035739, 21410293
फैक्स : 011-21410294

सं.73/2020-21/91
जनवरी 25, 2021

শুভেচ্ছা বার্তা

এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে প্রিয় শ্রী বিশাল আর্য শ্রী আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক জি দ্বারা লিখিত বিশাল গ্রন্থ 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ'-এর উপর ভিত্তি করে তার সার রূপে এই পুস্তক 'পরিচয়-বৈদিক ভৌতিকী' লিখেছেন। এত বিশাল এবং অত্যন্ত জটিল গ্রন্থ পড়ে ও বুঝে তার থেকে সারমাত্রকে নিজের ভাষায় পরিবর্তন করে পুস্তকের রূপ দেওয়া খুব কঠিন কাজ।

এই লঘু, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটি বৈদিক ভৌতিকীর কেবল সেই বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করে না, যার মধ্যে কিছু বিষয়কে বর্তমান ভৌতিকী এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বোঝেনি, বরং এতে সৃষ্টির কিছু রহস্য বর্তমান উন্নত বলে বিবেচিত ভৌতিকী স্পর্শও করেনি। বর্তমান ভৌতিকীর যাত্রা ফোটন তথা কোয়ার্ক-ইলেকট্রন আদি মূলকণার উৎপত্তি থেকে শুরু হয়, কিন্তু এগুলোর উৎপত্তি কিভাবে ও কোন পদার্থ থেকে হয়, তার কোনো জ্ঞান বর্তমান ভৌতিকীর মধ্যে নেই। এই পুস্তকটির মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ বিদ্বান প্রিয় বিশাল আর্য এই বিষয়গুলো ছাড়াও কাল ও আকাশের মতো মৌলিক বিষয়ের উপরও আলোকপাত করেছেন, যা আধুনিক ভৌতিকীর উচ্চ স্তরীয় ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য আশ্চর্যের বিষয় হবে। আকাশ (স্পেস)-এর গঠন এবং তার উৎপত্তির পূর্বের কয়েকটি স্তরের ব্যাখ্যা, মূলকণা ও তরঙ্গাণুর উৎপত্তি, ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক উর্জা, বিদ্যুৎ আবেশ ও দ্রব্যমান থেকে শুরু করে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সমস্ত অধ্যায় সবার জন্য কৌতূহলের বিষয় হবে।

এই পুস্তকটি কেবল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্যই নয়, বরং বৈজ্ঞানিকদের জন্যও সৃষ্টির গভীর ও অমীমাংসিত রহস্য উদঘাটনে সহায়ক প্রমাণিত হবে, এমনটাই আমি আশা করি। এর সাথে আমি তরুণ লেখককে এটি লেখার জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জানাই।

25/1/2021
(ডাঃ সত্যপাল সিং)

निवास: 9, गुरूद्वारा रकाब गंज रोड, नई दिल्ली-110 001 • दूरभाष: 011-23015800, 07534006112 (मो.)

সম্মতিসমূহ

ডাঃ ভূপসিংহ

রিটায়ার্ড অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ভৌতিক বিজ্ঞান

ভিওয়ানি (হরিয়ানা)

প্রস্তাবিত পুস্তকটি হল আচার্য অগ্নিব্রত জীর **'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ'** গ্রন্থের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সারসংক্ষেপ। তরুণ বৈজ্ঞানিক শ্রী বিশাল আর্য দ্বারা এই পুস্তিকটি 10+1 থেকে স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের বেদ বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক অমীমাংসিত রহস্য সম্পর্কে বেদ বিজ্ঞান দ্বারা প্রদত্ত দিকনির্দেশনার মাধ্যমে **এই পুস্তকটি যেকোনো স্তরের বৈজ্ঞানিকের জন্য উপযোগী সিদ্ধ হবে, এটা নিশ্চিত।**

এই পুস্তকটি পড়ার আগে আমার একটি পরামর্শ আছে। যদি আপনি কার্য-কারণ সিদ্ধান্তকে বিশ্বাস করেন এবং এটিও বিশ্বাস করেন যে, যেকোনো কাজের তিন প্রকার কারণ যথা উপাদান কারণ (Material Cause), নিমিত্ত কারণ (Instrumental Cause) এবং সহায়ক কারণ (Helping Cause) থাকে, তাহলে এই পুস্তকটি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ক্রিয়া থেকে সৃষ্টি রচনা পর্যন্ত এবং তারপর রচনা থেকে প্রলয় পর্যন্ত ঘটনাগুলোর সঠিক, নির্ভুল এবং স্পষ্ট বিবরণ উপস্থাপন করবে।

আধুনিক বিজ্ঞান তিনটি মৌলিক প্রশ্ন — 'কেন', 'কিভাবে' এবং 'কি উদ্দেশ্যে' এরমধ্যে কেবল 'কিভাবে' এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সেটিও নির্ভুল অর্থাৎ স্পষ্ট ও চূড়ান্ত সমাধান দেয় না। 'কেন' ও 'কি উদ্দেশ্যে' এই দুটো আধুনিক বিজ্ঞানের পরিধির বাইরে। স্পষ্টতই, কেন এবং কি উদ্দেশ্যে না জেনে 'কিভাবে' এর কি ব্যবহার হওয়া উচিত, সেটা জানা না থাকার জন্য 'কিভাবে' এর অপব্যবহার হওয়ার পুরো আশঙ্কা থাকে এবং বর্তমানে এমনটি হচ্ছেও। বেদ বিজ্ঞান এই তিনটি মৌলিক প্রশ্নের সঠিক, নির্ভুল ও চূড়ান্ত উত্তর দেয়, তাই বেদ বিজ্ঞানের অপব্যবহারের আশঙ্কা নগণ্য, এটি কল্যাণকরই হয়। **বেদ বিজ্ঞান নিশ্চিতরূপে কল্যাণকর তাই আধুনিক বিজ্ঞানের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ হয়।** যদি আপনি কার্য-কারণ সিদ্ধান্তকে বিশ্বাস না করেন, যেমন আধুনিক বিজ্ঞান তিনটি কারণের মধ্যে নিমিত্ত কারণ এবং কি উদ্দেশ্যে-কে উপেক্ষা করে চলে, তাহলে আপনার জন্য এই পুস্তকটি উপযোগী হবে না। আপনি নির্দ্বিধায়

এই পুস্তকটি না পড়তে পারেন।

‘বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ’ গ্রন্থ বেদের বিজ্ঞানকে উদ্ঘাটিত করে। বেদ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হওয়া, কেবল মানুষের জন্য নয়, বরং সমগ্র প্রাণীজগতের জন্য কল্যাণকর। এই পুস্তকটি সেই পথেরই একটি পদক্ষেপ। এই পুরুষার্থের জন্য তরুণ বৈজ্ঞানিক বিশাল আর্য প্রশংসা ও অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। আমাদের সকলের কর্তব্য হল, পুস্তকটি ব্যক্তি থেকে সংস্থা স্তর পর্যন্ত প্রচার করে মানব কল্যাণের কাজে অংশীদার হওয়া।

আমার বিশ্বাস, পুস্তকটি অবশ্যই তার গুরুত্ব স্থাপন করবে। শুভকামনা সহ...

— ডাঃ ভূপসিংহ

* * * * *

ডাঃ সন্দীপ কুমার সিংহ

বৈজ্ঞানিক এবং প্রফেসর,

জে. কে. লক্ষ্মীপত বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুর (রাজস্থান)

ভারতীয় ঋষি ঐতিহ্যের প্রতি আমার বিশ্বাস ছোটবেলা থেকেই ছিল। কিন্তু সঠিক নির্দেশনা না পাওয়ায় এবং সমাজে প্রচলিত পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের প্রভাবের কারণে নিজের শিক্ষা মডার্ন সায়েন্সের মাধ্যমে শেষ করার পর সুইডেনে বৈজ্ঞানিক হয়ে যাই।

সুইডেনের মধ্যে বিশ্ব সমস্যাগুলো, যেমন ক্লাইমেট চেঞ্জ, প্রদূষণ, এনার্জি ক্রাইসিস, অরিজিন অফ ইউনিভার্স নিয়ে কাজ করার সময় কোনো স্থায়ী সমাধানের দিক না দেখতে পেয়ে মন বিচলিত হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যবশত, আচার্য অগ্নিব্রত জীর সাথে দেখা করে এবং **বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ**-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়ে, জড় ও চেতন উভয় বিজ্ঞানকে একসাথে নিয়ে চলার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধানের পথ প্রশস্ত হল। আমি আজীবন আর্ষ গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও প্রচার করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি। আমার তো 35 বছর আয়ুতে সুইডেনে থাকাকালীন বৈদিক ফিজিক্স ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বৈদিক ভৌতিকীর সাথে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু **আপনাদের সব ছাত্রদের জন্য তো এটি সুবর্ণ সুযোগ যে এই জ্ঞান এই ছোট্ট পুস্তকের মাধ্যমে সহজ ভাষায় এবং এত কম আয়ুতে উপলব্ধ আছে।**

প্রিয় বিশাল আর্য জী বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য, যিনি **বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ** গ্রন্থের সার সংক্ষেপ পুস্তক তার অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। প্রতিটি অধ্যায় এক নতুন ক্ষেত্রের সরল এবং সচিত্র বর্ণনা করে নতুন দিক এবং গবেষণার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এই পুস্তকটি শিক্ষার্থী (11শ থেকে এম.এস.সি.), বৈজ্ঞানিক, সমাজ চিন্তক, ধর্মগুরু, সাধারণ মানুষ সকলকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। **এই পুস্তকটি বিশ্বের জন্য একটি গেম চেঞ্জার প্রমাণিত হবে, এটি আমার বিশ্বাস।** আমি এই পুস্তকটি বহুবার পড়েছি এবং যখনই পড়েছি, তখনই নতুন কিছু না কিছু শিখতে পেরেছি। **আমিও এই পুস্তক ও বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ পড়ে গ্রীন টেকনোলজির উপর কাজ করছি, যেটা যেকোনো প্রকারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হবে।**

— ডাঃ সন্দীপ কুমার সিংহ

* * * * *

ডাঃ সত্যেন্দ্র কাটারিয়া

Materials Scientist,
RWTH Aachen University, Germany

এটা আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, আচার্য অগ্নিব্রত জী নৈষ্ঠিকের গ্রন্থ **‘বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ’**-এর উপর ভিত্তি করে বিশাল আর্য দ্বারা লিখিত **‘পরিচয়- বৈদিক ভৌতিকী’**, যেটি নিজের প্রথম পুস্তক, সে সম্পর্কে আমার মতামত রাখার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি। এই পুস্তকটি প্রকৃতপক্ষে ভৌতকীর মূল সিদ্ধান্তগুলোকে তুলে ধরার একটি অনন্য প্রচেষ্টা, যা আধুনিক বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমের পুস্তকগুলোতে এবং এমনকি পেশাদার মৌলিক বিশেষ গবেষণার ক্ষেত্রেও উপলব্ধ নয়। এই পুস্তক সাধারণ পাঠকদের সামনে আমাদের বেদের মধ্যে নিহিত বিজ্ঞানকে খুব সরলভাবে উপস্থাপন করে, যেটি মুঘল আক্রমণকারী এবং ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারতীয় গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থার পতনের মতো অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

এই পদার্থবাদী জগতে মানুষের সমগ্র জীবন এবং বেদের জ্ঞান এই গুরুকুল শিক্ষার মূলে নিহিত আছে। স্বাধীনতার পরেও ভারত সরকার এখানকার মূলনিবাসীদের বিরুদ্ধে অনেক অনৈতিক আইন এনে আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আঘাত করে অনেক ক্ষতি করেছে এবং ‘একটি স্বর্ণালী ভারত’-এর ভিত্তিও নষ্ট করে দিয়েছে। আজ আমরা সবাই অবনতিশীল ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থার ফসল হয়ে আছি। আর্যভূমি ভারতের সনাতন বিদ্যার তথ্য আমরা তখনই জানতে পারি যখন আমরা নিজেরাই আমাদের শিক্ষামূলক সাহিত্য পড়ি।

এই পুস্তকের বিষয়বস্তু আচার্য অগ্নিব্রত জীর ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বৈজ্ঞানিক ভাষ্য তথা কয়েক বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত **‘বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত’**-এর উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত এই সৃষ্টির সুশৃঙ্খল নির্মাণকে তুলে ধরে এবং বর্তমান সন্দেহজনক বিগ-ব্যাং সিদ্ধান্তকে ফাঁস করে। এটি ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তথা ব্ল্যাক ম্যাটার (যা বর্তমান বিজ্ঞান অনুসারে সমগ্র মহাবিশ্বের 99% অংশ) ব্যাখ্যা করে।

এই পুস্তক পাঠকদের **প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন মৌলিক বল, প্রধানত গুরুত্বাকর্ষণ বল, যা বর্তমান পাশ্চাত্য (ব্যর্থ) বিজ্ঞানের জন্য আজও একটি রহস্য, সে**

সম্পর্কে বোঝায়। এটি চার্জ বা আধানের সাথে পরিচয় তথা আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল, যেমন গুরুত্বাকর্ষণ এবং ঘর্ষণ বলের মতো বলের উৎস সম্পর্কে বলে। এই পুস্তকের একটি অধ্যায় গুরুত্বাকর্ষণ বলের উপর আছে, যেটা সঠিকভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ধরণের তথ্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য — সৃষ্টি নির্মাণ থেকে মানবদেহের কার্যপ্রণালী পর্যন্ত অত্যন্ত উপযোগী। ফোটন এবং অন্য সূক্ষ্ম কণা সম্পর্কিত পাঠ খুবই বিস্ময়কর এবং আকর্ষণীয়, যা ফোটন এবং অন্যান্য সূক্ষ্ম কণার অস্তিত্বের রহস্য উন্মোচন করে। ফোটনের শোষণ এবং নির্গমন খুব স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি গবেষণার এক অত্যন্ত জ্বলন্ত বিষয়, যেখানে প্রকাশ এবং পদার্থের পরস্পর ক্রিয়ার অধ্যয়ন করা হয় আর এটিই হল বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির মেরুদণ্ড।

এছাড়াও, জটিল আধুনিক গণিতীয় সমীকরণ ছাড়াই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরি এবং তাদের গতির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত আমাদের বলা হয়েছে যে কোনো পদার্থের গতি আলোর চেয়ে দ্রুত হতে পারে না, কিন্তু এই পুস্তক পড়ে অবাক হতে হয় যে ধনঞ্জয় রশ্মির গতি আসলে আলোর চেয়েও বেশি। **একজন আধুনিক পদার্থ বৈজ্ঞানিক এবং বর্তমান গবেষণার বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণে, আমি বলতে পারি যে এই ধরণের দাবি নিয়ে গবেষণার সম্ভাবনা আছে।**

পরিশেষে মহাপ্রলয় (ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ) প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি আমাদের জীবদ্দশায় ঘটবে কিনা, তবে ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ এবং সত্য জ্ঞানের জন্য আমাদের সকলকে এর পেছনের ভৌতিক প্রক্রিয়াকে জানা উচিত।

এটা মনে রাখা উচিত যে, পদার্থ এবং বস্তু পর্যালোচনা করার আধুনিক প্রযুক্তির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে। উদাহরণস্বরূপ, ইলেকট্রনগুলো ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে পদার্থের পারমাণবিক কাঠামো দেখতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, যদি কেউ ইলেকট্রন দেখতে চায়, তাহলে কি দিয়ে দেখবে? এখানে এসে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান থেমে যায়, এবং কেউ জানে না এরপর কি করতে হবে? অতএব, যদি কেউ একটি সূক্ষ্ম (ছোট) বস্তুকে জানতে চায়, তাহলে পরীক্ষা করার যন্ত্রটি আরও সূক্ষ্মতর হতে হবে। আজ, বিশ্ব কোয়ান্টাম প্রযুক্তির দিকে এগোচ্ছে, যেখানে কোয়ান্টাম অবস্থা, যা এখনও অনির্ধারিত, তার ব্যবহার নতুন প্রযুক্তি বিকাশের জন্য করা হবে। তাই, এটি প্রয়োজনীয় যে ছাত্র এবং গবেষকরা প্রথমে পদার্থ, পরমাণু, ইলেকট্রন এবং অন্যান্য মৌলিক কণার বাস্তব প্রকৃতিকে জানুক। **এই পুস্তক নিশ্চিতভাবে বর্তমান বিজ্ঞান (ভ্রমিত বিজ্ঞান)-এর**

ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে।

এই পুস্তকের প্রথম প্রারূপ থেকে আমি ভৌতিকীর মূল সিদ্ধান্তের গভীরতা তথা নিজের চারপাশের বিজ্ঞানকে অনুভব করতে পারি। এই মুহূর্তে বৈদিক রশ্মি থিয়োরি তার যেকোনো সিদ্ধান্তকে প্রমাণ করার জন্য কোনো গাণিতিক সমীকরণের সাহায্য নেয় না, কিন্তু আমাদের এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সমস্ত ধারণা একটি সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনার সাথেই শুরু হয়। এই পুস্তক সকল ছাত্র, তরুণ এবং পুরোনো প্রজন্মের গবেষকদের মানুষের কিছু মৌলিক প্রশ্ন সমাধানে সহযোগিতা করার জন্য এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র প্রদান করবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই পুস্তক এবং আচার্য জী ও বিশাল আর্যের সাথে আমার সম্পর্ক থেকে অনেক কিছু শিখেছি। **আমি বিশ্বাস করি যে এই পুস্তকটি আমাদের সহস্রাব্দ পুরোনো নিত্য এবং সত্য জ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করার সূচনা হবে, যা একদা এই মহান ভারতের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল।**

আমি পুস্তকটি সাফল্য কামনা করি এবং এটি তৈরিতে নিঃস্বার্থভাবে জড়িত সকল মানুষের উৎসর্গের প্রশংসা করি।

— ডাঃ সত্যেন্দ্র কাটারিয়া

* * * * *

অনুক্রমণিকা

0 ভূমিকা এবং প্রস্তাবনা i-vii

1 পরিভাষা 1

2 সৃষ্টির জ্ঞান কেন প্রয়োজনীয় ? 8

2.1 সৃষ্টির মূল কারণ
2.2 সৃষ্টি একটি অতি বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ রচনা
2.3 সৃষ্টির মধ্যে অনিশ্চিত কিছুই নেই
2.4 সৃষ্টি বিজ্ঞানের ব্যাপকতা
2.5 সৃষ্টি বিজ্ঞানের ইতিহাস
2.6 সৃষ্টিকে কেন জানবো ?

3 ব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভিক অবস্থা 20

3.1 বর্তমান বিজ্ঞানের সমীক্ষা
3.2 সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থার জ্ঞান থাকার আবশ্যকতা
3.3 প্রকৃতি
3.4 প্রকৃতির স্বরূপ
3.5 প্রকৃতির গুণ

4 কাল কি ? 32

4.1 বর্তমান বিজ্ঞানে সময়ের ধারণা
4.2 বর্তমান বিজ্ঞানের 'সময়'-এর সমীক্ষা

4.3 কালের বৈদিক ধারণা
4.4 কালের উৎপত্তি
4.5 কালের স্বরূপ
4.6 কাল কা ক্রিয়া বিজ্ঞান
4.7 সময় যাত্রা (টাইম ট্রাভেল) কি সম্ভব ?

5 সৃষ্টি উৎপত্তির প্রারম্ভিক পর্যায় 43

5.1 মহৎ তত্ত্ব
5.2 অহংকার
5.3 মনস্তত্ত্ব
5.4 মনস্তত্ত্বে স্পন্দনের প্রক্রিয়া

6 রশ্মি এবং তাদের গুণাবলী 49

6.1 অক্ষর রশ্মি
6.2 প্রাণ ও ছন্দ তত্ত্ব
6.3 ছন্দ রশ্মির 7 প্রকারের প্রভাব
6.4 রশ্মিগুলোর সংযোগ প্রক্রিয়া
6.5 রশ্মিগুলোর সংখ্যা সীমিত বা অসীম

7 ছন্দ রশ্মির শ্রেণীবিভাগ 67

7.1 ভূমিকা
7.2 প্রথম প্রকারের শ্রেণীবিভাগ
7.3 দ্বিতীয় প্রকারের শ্রেণীবিভাগ
7.4 ছন্দ রশ্মির আটটি বিভাগ
7.5 ছন্দের অন্যান্য উপভেদ
7.6 রশ্মির ছন্দ কীভাবে নির্ণয় করবেন ?
7.7 রশ্মির পরিবর্তন হওয়া

8 আকাশ 78

8.1 আকাশের উৎপত্তি
8.2 আকাশের স্বরূপ
8.3 দিকসমূহের স্বরূপ

9 বিভিন্ন প্রকারের বল 84

9.1 বলের স্বরূপ
9.2 বলের প্রকার
9.3 বল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য
9.4 একীভূত (ইউনিফাইড) বল

10 গুরুত্ব বল 92

10.1 ভূমিকা
10.2 গুরুত্বাকর্ষণের সার্বজনীন নিয়ম
10.3 গুরুত্বাণু (গ্র্যাভিটন)
10.4 সৃষ্টিতে গুরুত্ব বলের উৎপত্তি প্রারম্ভ

11 আবেশ-এর স্বরূপ 99

11.1 বিদ্যুৎ আবেশ
11.2 আবেশ-এর কারণ
11.3 ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আবেশের মধ্যে পার্থক্য
11.4 বিপরীত আবেশের মধ্যে আকর্ষণের প্রক্রিয়া
11.5 সমান আবেশযুক্ত কণাগুলোর মধ্যে বিকর্ষণের ক্রিয়াবিজ্ঞান
11.6 তার পর আরও কিছু আছে...

12 তরঙ্গাণু ও মূলকণার উৎপত্তি 107

12.1 তরঙ্গাণু ও মূলকণার সংক্ষিপ্ত স্বরূপ
12.2 বায়ুতত্ত্ব (ভ্যাকুয়াম ঊর্জা) থেকে মূলকণা ও তরঙ্গাণুর নির্মাণ

12.3 প্রকাশাণু নির্মাণ
12.4 মূলকণা তৈরির প্রক্রিয়া
12.5 আসুন, এই প্রক্রিয়াকে আরও গভীরভাবে জেনেনিই
12.6 মূল কণাগুলোর গঠন
12.7 কণাসমূহের নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণন
12.8 কণাসমূহের সংযোগ প্রক্রিয়া
12.9 সৃষ্টির সর্বাধিক গতিশীল তত্ত্ব
12.10 জ্ঞাত সৃষ্টির সর্বাধিক ভেদন-ক্ষমতাসম্পন্ন কণা
12.11 কণার চারদিকে সূক্ষ্ম রশ্মির আবরণ

13 ঊর্জা 123

13.1 ঊর্জার স্বরূপ

14 অসুর পদার্থ এবং অসুর ঊর্জা 131

14.1 অসুর পদার্থের স্বরূপ
14.2 ডার্ক ম্যাটারের সমরূপ পদার্থ
14.3 অসুর পদার্থের শ্রেণিবিভাগ
14.4 আসুরী ঊর্জা (কথিত ডার্ক এনার্জি)
14.5 দুটি কণার মধ্যে বিকর্ষণের কারণ
14.6 অত্যল্প সময়ের জন্য আপেক্ষিকতার লঙ্ঘন

15 দ্রব্যমান এবং তার কারণ 140

15.1 আধুনিক বিজ্ঞানের মতে দ্রব্যমান
15.2 দ্রব্যমানের (Mass) বৈদিক স্বরূপ
15.3 দ্রব্যমান ও ঊর্জার সংরক্ষণ সিদ্ধান্ত

16 তরঙ্গাণু 145

16.1 আলোর দ্বৈত (তরঙ্গ-কণা) প্রবৃত্তি
16.2 কণার চারপাশে দুটি আবরণ

16.3 তরঙ্গাণু এবং ইলেকট্রনের সংযোগ-বিয়োগের ক্রিয়াবিজ্ঞান
16.4 বিভিন্ন কণা ও তরঙ্গাণুসমূহের গতিবিধি
16.5 প্রকাশাণু (ফোটন)-এর গঠন
16.6 কম্পটন প্রভাব
16.7 ফটো ইলেকট্রিক প্রভাব
16.8 তরঙ্গাণুর অভ্যন্তরে সূত্রাত্মা বায়ুর ব্যাপ্তি
16.9 কণার সংযোগের নিয়ম

17 নক্ষত্রের নির্মাণ 158

17.1 দুই ধরণের জগৎ
17.2 নক্ষত্রের গঠন
17.3 নক্ষত্রের পাঁচটি ক্ষেত্র
17.4 নক্ষত্রের ভেতরে পাঁচ প্রকারের বল এবং পদার্থ
17.5 কণা ও প্রতিকণার সংযোগে ঊর্জা উৎপাদনের ক্রিয়াবিজ্ঞান
17.6 নক্ষত্রের নির্মাণ
17.7 কণা এবং নক্ষত্রের মধ্যে সাদৃশ্য
17.8 আমাদের সূর্যের কেন্দ্রের ব্যাসার্ধ
17.9 ব্রহ্মাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ সপ্তক

18 বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ 171

18.1 তরঙ্গের বিভাগ
18.2 তিন প্রকারের অতি দ্রুতগামী পদার্থ
18.3 বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তি
18.4 তরঙ্গের সুপার পজিশনের ক্রিয়াবিজ্ঞান

19 মহাপ্রলয় 177

19.1 সৃষ্টি-প্রলয়ের প্রবাহমান চক্র
19.2 মহাপ্রলয়ের প্রক্রিয়া

ভূমিকা

মনুষ্য অথবা মনুষ্য সদৃশ কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী যখন থেকে এই ব্রহ্মাণ্ডে জন্মেছে, তখন থেকেই তার মধ্যে এই কৌতূহল অবশ্যই জেগেছে যে এই ব্রহ্মাণ্ড কী? কীভাবে তৈরি হয়েছে? কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে? এবং কীভাবে ধ্বংস হয়? ব্রহ্মাণ্ডের এই বিজ্ঞানে সমস্ত লোক-লোকান্তর, প্রাণীদের শরীর এবং উদ্ভিদের সম্পূর্ণ বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত আছে। ভারতীয় সনাতন মান্যতার অনুসারে বেদ হল ততটাই প্রাচীন, যতটা মানব অথবা অন্য কোনো লোকে বসবাসকারী মানুষের মতো কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী। বেদ হল এক ব্রহ্মাণ্ডীয় গ্রন্থ, যা সম্পূর্ণ সৃষ্টির জন্য সর্বদাই এক থাকে। বেদ হল সেই মন্ত্রগুলোর সমূহ, যেগুলোর স্পন্দন রূপ থেকেই সম্পূর্ণ সৃষ্টি তৈরি হয়েছে। এই কারণে সৃষ্টি সম্পর্কে যে জ্ঞান সম্পূর্ণতার সাথে বেদে পাওয়া যেতে পারে, তেমন পূর্ণ জ্ঞান মানুষের পক্ষে কখনো হওয়া সম্ভব নয়। বেদ হল সেই চেতন শক্তির রচনা, যা সম্পূর্ণ সৃষ্টিকেও রচনা করেছে এবং তাকে সঞ্চালিতও করছে। এই কারণে বেদ এবং সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্বয় আছে। এই কথাই **মহর্ষি বেদব্যাস** তাঁর **ব্রহ্মসূত্রে** এইভাবে লিখেছেন —

তত্তু সমন্বয়াত্ (1.1.4)

বেদের জ্ঞান হল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ এবং যথার্থ। এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই সম্পূর্ণ বিশ্বের মধ্যে জ্ঞান এবং ভাষা উভয়েরই উদ্ভব হয়েছে। ভাষা এবং জ্ঞান কোনো কল্পিত বিকাশের ফল নয়। এর জন্য আমার গ্রন্থ 'বেদবিজ্ঞান আলোকঃ' পাঠযোগ্য। এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই প্রাচীনকালে সম্পূর্ণ বিশ্বের মানব সমাজ সুখী, সুস্থ এবং সমৃদ্ধ ছিল, কেবল মানব সমাজই নয়, প্রাণীকূলও সুখপূর্বক জীবনযাপন করতো। ইতিহাসের মধ্যে যেখানে দুঃখ, হিংসা, অনাচার আদির বর্ণনা পাওয়া যায়, তা কেবল বেদের জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে না বোঝার কারণেই উৎপন্ন হতো। মহাভারতকাল অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষ (যাকে পূর্বে আর্যাবর্ত বলা হতো) জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধন সম্পত্তির দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এবং বিশ্বের মধ্যে জগদ্গুরু ও চক্রবর্তীর মতো সম্মান পেতো। তবে হ্যাঁ, এটি ভিন্ন কথা যে মহাভারত যুদ্ধের কিছু শতাব্দী পূর্ব থেকে বেদ জ্ঞান কিছুটা বিকৃত রূপে প্রচলিত হওয়ায় সামাজিক কাঠামোও জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক দোষেরও সৃষ্টি হয়েছিল। তবুও সম্পূর্ণ বিশ্বের জন্য জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস কেবল বেদই ছিল।

বর্তমানে প্রচলিত কোনো সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ সেই সময় কোথাও ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত মহাভারত কালের পরে এমন বিনাশ হল যে বেদবিদ্যা ধীরে-ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়, কারণ বেদের পঠন-পাঠন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং বিশ্বে নতুন-নতুন মত-মজহাব উৎপন্ন হতে থাকার কারণে মানবতা খণ্ড-খণ্ড হয়ে যায়। এত কিছুর পরেও মধ্যকালীন ভারতে অনেক বৈজ্ঞানিক, যাদের মধ্যে আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য, ব্রহ্মগুপ্ত, নাগার্জুন, চরক, সুশ্রুত প্রমুখ প্রধান, জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সময়ে ইউরোপ আদি দেশেও সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রমুখ দার্শনিক উৎপন্ন হয়েছিলেন। এরপরে বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরও উদয় হয়। একে আমরা কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিও থেকে শুরু বলে মানতে পারি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত উচ্চ বিকশিত ভৌতিকী, যার উপর আজ সমগ্র বিশ্ব গর্ব করে এবং এর সামনে বেদ আদি শাস্ত্র এবং মধ্যকালীন বৈজ্ঞানিকদের কেবল উপেক্ষাই নয়, বরং তাদের প্রচুর নিন্দাও করে, তারই সাম্রাজ্য চলে আসছে।

যদিও আমাদের এটা মানতে কোনো দ্বিধা নেই যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা অত্যন্ত পুরুষার্থ করেছেন এবং করছেনও, কিন্তু আমাদের কি এই সত্যের বোধ হওয়া উচিত নয় যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আজ পর্যন্ত এমন কোনো প্রযুক্তি তৈরি হয়নি, যার কোনো না কোনো কুপ্রভাব নেই? এমন কোনো ওষুধ নেই, যার কোনো কুপ্রভাব নেই। আজ জল, স্থল, বায়ু, নভ এবং মনস্তত্ত্ব সবই বিষাক্ত হয়ে গেছে। এই ভূমিতে কি এমন কোনো স্থান বাকি আছে, যেখানে কেউ সুখী এবং সুস্থ থাকতে পারে? এর থেকে কি এটা স্পষ্ট হয় না যে এই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মধ্যে কোনো-না-কোনো এমন মৌলিক ও গম্ভীর দোষ আছে, যার কারণেই বর্তমান বিজ্ঞান কেবল মানুষকে নয় বরং প্রাণীকূলকে বিনাশের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

আমার দৃষ্টিতে এই সবের কারণ হল বর্তমান বিজ্ঞান সৃষ্টির পদার্থগুলোকে সর্বাঙ্গীণভাবে জানার চেষ্টাই করে না। এটি চেতনার অস্তিত্বকে কোনো কিছু না ভেবেই সরাসরি অস্বীকার করে দেয়। এই কারণে এটি অনেক গুরুতর সমস্যায় ফেঁসে আছে। কিন্তু তার জেদ এবং অহংকার তাকে চেতনার চিন্তাভাবনার দিকে যেতে বাধা দেয়। এর পাশাপাশি আজকের মানুষ নিজেকেই সর্বোপেরি মনে করে বিজ্ঞানকে ব্যবসার সাথে যুক্ত করছে, যার কারণে সংসারের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত এবং অনেক অনাবশ্যক প্রযুক্তির নিরন্তর আবিষ্কার হচ্ছে, যার মাধ্যমে কিছু চালাক ব্যক্তি সংসারকে বোকা বানিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করছে। এইভাবে বর্তমানে বিজ্ঞান স্বার্থান্বেষী এবং অসুরবৃত্তির লোকের হাতের এমন এক অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা সমগ্র মানবজাতি

ও প্রাণীজগতের জন্য ঘাতক সিদ্ধ হচ্ছে। বর্তমানে এই অশুভ প্রবণতা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিশ্বের তথাকথিত কোনো প্রবুদ্ধ ব্যক্তিও এই বিষয়ে ভাবার ক্ষমতা রাখে না।

পাশ্চাত্য ভৌতিকীর মধ্যে গণিতীয় ব্যাখ্যা এবং প্রতিটি বিষয়কে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখার জেদের কারণে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির অভাবে অনেক ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং এই ধরণের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্যই ক্রমাগত নোবেল পুরস্কার আদি দেওয়া হচ্ছে। একে অপরের বিরোধী সিদ্ধান্তকেও পুরস্কৃত করা হচ্ছে এবং এতে চরম পক্ষপাতিত্বও হয়। সিদ্ধান্তের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া এবং এই মিথ্যাচারের চক্রকেই বিজ্ঞানের গতিশীলতা বলে গণ্য করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে, বিজ্ঞানের নামে এমন কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রচলিত। **বৈদিক দৃষ্টিতে সত্যের অপর নামই হল বিজ্ঞান এবং সত্য সর্বদা অপরিবর্তনীয় হয়। যদি কিছু পরিবর্তন হয়, তবে তার অর্থ হল সত্যকে পুরোপুরি বোঝা যায়নি। কিন্তু পরিবর্তনশীল কোনো তথ্যকে কখনোই সত্য বলা যায় না।**

এই পুস্তকে আমার প্রিয় শিষ্য শ্রী বিশাল আর্য (অগ্নিয়শ বেদার্থী) আমার গ্রন্থ 'বেদবিজ্ঞান-আলোক', যা অত্যন্ত জটিল ও বিশাল, গভীরভাবে পড়ে, সেটি মন্থন করে অমৃতরূপী মুক্তো বের করে এই পুস্তকের মাধ্যমে আপনাদের সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই পুস্তকটি কেবল ভৌতিকীর শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, বরং বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন যেকোনো বিষয়ের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে মহান বৈজ্ঞানিকদের পর্যন্ত মহাবিশ্বকে বোঝার জন্য এক নতুন দিশা প্রদান করবে। বর্তমান ভৌতিকীর এমন সব অমীমাংসিত ও জটিল সমস্যা, যেগুলোর বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক জগৎ কোটি-কোটি ডলার খরচ করেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছে না, সেগুলো বুঝতে এই পুস্তকটি প্রাথমিক পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি আশা করি। এই পুস্তকটি বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগৎকে সৃষ্টির পদার্থের যথার্থ জ্ঞানের দিকে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি চেতন শক্তির অস্তিত্ব ও তার স্বরূপ সম্পর্কেও ধারণা দিবে, যা বর্তমান বিজ্ঞানকে অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।

উল্লেখ্য যে, অপূর্ণতার ভিত্তিতে যে বিজ্ঞান বিশ্বের জন্য বিনাশকারী প্রমাণিত হচ্ছে, সেই বিজ্ঞানই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে কেবল মানবজাতিই নয় বরং সমগ্র প্রাণীজগতের জন্য কল্যাণকর পথে চলার জন্য প্রেরিত হবে। এই পুস্তকের আরেকটি সুবিধা হল, আজকের ভারতের তরুণ ও শিক্ষিত প্রজন্ম, যারা আজ বিজ্ঞানের নামে তথাকথিত অন্ধবিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হওয়ার পাশাপাশি ভারতের গৌরবময় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবহেলা ও নিন্দার

দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে এবং যারা তাদের আত্মসম্মান সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, তাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আত্মসম্মান এবং সত্য বিজ্ঞানের প্রকাশ হবে। এর মাধ্যমে দেশের যুবকদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেমের উদয় হবে, যার ফলে প্রবুদ্ধ শ্রেণী এই দেশকে আবার বিশ্বের মধ্যে জগৎগুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হবে। এই কথাও আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, দেশপ্রেমের অর্থ এটা কখনোই নয় যে আমরা কোনো অন্য দেশের অকারণে বিরোধী হবো, বরং আমাদের দেশের ঐতিহ্য হল যে আমরা সমগ্র বিশ্বকে আমাদেরই **একটি পরিবার** মনে করি। ভারতের চক্রবর্তী স্বরূপের এটাই একমাত্র গুণ ছিল। আমাদের দেশ কখনো সাম্রাজ্যবাদী ছিল না, বরং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সদ্ভাবনার প্রচারক এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিল। বৈদিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা ভারতের সেই হারিয়ে যাওয়া রূপকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে পারবো।

পরিশেষে আমি এই পুস্তকের লেখক প্রিয়বর শ্রী বিশাল আর্যকে হৃদয় থেকে আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ জানাই এবং সকল পাঠকের কাছে অনুরোধ করি যে, তারা যেন সমস্ত পূর্বসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে একবার মনোযোগ সহকারে এই পুস্তকটি সম্পূর্ণ পড়ে দেখেন। তারপর বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই পুস্তকে দেওয়া তথ্যগুলোর তুলনাও করে দেখেন। তারপর তাদের আত্মা যেমনটি উচিত মনে করবে, তেমনটি গ্রহণ করবেন। যে পাঠকরা বিষয়গুলোকে আরও গভীর-ভাবে বুঝতে চান, তাদের জন্য **বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ** গ্রন্থটি অবশ্যই পাঠযোগ্য।

আমার আশা, এই পুস্তকটি সকল পাঠকের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে এক আশ্চর্যজনক আলোর জন্ম দিবে, যা আমাদের ভিতরে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারকে দূর করতে সহায়ক হবে। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সত্যিকারের মানুষ হওয়ার শক্তি এবং যথার্থ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি প্রদান করুন। এই আশার সাথে...

— আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক
প্রধান, শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস
বৈদিক ও আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞান শোধ সংস্থান
বেদ বিজ্ঞান মন্দির, ভাগলভীম, ভীনমাল (রাজস্থান)

* * * * *

প্রস্তাবনা

আমার এই পুস্তকটি লেখার উদ্দেশ্য, আমার প্রিয় আর্যাবর্তই নয়, বরং সারা বিশ্বের তরুণ প্রজন্ম, যারা আমাদের ভবিষ্যৎ, তাদের সৃষ্টির শুরু থেকে চলে আসা তথা আমাদের ঋষি-মুনিরা যাকে আবিষ্কার ও সুরক্ষিত রেখেছেন, সেই বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় করানো।

এই পুস্তক আমি **'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ'** গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে লিখেছি, যা ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (প্রায় সাত হাজার বছরের পুরোনো গ্রন্থ) এর একটি বৈজ্ঞানিক ভাষ্য তথা যাকে **পূজ্য গুরুবর আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক জী** দশ বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর লিখেছেন। এই গ্রন্থের বিষয় হল সৃষ্টির উৎপত্তি। এতে প্রকৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির মূল অবস্থা থেকে শুরু করে নক্ষত্রের নির্মাণ হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞান আছে।

সাধারণত শিক্ষার্থীরা ভৌতিক বিজ্ঞান পড়তে ভয় পায়, কারণ তাদের কাছে গণিতের জটিলতা কঠিন মনে হয়। এই কারণে বর্তমান সময়ে গণিত বিদ্যাবিহীন ছাত্র, যারা প্রতিভাবান হলেও সৃষ্টিকে বোঝার তীব্র ইচ্ছা রাখে, তারা ভৌতিক বিজ্ঞান পড়তে পারে না। এটি পাশ্চাত্য পদ্ধতির একটি বড় ত্রুটি। অন্যদিকে, আমাদের বৈদিক ভৌতিকীর এই পুস্তকটি পড়ে গণিত না জানা সত্ত্বেও যুক্তি ও প্রতিভা সম্পন্ন ছাত্ররাও সৃষ্টিকে সেই গভীরতা পর্যন্ত বুঝতে পারবে, যেখানে পৌঁছাতে পাশ্চাত্য ভৌতিকীকে শতাব্দী লেগে যেতে পারে। বস্তুতঃ বিজ্ঞান তো একটাই হয়, যা সব দেশ ও সব কালে সবার কাছে একই মান্য হওয়া উচিত, কিন্তু মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে এর ব্যাখ্যা ভিন্ন-ভিন্নভাবে করা হয়েছে, এই কারণেই আমি এই পুস্তকে একে পাশ্চাত্য অথবা বৈদিক নাম দিয়ে সম্বোধন করছি।

কোনো পাঠক এই পুস্তকটি পড়ে যেন না ভাবেন যে বৈদিক ভৌতিকীর বিস্তার এতটুকুই। যাদের আরও বিস্তারিত জানার ইচ্ছা আছে, তাদের **বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ** পড়া উচিত। এর পরেও এটা বলা সত্য যে বেদবিজ্ঞান-আলোকঃও সম্পূর্ণ সৃষ্টির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করে না, কারণ কোনো মানুষই নিজে থেকে পূর্ণ হয় না। বৈদিক ভৌতিকীর অনেক শাস্ত্র বিদ্যমান আছে, তবে সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা এখনও বাকি আছে। এই কারণে বর্তমানে পাঠকরা এই পুস্তক এবং **বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ** পড়ার মাধ্যমে এতটাই জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যা তাদের বর্তমান ভৌতিকীর সীমানা থেকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আপনারা আমাদের

ইউটিউব চ্যানেল — বৈদিক ফিজিক্স-এ **'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ কক্ষা** নামে প্লে-লিস্টটিও দেখতে পারেন, যেখানে অনেক ভিডিও আছে। ভবিষ্যতেও আমরা এই বিষয়গুলোর ওপর ভিডিও তৈরি করতে থাকবো।

পরিশেষে, আমি আমার মেধাবী পাঠকদের অনুরোধ করবো যে তারা যেন এই পুস্তকটি নিরপেক্ষভাবে এবং মনোযোগ সহকারে পড়েন এবং এর উপর ভিত্তি করে গণিত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিকাশের চেষ্টা করেন। সেই সঙ্গে ধীরে-ধীরে এর ভিত্তিতে প্রযুক্তি বিকাশের সম্ভাবনাগুলোও খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। আমাদের সবাইকে মিলে এই মহান বৈদিক বিজ্ঞানকে মানবজাতির সুখের জন্য বিশ্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ এতে বিশ্বের প্রায় সব গুরুতর সমস্যার সমাধান বিদ্যমান আছে।

দ্রষ্টব্যঃ পাঠকরা যদি এই পুস্তকটি পূর্ণ সুবিধা নিতে চান, তবে তাদের অধ্যায়ের শেষে দেওয়া অনুশীলনী প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার এবং বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ করার চেষ্টা করা উচিত।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

সর্বপ্রথম আমি আমার পূজনীয় গুরুদেবের প্রতি অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞ, কারণ এই পুস্তকটিতে যা কিছু আছে তা তাঁরই দেওয়া বিজ্ঞান, যা তিনি তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ **বেদবিজ্ঞান-আলোক**-এ বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এই গ্রন্থ থেকে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই পুস্তক আকারে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এই পুস্তকটি লেখার প্রেরণা ও পথনির্দেশনা তাঁর কাছ থেকেই নিরন্তর পেয়েছি। এই বিষয়ে মাননীয় **শ্রীমান অশোক জী আর্য** (কার্যকারী অধ্যক্ষ, শ্রীমদ্ দয়ানন্দ সত্যার্থ প্রকাশ ন্যাস, উদয়পুর)-এরও বিশেষ প্রেরণা ছিল যে, বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য বৈদিক ভৌতিকীর উপর এমন একটি সহজ ও ছোট পুস্তক লেখা উচিত যা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাও বুঝতে পারে। একইভাবে এর জন্য **শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাসের প্রধান সংরক্ষক শ্রদ্ধেয় শ্রীমান ডাঃ সত্যপাল সিংহ জী** (কুলাধিপতি, গুরুকুল কাংড়ি বিশ্ববিদ্যালয়, হরিদ্বার; সাংসদ — বাগপত, উত্তরপ্রদেশ; প্রাক্তন উচ্চশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, ভারত সরকার এবং প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার — মুম্বাই) আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে কৃতার্থ করেছেন তথা যাঁর স্নেহ ও বাৎসল্য আমি সর্বদা পেয়েছি তথা এই ট্রাস্টের উপ-প্রধান **মাননীয় শ্রীমান দীনদয়াল জী গুপ্ত, কলকাতা, ন্যাসের মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ টি.সি. ডামোর**

সাহেব, উদয়পুর এবং সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভার প্রধান মাননীয় শ্রীমান সুরেশচন্দ্র জী আর্যও আমাকে এর জন্য সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি এবং **শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস-এর সমস্ত ট্রাস্টিদের** প্রতিও হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞ। আমি এঁদের সকলের থেকে সমর্থন পেয়েছি।

এরপর, আমি এই পুস্তকের উপর নিজের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি এর মূল্যায়ন করার জন্য আমার পিতৃতুল্য শ্রদ্ধেয় **ডাঃ ভূপ সিংহ** জী, অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ভৌতিকী, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য **ডাঃ সন্দীপ কুমার সিংহ** জী এবং **ডাঃ সত্যেন্দ্র কাটারিয়া** জী-কেও হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

— **বিশাল আর্য**

1 অধ্যায় পরিভাষা

সর্বপ্রথমে আমরা এই পুস্তকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাকে জানার চেষ্টা করবো, যাতে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আপনাদের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়।

বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত

বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত হল বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞানের সেই অঙ্গ, যার অধীনে বিভিন্ন ধরণের ছন্দ আদি রশ্মি অর্থাৎ কম্পন থেকে কণা, তরঙ্গাণু (কোয়ান্টা) এবং আকাশ (স্পেস) আদির সৃষ্টি প্রক্রিয়া, রচনা এবং তাদের গুণের অধ্যয়ন করা হয়। এর পাশাপাশি, এই সিদ্ধান্ত থেকে সৃষ্টির মূল অবস্থা থেকে শুরু করে নক্ষত্র নির্মাণ পর্যন্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। **এই সিদ্ধান্তটি বর্তমান ভৌতিকীর যেকোনো সিদ্ধান্তের চেয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বিস্তৃত এবং তর্ক সঙ্গত।** এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি হল ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যেটি হাজার-হাজার বছর পশ্চাৎ পূজ্য গুরুবর **আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক** জী কয়েক বছরের কঠোর সাধনার পর **বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ** রূপে স্থাপন করেছেন।

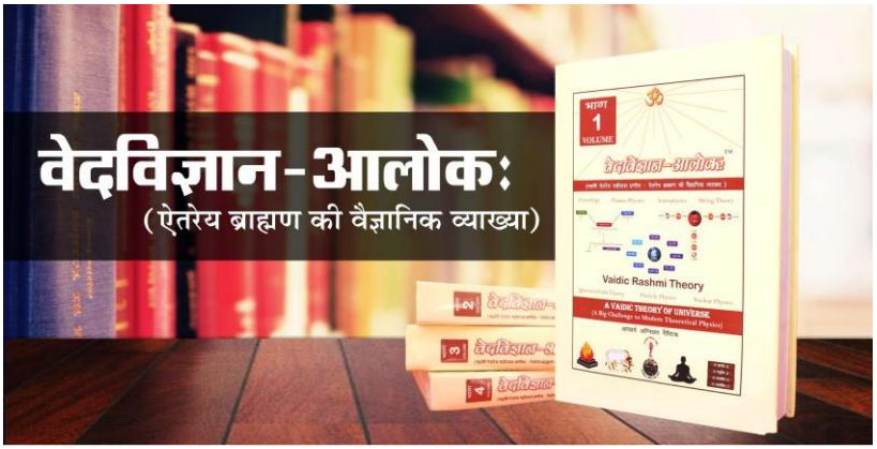

রশ্মি কাকে বলে?

মহর্ষি য়াস্কের মতে, **সেই সূক্ষ্ম কম্পন যা নিজের থেকে স্থূল কম্পনকে উৎপন্ন ও নিয়ন্ত্রিত করে, তাকে রশ্মি বলে।** রশ্মিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম পরা 'ওম্' রশ্মি প্রকৃতির

সাম্যাবস্থাকে, যেখানে প্রকৃতির তিনটি গুণ (সৎ, রজ এবং তম) সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, তাকে ভঙ্গ করে।

সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড (সমস্ত কণা, তরঙ্গ, আকাশ আদি) এই রশ্মিগুলো দিয়েই তৈরি এবং নিয়ন্ত্রিত। যেকোনো রশ্মি বর্তমান ভৌতিক দ্বারা পরিচিত যেকোনো তরঙ্গের চেয়ে সূক্ষ্ম হয়।

বাক্ (বাণী) রশ্মির চার রূপ

১. পরা — পরা বাণী হল সমস্ত বাণীর মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং মূল। এটি এমন এক সূক্ষ্ম বাণী হয়, যা সর্বাধিক সূক্ষ্ম, সর্বত্র ব্যাপ্ত, অত্যধিক মাত্রা তথা সর্বদাই অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান, সবাইকে নিজের সাথে বেঁধে রাখে, কিন্তু নিজে সবার থেকে মুক্ত এবং সবচেয়ে উচ্চতম অবস্থার অধিকারী হয়। এই সূক্ষ্ম বাণী কান দিয়ে কখনও শোনা সম্ভব নয়। এটি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সূক্ষ্মতমরূপে ব্যাপ্ত থেকে প্রতিটি কণাকে নিজের সাথে সমন্বিত রাখে। একে শুধুমাত্র অত্যন্ত উৎকৃষ্ট য়োগী পুরুষরাই অনুভব করতে পারেন। একে বর্তমানের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি দিয়ে জানা সম্ভব নয়। **মানুষ যে বৈখরী বাণী শোনে বা শোনায়, সেই বাণী আত্ম তত্ত্ব দ্বারা পরা অবস্থাতেই গ্রহণ বা উৎপন্ন করা হয়।** এই বাণীর মাধ্যম হল প্রকৃতি (সৃষ্টির সবচেয়ে মূল উপাদান পদার্থ)।

২. পশ্যন্তী — এই বাণী পরার চেয়ে স্থূল তথা এটি বিভিন্ন বর্ণকে তাদের স্বরূপ প্রদান করতে-করতে বীজের মতো হয়। এটি পরাবাণী থেকে স্থূল এবং মধ্যমা থেকে সূক্ষ্ম হয়। পশ্যন্তী বাক্ মনস্তত্ত্বের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং এটিই এর ভিত্তি এবং মাধ্যম। সমস্ত প্রাণ ও ছন্দ রশ্মি এই বাক্ তত্ত্ব থেকেই এবং এই মনস্তত্ত্বের মধ্যেই উৎপন্ন হয়। **সম্ভবতঃ এই বাণীকে ভবিষ্যতে কোনো সূক্ষ্ম প্রযুক্তি দিয়ে গ্রহণ করা সম্ভব হবে।** যখন কোনো ব্যক্তি কান দিয়ে কোনো কথা শোনে, তখন কানের স্নায়ু দ্বারা সংবেদন মস্তিষ্ক পর্যন্ত পুনঃ মনস্তত্ত্বের মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়। সেই সংবেদনের মধ্যে বর্ণগুলোর বিদ্যমানতা থাকে। তারপর মনের সহযোগিতায় মস্তিষ্ক বর্ণগুলোকে শনাক্ত করে। সেটিই হল পশ্যন্তী বাণী, যা কান দিয়ে শোনা যায় না, কিন্তু মস্তিষ্কের মাধ্যমে মনস্তত্ত্ব যাকে অনুভব করে।

৩. মধ্যমা — এই বাণীকে পশ্যন্তী থেকে স্থূল ও বৈখরী থেকে সূক্ষ্ম মানা হয়। এরমধ্যে বর্ণগুলোর রূপ পশ্যন্তীর তুলনায় স্থূল এবং বৈখরীর তুলনায় সূক্ষ্ম হয়। কর্ণপটলে যে ধ্বনি শোনা যায়, সেটি যে স্বরূপ প্রাপ্ত করে, তাকে মধ্যমা বলা হয়। মস্তিষ্ক ও কানের মধ্যে যে বাণীর সঞ্চালন হয়, সেটি হল এটাই। এই বাণীর মাধ্যম হল আকাশ তত্ত্ব (স্পেস)।

ক্রিয়াকলাপ

এটি জানার চেষ্টা করুন যে আমাদের কান শব্দকে কীভাবে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে এবং মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছানোর পরে এই সংকেতটির কী হয়? এর জন্য আপনি ইন্টারনেট বা বিজ্ঞানের কোনো বিশেষজ্ঞের সাহায্যও নিতে পারেন।

৪. বৈখরী — এটি হল সেই স্থূল বাণী, যা আমরা বলি ও শুনি। এই বাণীই বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে যাতায়াত করে, যা অবশেষে শ্রোতার মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়ে পশ্যন্তীর রূপ নেয়। অর্থাৎ যখন কোনো মানুষ বাণীর উচ্চারণ করে, তখন সামনের বক্তার মুখ থেকে আমাদের কানে আসা বাণী বৈখরী হল, কান থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যাওয়া মধ্যমা, মস্তিষ্ক থেকে মন যে রূপে গ্রহণ করে, সেটি হল — পশ্যন্তী এবং মন থেকে চেতন স্বরূপ আত্মা এটিকে পরা রূপে গ্রহণ করে।

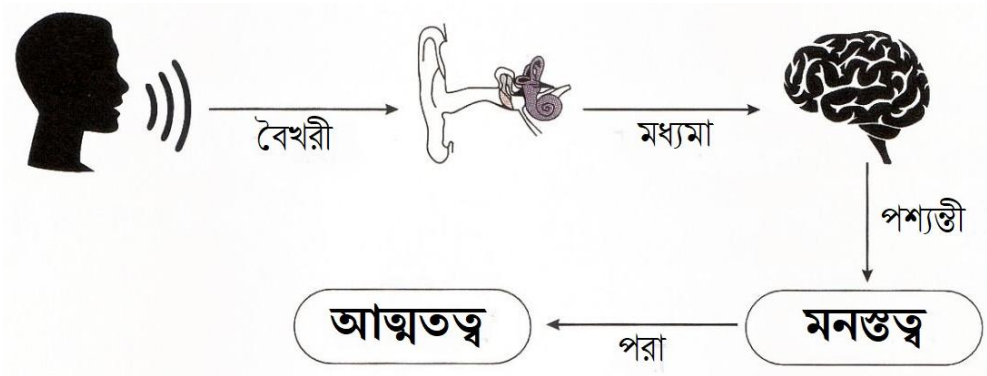

বাণীর রূপান্তরণ

উচ্চারণ করার সময় সর্বপ্রথম বাক্ (বাণী) আত্মার ভিতরে উৎপন্ন হয়ে মন পর্যন্ত যে রূপে যায়, সেটি পরা বাণী নামে পরিচিত হয়। মন বা বুদ্ধি সেই পরা বাণীকে পশ্যন্তীতে রূপান্তরিত করে। মস্তিষ্ক পর্যন্ত এটি পশ্যন্তী রূপে সঞ্চারিত হয়। এর পরে মস্তিষ্ক সেই বাণীকে মধ্যমা রূপে রূপান্তরিত করে এবং স্নায়ুর মাধ্যমে সেই বাণী আমাদের স্বরযন্ত্র পর্যন্ত পৌঁছায়। অবশেষে স্বরযন্ত্র সেই মধ্যমা বাণীকে বৈখরীতে রূপান্তরিত করে। এর মাধ্যম হল স্থূল পদার্থ (কঠিন, তরল, গ্যাস আদি)। এই বাণী চাপের মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়।

পরিভাষা

এখানে বাণীর এই পরিবর্তন সেইভাবে হয়, যেভাবে ধ্বনি ধ্বনিগ্রাহী (মাইক্রোফোন) থেকে বিদ্যুৎ সংকেত (ইলেকট্রিক সিগন্যাল) এবং তারপর বিদ্যুৎ সংকেত ধ্বনি-বিস্তারক (লাউডস্পিকার) থেকে পুনরায় ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ধ্বনিগ্রাহী থেকে ধ্বনির পরিবর্তন

বাক্

সাধারণ ভাষায় একে ধ্বনি বলা হয়। **এটি হল সেই প্রথম কম্পন, যা সৃষ্টির মূল উপাদান পদার্থের মধ্যে চেতন তত্ত্ব দ্বারা উৎপন্ন হয়।** একে আমরা পরা বাণীরূপে সংজ্ঞায়িত করে এসেছি। এই কম্পন অর্থাৎ রশ্মিগুলো এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির নির্মাণ ও সঞ্চালনে নিয়ন্ত্রক হয়। এই কম্পনের পূর্বে কোনো প্রকারের কোনো নড়াচড়ার কল্পনাই সম্ভব নয়। অন্য সব রশ্মি এরই বিভিন্ন রূপ হয়।

ছন্দ

যে রশ্মিগুলো আচ্ছাদন এবং বল দেয়, তাদের ছন্দ রশ্মি বলে। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সমস্ত রশ্মি কাউকে না কাউকে আচ্ছাদিত করে আছে এবং বল প্রদান করে, তাই সমস্ত রশ্মিই ছন্দ রশ্মি নামে পরিচিত। এই রশ্মিগুলো বাক্-এরই রূপ হয়। সৃষ্টিতে এই রশ্মিগুলো প্রাণ রশ্মির সাপেক্ষে স্ত্রী রূপ আচরণ করে।

প্রাণ রশ্মি

যে রশ্মিগুলো বল, গতি এবং প্রকাশ দেয়, তাদের প্রাণ রশ্মি বলে। সমস্ত ছন্দ রশ্মির গুণ প্রাণ রশ্মিতে এবং সমস্ত প্রাণ রশ্মির গুণ ছন্দ রশ্মিতে থাকে, এই কারণে মূলত এগুলোও বাক্ রশ্মিরই বিশেষ রূপ হয়। ছন্দ রশ্মির প্রতি এদের বিশেষ আকর্ষণ থাকে এবং এরা তাদের সাপেক্ষে পুরুষ রূপ আচরণ করে।

মরুৎ

ছোট ছন্দ রশ্মিগুলোকে মরুৎ রশ্মি বলে। এদেরও প্রাণ রশ্মিগুলোর প্রতি আকর্ষণের ভাব থাকে এবং এগুলো তাদের সাপেক্ষে স্ত্রী রূপ আচরণ করে। এই রশ্মি সমূহে গমন করে।

পরিভাষা

সোম

সোম রশ্মি মরুৎ রূপই হয়। এগুলো ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অপ্রকাশিত অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং বিদ্যুৎ আবেশিত তরঙ্গ আকাশে গমন করতে-করতে সোম রশ্মিগুলোকে শোষণ করতে থাকে। এদের তাপমাত্রা খুব কম হয়।

ঊর্জা

বৈদিক ভৌতিকীর অনুসারে যার মধ্যে বল ও গতি উভয়ই বিদ্যমান থাকে অথবা যার মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে, তাকে ঊর্জা বলে। [ঊর্জ বলপ্রাণনয়োঃ]

নিমিত্ত কারণ

যার দ্বারা কিছু তৈরি হয় এবং তৈরি না করলে হয় না অর্থাৎ **কোনো কাজের চেতন কর্তা, তাকে মুখ্য নিমিত্ত কারণ বলা হয়।** এছাড়াও কিছু এমন উপকরণ, যা কোনো কাজে সাহায্য করে, সেগুলোকেও সাধারণ নিমিত্ত কারণ বলা হয়। যেমন সোনার গয়না বানানোর ক্ষেত্রে স্বর্ণকার মুখ্য নিমিত্ত কারণ এবং তার সরঞ্জাম ও ক্রেতা সাধারণ নিমিত্ত কারণ বলা হয়।

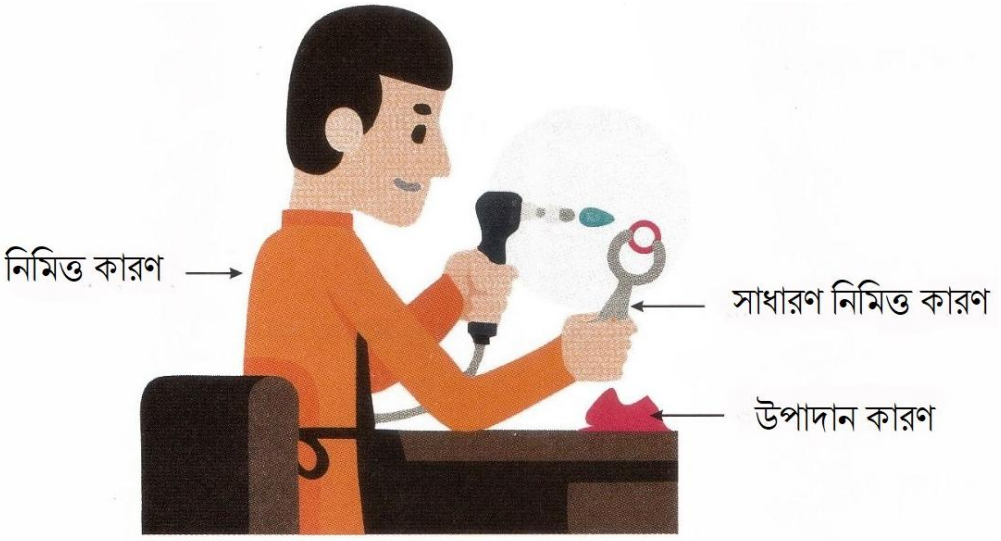

নিমিত্ত, সাধারণ নিমিত্ত এবং উপাচার কারণ

উপাচার কারণ

যে পদার্থ দিয়ে কোনো কর্তা কোনো পদার্থের নির্মাণ করে, তাকে উপাদান কারণ বলা হয়। যেমন সোনার গয়না বানাতে সোনা, রূপার মতো ধাতুগুলো উপাদান কারণ, অর্থাৎ গয়না বানানোর সামগ্রী।

পরিভাষা

বিদ্যা

যার দ্বারা পদার্থের স্বরূপ যথাযথ জেনে তার থেকে উপকার নিয়ে নিজের এবং অন্যের জন্য সব সুখ সিদ্ধ করা যায়, তাকে বিদ্যা বলে। [ব্যবহারভানু, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী]

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান তাকে বলে যা কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিনটির যথাযথ ব্যবহার করা এবং পরমেশ্বর থেকে প্রকৃতি পর্যন্ত পদার্থের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করা, এবং সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা। [বেদ বিষয় বিচার ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী]

এর থেকে এটি প্রমাণিত হয়, যে জ্ঞান দ্বারা নিজের বা অন্য কোনো প্রাণীর তাৎক্ষণিক বা দূরগামী ক্ষতি হয়, তাকে বিদ্যা বা বিজ্ঞান বলা যায় না।

প্রকাশিত কণা

এমন কণা, যেগুলোর মধ্যে নিজস্ব প্রকাশ আছে। যেমন — প্রকাশাণু (ফোটন) এবং অন্য তরঙ্গাণু আদি।

অপ্রকাশিত কণা

এমন কণা, যেগুলোর মধ্যে নিজস্ব প্রকাশ খুব কম আছে। যেমন — ইলেকট্রন, প্রোটন, কোয়ার্ক আদি।

তরঙ্গাণু (কোয়ান্টা)

প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোনো তরঙ্গ যেটি কণা রূপে আচরণ করে, সেই কণাকে এই পুস্তকে তরঙ্গাণু বলা হয়েছে।

প্রকাশাণু (ফোটন)

যখন প্রকাশ কণা রূপে আচরণ করে, সেই কণাকে এই পুস্তকে প্রকাশাণু বলা হয়েছে।

পদার্থ বা তত্ত্ব

যার বাস্তবে অস্তিত্ব আছে, তাকে পদার্থ বলে। মহর্ষি কণাদের মতে জড় পদার্থের যেকোনো অবস্থাই হোক না কেন, তার গুণ, কর্ম, সংযোগ, বিভাগ আদি সবই পদার্থ নামে পরিচিত। ঈশ্বর, আত্মা, মন, কাল, দিশা এবং এগুলোর গুণ তথা কর্মকেও পদার্থ বলা হয় অর্থাৎ

এই সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান আছে, তার নাম হল পদার্থ।

* * * * *

পরিভাষা

2 অধ্যায়

সৃষ্টির জ্ঞান কেন প্রয়োজনীয়?

আমরা সবাই রাত-দিন আমাদের চারপাশে যে পরিবেশ দেখি, পৃথিবী এবং তাতে বিদ্যমান সমস্ত পদার্থ, পৃথিবীর মতো আরও অনেক গ্রহ, তাদের উপগ্রহ, বিভিন্ন নক্ষত্র, কোটি-কোটি গ্যালাক্সি অর্থাৎ যা কিছু জড় পদার্থ আমরা দেখতে পাই বা দেখতে পাই না, সেগুলো সব সৃষ্টিরই অংশ এবং এই সমস্ত পদার্থকে মানুষ আদিকাল থেকেই জানার চেষ্টা করে আসছে। এখন প্রশ্ন জাগে যে সৃষ্টির জ্ঞান কেন প্রয়োজনীয়? এই প্রশ্নের উত্তর জানার আগে আমরা জানবো যে এই জগৎ কী পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে?

2.1 সৃষ্টির মূল কারণ

জগৎ নিম্নলিখিত দুই প্রকারের পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে —

1. যে পদার্থগুলো এই সৃষ্টির উপাদান কারণ অর্থাৎ যাদের মিশ্রণে এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি তৈরি হয়েছে।
2. যে পদার্থগুলো এই সৃষ্টির উপাদান কারণ না হয়ে শুধুমাত্র নিমিত্ত কারণ হয়।

এদের মধ্যে প্রথম প্রকারের পদার্থগুলো জড় এবং দ্বিতীয় প্রকারের পদার্থগুলো কিছু জড় এবং কিছু চেতন হয়। **মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী** সৃষ্টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে **'আর্য্যোদ্দেশ্যরত্নমালা'**-তে লিখেছেন —

''যে কর্তা রচনা করে কারণ দ্রব্য কোনো বিশেষ সংযোগে (অর্থাৎ যে কারণ দ্রব্য কর্তার দ্বারা রচনার রূপ হয়ে) **অনেক প্রকার কার্যরূপ হয়ে বর্তমানে ব্যবহার করার যোগ্য হয়, তাকে 'সৃষ্টি' বলা হয়।''**

'স্বমন্তব্যামন্তব্যপ্রকাশ'-এ পুনরায় **মহর্ষি দয়ানন্দ** লিখেছেন —

''সৃষ্টি তাকে বলে, যা পৃথক দ্রব্যগুলোর জ্ঞান-যুক্তিপূর্বক মিলন হয়ে নানারূপ ধারণ করে।''

এই দুটো সংজ্ঞার উপর বিচার করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় —

1. সৃষ্টির পদার্থগুলোকে মানুষ ব্যবহারে আনতে পারে। সেগুলোর যথার্থ বিজ্ঞান লাভ করতে পারে। যথার্থ বিজ্ঞান ছাড়া কোনো পদার্থকে উপযুক্ত ব্যবহারে আনা সম্ভব নয়, এই কারণে পদার্থ বিজ্ঞান অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি বিজ্ঞান সংসারে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক। সৃষ্টি হেয় নয়, বরং ব্যবহারে এনে সবার উপকার করার জন্য হয়। সৃষ্টির সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম ও স্থূল থেকে স্থূল পদার্থ অর্থাৎ সূক্ষ্মতম কণা এবং তার চেয়েও সূক্ষ্ম প্রাণাদি পদার্থ থেকে বিশাল লোক-লোকান্তর সবকিছুর যথার্থ বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করে সবার মঙ্গলের জন্য তার ব্যবহার করা উচিত। এটাই হল সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

2. সৃষ্টি কোনো কারণ পদার্থ থেকে তৈরি হয়েছে। সেই কারণ পদার্থ হল অনাদি ও অনন্ত। সেটি কখনো তৈরি হয় না এবং কখনো নষ্টও হয় না। সেই পদার্থের সবসময় অস্তিত্ব থাকে, সেটি শূন্য অর্থাৎ অবস্তু নয়, যেমন মহান তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষি কপিল বলেছেন —

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ। (সাংখ্যদর্শন 1.78)

অর্থাৎ অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তি হতে পারে না। এই কথাই **য়োগেশ্বর মহান বেদবিজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ** বলেছেন —

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। (গীতা 2.26)

অর্থাৎ **অসতের কখনো অস্তিত্ব হয় না এবং অস্তিত্ববানের কখনো বিনাশ হয় না।** এর অর্থ হল, শূন্য (nothing) থেকে কখনো কোনো বস্তুর উৎপত্তি হতে পারে না এবং যে বস্তু বিদ্যমান আছে, তার কখনো পূর্ণ বিনাশ হয় না। জগতে যে কোনো অস্তিত্ববানের বিনাশ এবং কোনো কারণ দ্রব্য ছাড়া কোনো বস্তুর উৎপত্তি দেখা বা শোনা যায় তার যথার্থতা এই যে —

নাশঃ কারণলয়ঃ। (সাংখ্যদর্শন 1.121)

অর্থাৎ **স্থূল পদার্থগুলোর নিজের কারণভূত সূক্ষ্ম পদার্থে লয় বা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াকেই বিনাশ বলে।** এইভাবে বস্তুর বিনাশ যথার্থে হয় না, বরং তার রূপ এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে তার বোধ আমাদের হতে পারে না, একেই বিনাশ বা প্রলয় বলা হয়। এর বিপরীতে যখন সেই অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অবিজ্ঞেয় কারণ পদার্থ স্থূল রূপে পরিবর্তিত হয়ে কোনো বস্তুর নির্মাণ হতে দেখা যায়, তাকেই কোনো বস্তুর উৎপন্ন হওয়া মনে করা হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টি ও প্রলয় হল পদার্থের দুটো অবস্থার নাম। এটাও ধ্যানে রাখা উচিত যে এই সৃষ্টি-প্রলয় বা কার্য-কারণ (cause and effect) অবস্থাও আপেক্ষিক হয়। একটি পদার্থ অন্য কোনো পদার্থের উপাদান কারণ হতে পারে,

আবার সেই একই পদার্থ অন্য কোনো সূক্ষ্ম পদার্থের কার্যরূপও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, জলের অণু জলের উপাদান কারণ, কিন্তু হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অণু জলের অণুর উপাদান কারণ হয়। এইভাবে জলের অণু, জলের উপাদান কারণ হয় এবং হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অণুর কার্যরূপ হয়।

2.2 সৃষ্টি একটি অতি বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ রচনা

সৃষ্টি পৃথক-পৃথক সূক্ষ্ম পদার্থের বিশেষ সংযোগে নির্মিত হয়েছে। এখানে 'বিশেষ' শব্দটি এই বোঝায় যে সৃষ্টির বিভিন্ন পদার্থ (সূক্ষ্ম বা স্থূল) এর নির্মাণ এলোমেলো সংযোগে (random combination) নয়, বরং জ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ সঠিক সংযোগেই হয়। যা কিছু আমাদের জগতে এলোমেলো অর্থাৎ অব্যবস্থা হিসাবে দেখা যায়, সেটি আমাদের অল্প জ্ঞানের কারণেই আমাদের কাছে মনে হয়, অথচ সেই অব্যবস্থার মধ্যেও একটি সুন্দর উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যবস্থা থাকে, যা আমরা আমাদের অল্প জ্ঞানের কারণে জানতে পারি না। সমগ্র সৃষ্টি সম্পূর্ণ সুব্যবস্থিত, জ্ঞানপূর্বক রচিত, জ্ঞানপূর্বক ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে সঞ্চালিত হয়। যা কিছু আমাদের অভিজ্ঞতায় আসে বা না-ও আসে, তা সবই নিয়মবদ্ধ হয়ে কাজ করে এবং উৎপন্নও সেই নিয়ম মেনেই হয়। জগতে কোনো প্রক্রিয়াই নিয়ম ছাড়া কাজ করছে না। এটি ভিন্ন কথা যে আমরা সেই নিয়মগুলোকে সম্পূর্ণভাবে কখনো জানতে পারি না। এই কথা বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী রিচার্ড পি. ফাইনম্যানও স্বীকার করেছেন —

''We can imagine that this complicated array of moving things which constitutes **the world** is something like a great chess game being played by the Gods, and we are observers of the game. We do not know what the rules of the game are; all we are allowed to do is to watch the playing. Of course, if we watch long enough, we may eventually catch on to a few of the rules. The rules of the game are what we mean by fundamental physics. Even if we knew every rule,

however, we might not be able to understand why a particular move is made in the game, merely because it is too complicated and our minds are limited''

[Page No. 13, Lectures on Physics]

এর অভিপ্রায় হল, 'সম্পূর্ণ সংসার হল পরমাত্মার খেলা। সংসারের ভৌতিকীর সমস্ত নিয়ম হল সেই খেলার নিয়ম। আমরা সেই সমস্ত নিয়ম জানতে পারি না। আমরা কেবল সেগুলো দেখতেই পারি। আমরা সেই নিয়মগুলো তৈরি করতে পারি না। আমরা যত নিয়ম যত অংশে জানি, ততটাই আমাদের বিজ্ঞান উন্নত বলে গণ্য হতে পারে। আমাদের মস্তিষ্ক সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় সংসারের জটিল নিয়মগুলোকে সম্পূর্ণভাবে কখনোই জানতে পারে না।' সৃষ্টিকে জানার সীমা জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তির বুদ্ধি এবং তার দ্বারা ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সম্পদের উপর নির্ভর করে। এই কারণে ভৌতিকীর মধ্যে গবেষণার প্রক্রিয়া সবসময় জারি থাকবে।

মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাসের বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে সৃষ্টির সমস্ত ক্রিয়া নির্দিষ্ট ক্রম এবং ব্যবস্থা অনুসারে ধাপে-ধাপে ও নিয়মবদ্ধ রীতিতেই শুরু ও সঞ্চালিত হয়। বিশৃঙ্খল-ভাবে সৃষ্টিতে কোনো নির্মাণ কাজ হওয়া সম্ভব নয়। মূল কণা উৎপন্ন হওয়া, নক্ষত্র, বিভিন্ন তরঙ্গ ও কণা, বিভিন্ন নেব্যুলাদি মেঘ আদি সমস্ত পদার্থ, অণু বা পরমাণু আদির নির্মাণ সবকিছু নির্দিষ্ট নিয়ম, ধাপে-ধাপে ও ব্যবস্থিত ক্রম অনুসারেই হয়। চেতন তত্ত্বের নিয়ম অনুসারে সৃষ্টির জন্য সমস্ত আবশ্যক তত্ত্বের নির্মাণও ধাপে-ধাপে হতে থাকে।

2.3 সৃষ্টির মধ্যে অনিশ্চিত কিছুই নেই

বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হাইজেনবার্গের মতে 'কোনো গতিশীল কণার অবস্থান এবং সংবেগকে একই সাথে একদম ঠিক-ঠিক মাপা সম্ভব নয়', একে অনিশ্চয়তার নিয়ম বলা হয়। বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আমরা কোনো কিছুকে নিশ্চিতভাবে মাপতে না পারলেও, সৃষ্টির মধ্যে অনিশ্চিত কিছুই হয় না। কোনো কণা বা লোক (নক্ষত্র এবং গ্রহ) সঠিক পথ এবং সঠিক গতিতেই চলে। এতে কোনো পরিবর্তন হয় না। যদি কখনো এমন হয়, তবে সেটি অল্প সময়ের জন্যই হয়, অন্যথায় অনিষ্ট হতে পারে। পৃথিবীর সঠিক গতি ও পথে চলার নির্দিষ্ট নিয়মের কারণেই এই সূর্যলোক পূর্বে উদয় এবং পশ্চিমে অস্ত যায় বলে মনে হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন ঋতু আসতে থাকে। এর কারণেই কোনো কণা বা লোক প্রথমে উৎকর্ষ লাভ করে, তারপর অপকর্ষ লাভ করে। এটি সৃষ্টির শাশ্বত ও সার্বজনীন নিয়ম। যেকোনো জগৎ, প্রাণীদের শরীর, উদ্ভিদসহ সকল স্থাবর-জঙ্গম জগৎ এই নিশ্চিত নিয়মের উপরই চলছে। এই উৎকর্ষ ও অপকর্ষের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিটি

পদার্থ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই গতিশীল থাকে। এখানে যদৃচ্ছা (এলোমেলোভাবে) কিছুই ঘটে না। **যা আমাদের কাছে আকস্মিক বা এলোমেলো বলে মনে হয়, সেটিও মূলত কোনো-না-কোনো নির্দিষ্ট নিয়মের উপর ভিত্তি করেই ঘটে; কিন্তু আমরা আমাদের অল্প সামর্থ্যের কারণে সেটি জানতে পারি না।** জানার সামর্থ্য কেবল প্রতিটি প্রাণীরই নয়, বরং প্রতিটি মানুষেরও পৃথক-পৃথক হয়। যার যতটুকু সামর্থ্য থাকে, সে ততটুকুই ভৌতিকীর নিয়মগুলো বুঝতে পারে, যেগুলো সে বুঝতে পারে না, সেই নিয়মগুলোকে তার কাছে যদৃচ্ছা বা আকস্মিক বলে মনে হয়। একজন অজ্ঞানী ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতিটি কাজকে অনিয়মিত বা আকস্মিকই বলবে, কিন্তু একজন প্রবুদ্ধ বিচারশীল বৈজ্ঞানিক তার নিয়ম খুঁজে বের করেন। **আজ সংসারের বৈজ্ঞানিক জগৎ সৃষ্টির নিয়ম তৈরি করছে না, বরং সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নিয়মগুলোকে জানার চেষ্টা করছে মাত্র।** এই জানার খোঁজ করাকেই বিজ্ঞান বলা হয়, যার জন্য সংসারে লক্ষ-লক্ষ বৈজ্ঞানিক দিনরাত কাজ করে চলেছেন। আমরা এই নিয়মগুলো জানি না বলে এর অর্থ এই নয় যে, সৃষ্টি কোনো নিয়ম ছাড়াই চলছে। আলবার্ট আইনস্টাইনও বিশ্বাস করতেন যে যদৃচ্ছতা হল বাস্তবতার কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার প্রতিফলন।[1]

যেহেতু সমগ্র সৃষ্টি উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সুচিন্তিতভাবে রচিত হয়েছে, তাই **এটি অনিবার্য যে এর রচয়িতা কোনো এক মহান সামর্থ্যবান, মহাজ্ঞানী-বিজ্ঞানী, অনাদি ও অনন্ত কর্তা, যিনি অদৃশ্যভাবে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।**

যা নিরন্তর গতিশীল অর্থাৎ পরিবর্তনশীল, তাকেই জগৎ বা সংসার বলে। এই সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই স্থির বা স্থায়ী নয় আর যা স্থির, নির্বিকার বা স্থায়ী আছে, সেটি এই সৃষ্টির অঙ্গীভূত তত্ত্ব নয়। সমগ্র জগতের সূক্ষ্মতম থেকে শুরু করে বিশালতম পদার্থ নিরন্তর গতি করছে এবং এই গতির কারণে সেগুলো নিজেদের স্বরূপও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করছে। এই পরিবর্তন সর্বত্র ও সর্বদা হতে থাকা সংযোগ ও বিয়োগের কারণেই ঘটছে এবং এই সংযোগ-বিয়োগের কারণ হল গতি। এই সংযোগ-বিয়োগও জ্ঞানপূর্বকই হচ্ছে। **এই সব সংযোগ-বিয়োগ রূপী সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ, তাদের ব্যবহার ও গুণের সুশৃঙ্খল ও বিশেষ জ্ঞানকেই সৃষ্টি বিজ্ঞান বলা হয়।**

2.4 সৃষ্টি বিজ্ঞানের ব্যাপকতা

---

[1] Randomness is a reflection of our ignorance of some fundamental property of reality.
[Page No. 134, Elements of Quantum Optics by Rice Scott]

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ব্যতীত সংসারের অন্য সমস্ত বিজ্ঞান সৃষ্টি বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন শাখা হয়। একে এভাবেও বলা যেতে পারে যে, সম্পূর্ণ পদার্থ বিজ্ঞান সৃষ্টি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু লোকের মধ্যে বিভিন্ন লোক-লোকান্তর সৃষ্টির বিজ্ঞানকেই সৃষ্টি বিজ্ঞান বলে। একে ইংরেজি ভাষায় কসমোলজি বলে। বর্তমান বৈজ্ঞানিকরা এতটুকু অবশ্যই মানেন ও জানেন যে, এই কসমোলজির সাথে সৌর ভৌতিকী, প্লাজমা ভৌতিকী, খগোল ভৌতিকী, খগোল বিজ্ঞান, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি এবং স্ট্রিং থিওরি আদির কেবল অতি নিকট সম্পর্কই নয়, বরং এগুলো সবই হল সৃষ্টি বিজ্ঞানের শাখা। এছাড়াও, কণা-পরমাণু-নাভিকীয় ভৌতিকী ছাড়া কসমোলজির কল্পনাও সম্ভব নয়। উষ্মা, প্রকাশ, বিদ্যুৎ, চুম্বক আদির বিজ্ঞানও কসমোলজি বোঝানোর জন্য আবশ্যক হয়। এইভাবে এই সমস্ত বিজ্ঞান-শাখাগুলো সৃষ্টি বিজ্ঞানেরই অংশ হয়। অবশ্য এই সবগুলোর জন্য ভৌতিক বিজ্ঞান শব্দও খুব সার্থক। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন রসায়ন, ভূগর্ভ বিজ্ঞান, প্রাণি বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান আদি সবই ভৌতিক বিজ্ঞান ছাড়া অসম্পূর্ণ অথবা ভৌতিক বিজ্ঞান রসায়ন আদি অনেক শাখা বা বিদ্যার মূল হয়। **এইভাবে বর্তমান বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাই হল সৃষ্টি বিজ্ঞানের অঙ্গ।** অবশ্য বাস্তবতা তো এটাই যে, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ছাড়া সম্পূর্ণ সৃষ্টি বিজ্ঞানই অসম্পূর্ণ।

সৃষ্টির এই উদ্দেশ্যকে বুঝেই এই মানব প্রাণী যখন থেকে এই পৃথিবীতে জন্মেছে, তখন থেকেই সে সৃষ্টির উৎপত্তি এবং সঞ্চালন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সময়ও পৃথিবীতে যেখানে-যেখানে মানুষ বাস করে, তারা শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত, সবাই কোনো-না-কোনো স্তরে এই ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে চিন্তা অবশ্যই করে। এই চিন্তা তাদের বিভিন্ন বৌদ্ধিক স্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন-ভিন্ন হয়। কোথাও-কোথাও তারা নিজেদের মত পন্থের মান্যতার সীমায় আবদ্ধ হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির বিষয়ে খুব বেশি চিন্তা করে না।

2.5 সৃষ্টি বিজ্ঞানের ইতিহাস

বেদ, মনুস্মৃতি, বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, মহাভারত, সূত্র-গ্রন্থ, দর্শন, উপনিষদ আদি সম্পূর্ণ প্রাচীন বৈদিক বাঙ্ময়ের মধ্যে সৃষ্টির যথার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত গভীর বিচার করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের উদয়ের পূর্বেই পাশ্চাত্য দেশগুলোতে প্লেটো আদি চিন্তাবিদদের সৃষ্টিবিদ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রাদুর্ভাব হয়ে গিয়েছিল। এই চিন্তাধারা এবং দেশি-বিদেশি মত-পন্থের মান্যতার মূল উৎস বৈদিক দর্শনই ছিল, কিছুটা বিকৃত রূপে সেটি সংসারে ছড়িয়ে পড়েছিল।

যাকে আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের উদয় বলতে পারি, সেটি কোপারনিকাস, গ্যালিলিও

থেকে শুরু হয়েছে। এর পরে, সেই সময়ের ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক আইজাক নিউটন থেকে আধুনিক সৃষ্টি বিজ্ঞানের যুগের সূচনা হয়। এরপর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন পর্যন্ত বর্তমান বিজ্ঞান অনেক ক্রান্তিকারী অনুসন্ধান করেছে। সৃষ্টির অনেক গভীর রহস্য বোঝা ও জানা গেছে। এই সময়কালে আধুনিক বিজ্ঞান অত্যন্ত উচ্চ প্রযুক্তির এমন বিকাশ ঘটিয়েছে যে তার সাহায্যে এই ব্রহ্মাণ্ডের অনেক রহস্য উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। আইনস্টাইনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বোঝার জন্য অনেক টেকনিক বিকশিত হয়েছে। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার এই ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝতে একসঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। বর্তমান বিজ্ঞান গত প্রায় 200-300 বছর ধরে এই সৃষ্টি নিয়ে যথেষ্ট বিচার করেছে। এই দিকে সমগ্র বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সংগঠিত হয়ে নিরন্তর কঠোর পুরুষার্থ করছেন। তবুও বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতেও সৃষ্টি উৎপত্তির কোনো একটি সর্বজনীন সিদ্ধান্ত স্থাপিত হতে পারেনি, বরং বেশ কয়েকটি পরস্পরবিরোধী মতবাদ সিদ্ধান্তের নামে প্রচলিত হয়েছে, সেই সমস্ত পক্ষের বৈজ্ঞানিকরা তাদের নিজস্ব মতবাদের সমর্থনে তাদের নিজস্ব পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে বিরোধী মতবাদ খণ্ডন করতে দেখা যায়। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। অনেক পরিশ্রম এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পরেও বিশ্বের বৈজ্ঞানিকরা এখনও সৃষ্টি উৎপত্তির অনেক রহস্য জানতে পারেননি এবং যেসব রহস্য আমাদের ঋষিরা জানতেন, সেই জ্ঞান ধীরে-ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। আমাদের কাছে এখনও অনেক বৈদিক গ্রন্থ আছে, কিন্তু সেগুলো ব্যাখ্যা করার কেউ নেই। **পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বৈদিক ভৌতিকীর থেকে সেই রহস্যগুলোর কিছু জানার চেষ্টা করবো।**

2.6 সৃষ্টিকে কেন জানবো ?

এখন এই বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন যে সৃষ্টিকে জানা কেন আবশ্যক? এটিকে না জেনে কি মানুষ সুখী হতে পারবে না? এর উত্তরে আমি বলতে চাইবো যে হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই এটিকে না জেনে আমরা সুখে থাকতে পারবো না। আমরা যত বেশি সৃষ্টিকে জানবো, আমাদের জীবন ততই বেশি সুখী হবে এবং এই সুখ কেবল বাহ্যিক সুখ হবে না, বরং আমরা শরীর, মন এবং আত্মা দিয়ে কেবল নিজেরাই সুখী হবো না, বরং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ করতে পারবো।

সৃষ্টির জ্ঞান কেন প্রয়োজনীয়?

আসুন, আমরা এটি বোঝার চেষ্টা করি। ধরা যাক, আপনি একটি গাড়ি কিনলেন এবং সে সম্পর্কে কিছু না জেনে চালাতে শুরু করলেন, তখন কী হবে? আমরা কোথাও দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে গাড়ি এবং নিজের শরীর নষ্ট করে ফেলবো। এই বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? যে ব্যক্তি গাড়ি সম্পর্কে এবং ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে যত বেশি জানবে এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করবে, তার যাত্রা ততই সহজ এবং সুখকর হবে। এই একটি উদাহরণই আমাদের সৃষ্টি বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা দেখানোর জন্য যথেষ্ট। আমরা আমাদের শরীর, গাছপালা, পৃথিবী, বাতাস, জল, সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, চুম্বক, উষ্মা, উষ্ণতা, উর্জা আদি পদার্থ সম্পর্কে যত গভীর জ্ঞান রাখবো, তত বেশি এগুলো থেকে লাভবান হতে পারবো। মনে রাখবেন, এদের সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে করা প্রযুক্তিগত আবিষ্কারগুলোই এই পরিবেশ এবং আমাদের স্বাস্থ্যকে নষ্ট করছে। যেমন অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন গাড়িচালক দুর্ঘটনা ঘটায়, তেমনই **অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তৈরি প্রযুক্তি কোনো-না-কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই।** আজকের বিশ্ব, যাকে অত্যন্ত উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্ব বলে মনে করা হচ্ছে, সেখানে এমন কোনো প্রযুক্তি নেই যার কোনো-না-কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এমন কোনো ইংরেজি ওষুধ নেই যার কোনো-না-কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, অথচ **বৈদিক যুগে বিকশিত সৈদ্ধান্তিক ভৌতিকীর উপর ভিত্তি করে তৈরি প্রযুক্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ (পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন) ছিল।**

আমাদের কি ভাবা উচিত নয় যে এমন কেন হয়? এমন এই কারণে হয় যে আমরা সুখ-সুবিধার লোভে সৃষ্টির পদার্থগুলোর বিজ্ঞানকে গভীরভাবে না জেনেই প্রযুক্তিগত আবিষ্কারকে অগ্রাধিকার দিই। আমাদের দ্বিতীয় অজ্ঞতা হল আমরা আমাদের সৃষ্টিকে কেবল জড় পদার্থের স্বতঃস্ফূর্ত সংমিশ্রণ বলে মনে করেছি। সর্বোচ্চ চেতন সত্তা, যিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও নির্মাণ করেন তথা একটি চেতন সত্তা, যা আমাদের প্রাণীদের শরীরে মধ্যে নিবাস করে সমস্ত সৃষ্টির উপভোগ করছে, এই দুটোকে ভুলে গেছি, এর অর্থ হল তিন প্রকারের পদার্থের মধ্যে শুধুমাত্র

একটি পদার্থ জড়কে নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা মানব সমাজের ভাগ্যবিধাতা হতে চলেছেন, তাতে অমঙ্গল হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। একটু ভাবুন যে যদি কোনো ব্যক্তি তার পরিবারে তার বাবা-মা আদি বৃদ্ধদের এবং তার ভাই, বোন, স্ত্রী ও সন্তানদের ভুলে গিয়ে নিজেকেই পরিবারের একমাত্র সর্বোচ্চ আধিকারিক মনে করে সম্পূর্ণ সম্পত্তির উপর নিজেরই অধিকার মনে করে বসে, তখন তার ব্যবহার কেমন হবে? সে সবাইকে দুঃখই দিবে এবং তারপর নিজেও কীভাবে সুখ অনুভব করতে পারবে? আজ এই মানব জগতের ঠিক এই অবস্থা হয়েছে। মানুষ নিজেকে সৃষ্টির একমাত্র সর্বোচ্চ ভোক্তা মনে করে ব্যবহার করতে-করতে সম্পূর্ণ পৃথিবীকে নিজেই উপভোগ করতে চায়, এই কারণেও সংঘাত বাড়ছে, অনেক প্রাণী নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, প্রেম, করুণা এবং দয়ার মতো গুণ নষ্ট হয়ে গেছে, এই কারণে সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ রূপে জানা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবহার করার মাধ্যমেই মানুষ সুখী থাকতে পারবে এবং সমস্ত প্রাণীদেরও সুখী করতে পারবে।

ক্রিয়াকলাপ

বর্তমান কোনো একটি প্রযুক্তি (মোবাইল রেডিয়েশন, সার, ট্র্যাক্টর, সিমেন্ট, ওষুধ আদি) নিয়ে গবেষণা করে, তার থেকে হওয়া কুফলগুলোর উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন এবং তার প্রচার করুন।

স্মরণীয় তথ্য

1. সংসার দুই প্রকারের পদার্থ দিয়ে তৈরি। এক যা এই সৃষ্টির উপাদান কারণ হয় এবং দুই যা এই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ হয়।
2. সৃষ্টির পদার্থের যথার্থ বিজ্ঞানকে সাক্ষাৎ করে তাকে সবার মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা, এটাই সৃষ্টি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।
3. সৃষ্টি যে পদার্থ দিয়ে তৈরি, সেটি হল অনাদি ও অনন্ত।
4. শূন্য থেকে কখনোই কোনো বস্তুর উৎপত্তি হতে পারে না এবং যে বস্তু বিদ্যমান আছে, তার

কখনও পূর্ণ বিনাশ হয় না।

5. সৃষ্টি সূক্ষ্ম পদার্থের জ্ঞান ও যুক্তিপূর্বক সম্যক সংযোগ বিশেষ থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি হয়েছে। আকস্মিক বা উদ্দেশ্যহীন সংযোগ থেকে নয়।
6. সৃষ্টির সমস্ত ক্রিয়া নিশ্চিত ক্রম এবং ব্যবস্থা অনুযায়ী ধাপে-ধাপে ও নিয়মবদ্ধভাবে শুরু ও সঞ্চালিত হয়।
7. সৃষ্টিকে রচনাকারী মহান সামর্থ্যবান, মহান জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, অনাদি ও অনন্ত কর্তা অদৃশ্যরূপে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন।
8. বর্তমান বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখা হল সৃষ্টি বিজ্ঞানেরই অংশ।
9. আমরা সৃষ্টির পদার্থের যত গভীর জ্ঞান রাখবো, ততই বেশি লাভবান হতে পারবো। সৃষ্টিকে না জেনে মানুষ কখনও সুখী হতে পারবে না।

অনুশীলনী

1. সৃষ্টির কারণ কোনগুলো কি কি? ব্যাখ্যা করুন।
2. সৃষ্টি কাকে বলে এবং এর জ্ঞান আমাদের জন্য কেন আবশ্যক?
3. লোকের মধ্যে সৃজন ও বিনাশ কাকে বলা হয়?
4. প্রমাণ করুন যে সৃষ্টি বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ রচনা, আকস্মিকভাবে নিজে থেকে রচনা নয়।
5. হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নিয়ম সম্পর্কে আপনার কী মতামত? প্রকাশ করুন।
6. সৃষ্টি বিজ্ঞানের ইতিহাসকে ধাপে-ধাপে বর্ণনা করুন?
7. আপনি কি এমন কোনো আধুনিক প্রযুক্তি জানেন যার কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই? যদি হ্যাঁ, তবে সেটি বোঝান।
8. কোনো কর্তা ছাড়াই কি কোনো বুদ্ধিমান কাজ বা রচনা নিজে থেকেই হতে পারে? যদি হ্যাঁ, তবে উদাহরণসহ বোঝান।
9. সৃষ্টির রচয়িতা এবং সঞ্চালকের কী কী গুণ থাকা উচিত?
10. _____ কখনো অস্তিত্ব হয় না এবং _____ কখনো বিনাশ হয় না। (শূন্যস্থান পূরণ করুন)।

* * * * *

মহাপ্রলয়

(প্রকৃতি – সাম্যাবস্থা)

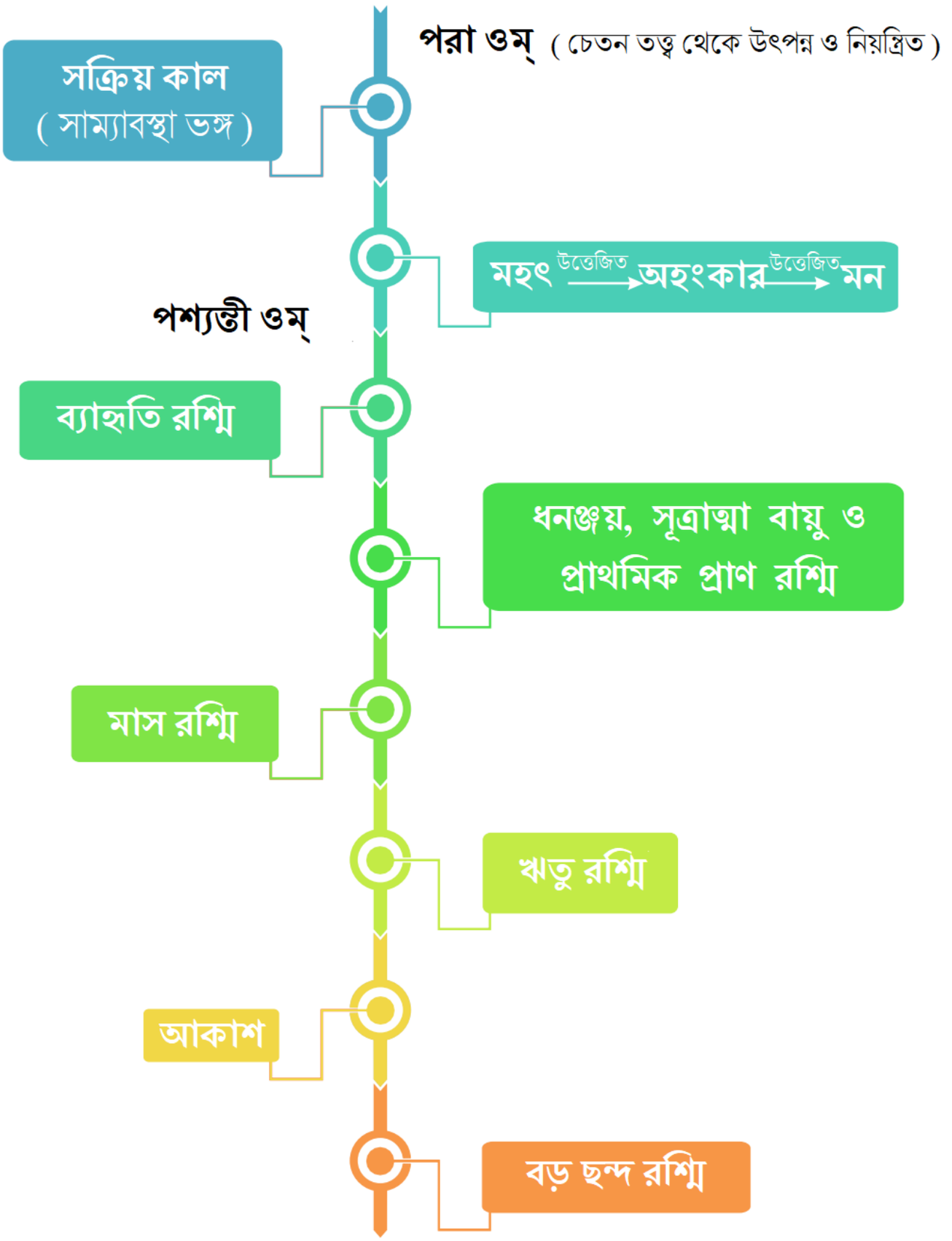

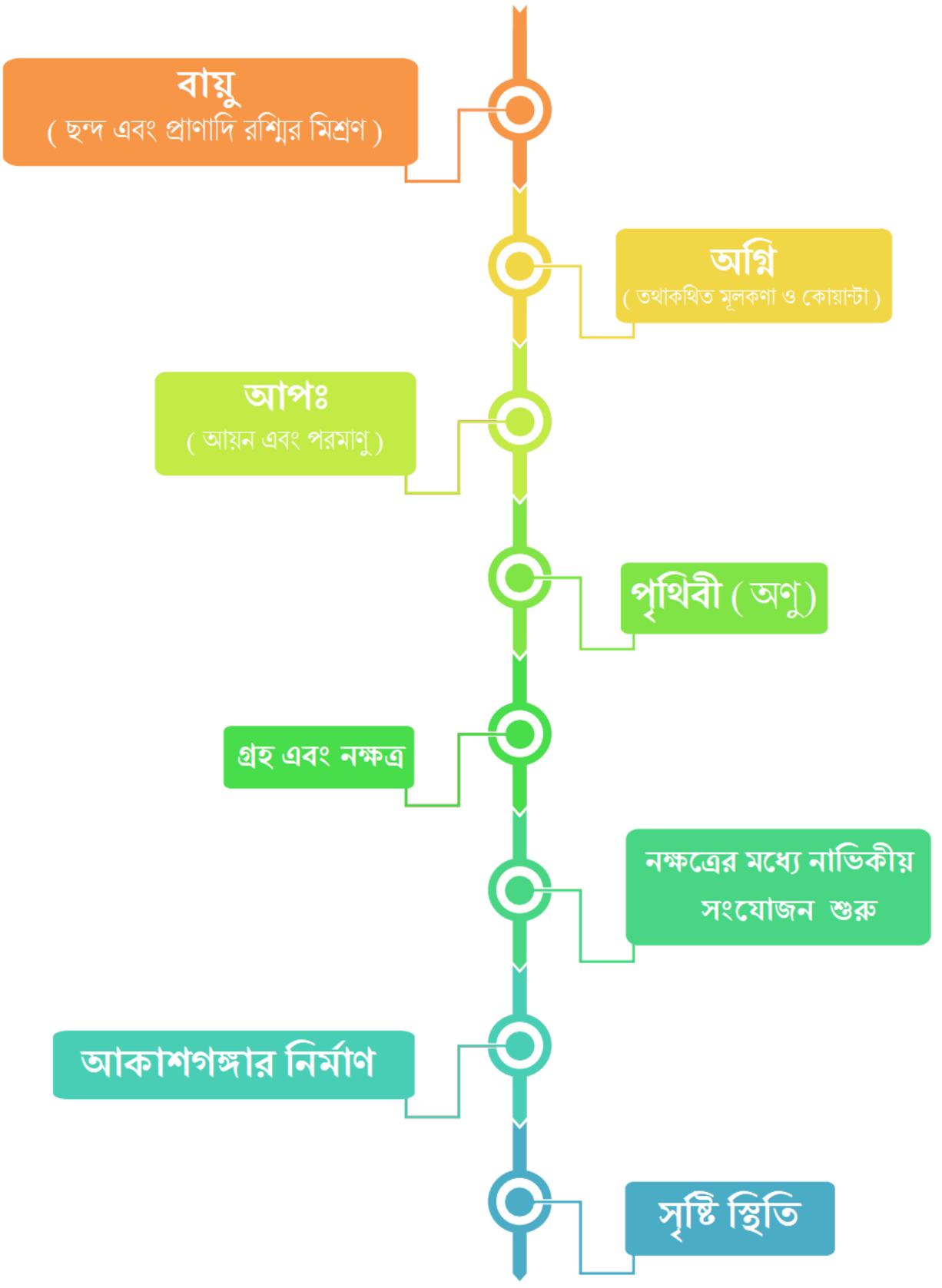

মহাপ্রলয়

(প্রকৃতি – সাম্যাবস্থা)

3 অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভিক অবস্থা

গত অধ্যায়ে আমরা জেনেছি, সংসার কী পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়েছে? ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান থাকা কেন প্রয়োজনীয়? আদি মৌলিক প্রশ্ন, যা আপনার মনে কখনো না কখনো এসেছে, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা বর্তমান বিজ্ঞানের পর্যালোচনার পর জানবো যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভিক অবস্থা ঠিক কী ছিল? যে পদার্থ দিয়ে সৃষ্টি তৈরি হয়েছে, তার স্বরূপ কী?

3.1 বর্তমান বিজ্ঞানের সমীক্ষা

বর্তমানে সৃষ্টি উৎপত্তির সবচেয়ে প্রচলিত সিদ্ধান্ত বিগ-ব্যাংকে মানা হয়। এটি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে যে এই ব্রহ্মাণ্ড কখন এবং কীভাবে তৈরি হয়েছিল?

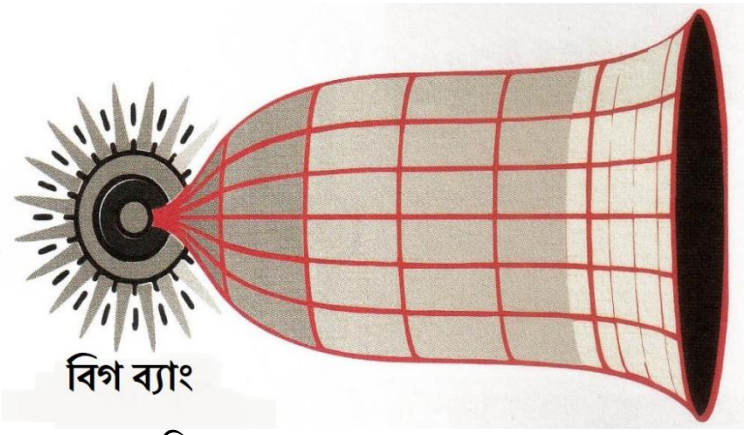

বিগ-ব্যাং এবং ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণ

বিগ-ব্যাং সিদ্ধান্ত অনুসারে, প্রায় 13.8 বিলিয়ন বছর আগে ব্রহ্মাণ্ড একটি বিন্দুতে সীমাবদ্ধ ছিল। কেউ জানে না তারপর ঠিক কী ঘটেছিল, তবে ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হতে শুরু করে এবং এর ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই প্রসারণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে, যার ফলে ব্রহ্মাণ্ড আজও ছড়িয়ে পড়ছে। শুরুতে অত্যধিক ঊর্জার নিঃসরণ হয়েছিল। এই ঊর্জা এতটাই প্রবল ছিল যে এর প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ড আজও প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই প্রসারণ পর্যবেক্ষণের কৃতিত্ব বিজ্ঞানী এডউইন হাবল (1929)-কে দেওয়া হয়, যিনি বলেছিলেন যে ব্রহ্মাণ্ড ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। এর অর্থ হল, অতীতে কোনো এক সময় ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত ঘন অবস্থায় ছিল। জর্জ লেমৈত্রে(1927)

এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্তের প্রস্তাব করেছিলেন, যেটি বিগ-ব্যাং সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। বিগ-ব্যাং-এর মাত্র 10^{-43} সেকেন্ড পরে, গুরুত্বাকর্ষণ বল অস্তিত্বে আসে এবং ভৌতিকীর নিয়মগুলো প্রযোজ্য হতে শুরু করে। সেকেন্ডের ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড 10^{30} গুণ প্রসারিত হয় এবং কোয়ার্ক, লেপটন এবং ফোটনের উত্তপ্ত পদার্থ তৈরি হয়। 10^{-6} সেকেন্ডে কোয়ার্কগুলো একত্রিত হয়ে প্রোটন এবং নিউট্রন তৈরি করতে শুরু করে এবং ব্রহ্মাণ্ড তখন কিছুটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আদির অস্তিত্ব শুরু হতে থাকে এবং অন্যান্য ভৌতিক তত্ত্ব তৈরি হতে থাকে।

বর্তমান বিজ্ঞানের মতানুযায়ী বিগ-ব্যাং-এর সময়

$$V = 0, M = \infty, \rho = \infty, T = \infty$$

(এখানে V, M, ρ, T যথাক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন, দ্রব্যমান, ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা।)

অর্থাৎ আয়তন প্রায় শূন্য তথা দ্রব্যমান, ঘনত্ব এবং তাপ ঊর্জা অনন্ত ছিল। বিশ্বের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি একটি বিন্দু আকার থেকেই মনে করেন। স্টিফেন হকিংও তাঁর 'ব্রিফিয়ার হিস্ট্রি অফ টাইম' পুস্তকে বিগ-ব্যাং-এর সময় ব্রহ্মাণ্ডকে শূন্য ব্যাসার্ধের একটি বিন্দুর আকারের বলে বর্ণনা করেন। এরপর 2010 সালের জুলাই মাসে ডিসকভারি টিভি চ্যানেলে হকিং এটির আকারকে অণুর থেকেও সূক্ষ্ম বলে অভিহিত করেন। এখন আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করবো যে, যদি কখনও বিগ-ব্যাং হয়েও থাকে, তাহলে কি সেই সময়ে ব্রহ্মাণ্ডের আকার শূন্য আয়তন বিশিষ্ট হতে পারে? শূন্য আয়তনের অর্থ কী শূন্য স্থান নয়? সেই শূন্যস্থানে অনন্ত পদার্থ থাকা তো দূরের কথা, বরং কোনো পদার্থই থাকা সম্ভব নয়। শূন্য আয়তনে দ্রব্যমান, ঊর্জা, তাপ আদির পরিমাণ শূন্যই হতে পারে। একটু ভাবুন, দ্রব্যমান ও ঊর্জার জন্য কী স্থানের প্রয়োজন নেই?

ভারতীয় **বিখ্যাত খগোলশাস্ত্রী প্রোঃ আভাস মিত্র** 2004 সালে তাঁর একটি গবেষণা পত্রে, যেটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, কোনো ব্ল্যাক হোল কখনও শূন্য আকারকে প্রাপ্ত করতে পারে না। যদি এমন হয়, তবে তার দ্রব্যমানও শূন্যই হবে। বৈজ্ঞানিকরা তো প্রারম্ভিক ব্রহ্মাণ্ডের দ্রব্যমান অনন্ত বলে মনে করেন, তাহলে তার আয়তন শূন্য কীভাবে মানবেন? বর্তমানে মহান **বৈদিক বৈজ্ঞানিক, আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক** 2004 সালের আগস্ট মাসে বিশ্ব বৈদিক বিজ্ঞান কংগ্রেস, ব্যাঙ্গালোরে তাঁর পত্রে প্রমাণ করেন যে শূন্য আয়তনে অনন্ত দ্রব্যমান বা অনন্ত ঊর্জা থাকা সম্ভবই নয়, বরং শূন্য আয়তনে অল্প

পরিমাণ দ্রব্যমান ও ঊর্জাও থাকা সম্ভব নয়। কিছু বৈজ্ঞানিক যাদের মধ্যে স্টিভেন ওয়েনবার্গ প্রমুখ আছেন, তারা বিগ-ব্যাং-কে না তো মহাবিস্ফোরণ নাম দেন আর না তার প্রারম্ভ শূন্য আয়তন থেকে করেন। এর সাথে-সাথে তারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে প্রারম্ভিক অবস্থা থেকেও শুরু করেন না। তারা পদার্থকে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই ধরে নেন এবং তাতে হঠাৎ আলোড়ন শুরু হওয়ার ঘটনা, তো **কিছু বৈজ্ঞানিক অনন্তে ছড়ানো ঘন পদার্থের মধ্যে সর্বত্র একসাথে আকাশের ছড়িয়ে পড়া এবং তার সাথে-সাথে পদার্থের ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকেই বিগ-ব্যাং নাম দেন, যাই হোক না কেন, সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থা সম্পর্কে কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই কিছু বলার মতো অবস্থায় নেই।**

বিগ-ব্যাং-এর সময় ঊর্জা কী রূপে বিদ্যমান ছিল? বিগ-ব্যাং কেন হয়েছিল? কাল ও আকাশের উৎপত্তি সেই বিস্ফোরণের সাথে কীভাবে হয়েছিল? মহাবিস্ফোরণ কার মধ্যে হয়েছিল? শূন্যের মধ্যে কী? সেই সময় যখন কাল ও আকাশ দুটোই ছিল না, তখন এই দুটোর অনুপস্থিতিতে কোনো বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কীভাবে হতে পারে? কারণ যেকোনো কাজে সময় লাগে। এমন অনেক প্রশ্নের উত্তর বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের কাছে নেই।

স্টিডি স্টেট থিওরি, বাবল ইউনিভার্স, বিগ বাউন্স, মিরর ইউনিভার্স আদি অনেক কল্পিত সিদ্ধান্ত বর্তমানে প্রচলিত আছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তই এটা বলতে সক্ষম নয় যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভিক অবস্থা কী ছিল? বৈজ্ঞানিকরাও স্বীকার করেন যে বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল, তা কেউ জানে না। তাই বিগ-ব্যাং সিদ্ধান্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভিক অবস্থার ব্যাখ্যা করে না। এইভাবে **বর্তমান ভৌতিকীর কোনো সিদ্ধান্তই সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থার ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়।**

3.2 সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থার জ্ঞান থাকার আবশ্যকতা

সর্বপ্রথমে আমরা এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবো যে কোনো বস্তুর জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য আমাদের প্রথমে এটা জানা কেন আবশ্যক যে সেই বস্তুটি কী পদার্থ দিয়ে তৈরি ?

ভবন নির্মাণের প্রারম্ভ

ব্রহ্মাণ্ডের প্রাথমিক অবস্থা

যেমন, যদি আমাদের একটি ভবন নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে হয়, তবে প্রথমে আমাদের জানা উচিত যে সেই ভবনটি তৈরিতে কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে ? যেমন ভবন তৈরির জন্য আমাদের ইট, জল, সিমেন্ট, বালি আদির প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়ত, এটি জানা প্রয়োজন যে প্রথমে কী ছিল? যেমন ভবন তৈরির পূর্বে সেখানে কী ছিল? তবেই আমরা নির্মাণের প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে বুঝতে পারবো। একইভাবে, যদি আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানতে হয়, তবে প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে এটি কোন মূল পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং সেই পদার্থটি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে কী অবস্থায় ছিল? বর্তমান বিজ্ঞান সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে ভিন্ন-ভিন্ন মত পোষণ করে, এই কারণেই **সৃষ্টি উৎপত্তির বিভিন্ন ধরণের বিরোধী মত বর্তমান বিজ্ঞানের নামে প্রচলিত আছে এবং সবগুলোরই নিজস্ব যুক্তি, পরীক্ষা এবং গণিত আছে।** আমি এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিয়েছি। আপনি আপনার জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তির প্রক্রিয়া জানার জন্য তার উপাদান পদার্থ সম্পর্কে জ্ঞানের আবশ্যকতা নিজেই বুঝতে পারেন।

এখন আমরা সেই মূল পদার্থটি কী, যা দিয়ে এই সৃষ্টি তৈরি হয়েছে, তা জানার চেষ্টা করবো। তার স্বরূপ কী ? এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বে সেটি কী অবস্থায় বিদ্যমান ছিল ? বৈদিক বিজ্ঞান সেই মূল পদার্থকে 'প্রকৃতি' শব্দে সম্বোধন করে। আসুন, প্রথমে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করি।

3.3 প্রকৃতি

বৈদিক বিজ্ঞান অর্থাৎ বেদ তথা আমাদের ঋষিদের মতে এই সৃষ্টি একটি জড় পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়, পদার্থের সেই অবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। এই পদার্থটি হল যেকোনো জড় পদার্থের সবচেয়ে সূক্ষ্ম, প্রারম্ভিক এবং স্বাভাবিক অবস্থা। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান অসংখ্য বিশালতম নক্ষত্র থেকে শুরু করে সূক্ষ্মতম কণা, তরঙ্গ, আকাশ আদি পদার্থ সবই এই প্রকৃতি পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তারমধ্যেই অবস্থিত আছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের পশ্চাৎ সেই পদার্থেই বিলীনও হয়ে যাবে। এইভাবে,

পদার্থের সবচেয়ে সূক্ষ্ম অবস্থা, যা দিয়ে বর্তমানে স্বীকৃত আকাশ, তরঙ্গ ও মূলকণা থেকে শুরু করে নক্ষত্র আদি তৈরি হয়, তাকে প্রকৃতি বলা হয়।

আমাদের চারপাশে আমরা যা কিছু দেখতে পাচ্ছি অথবা দেখতে পাচ্ছি না, সেগুলো সবই সূক্ষ্ম স্তরে অণু-পরমাণু দিয়ে তৈরি। এর থেকেও আরও সূক্ষ্ম স্তরে গেলে দেখা যায় যে, পরমাণুও অতি সূক্ষ্ম কণা দিয়ে গঠিত, যাদের বর্তমানে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন বলা হয়। আবার

প্রোটন ও নিউট্রন কোয়ার্ক নামক সূক্ষ্মতম কণা দিয়ে গঠিত ধরে নেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন ওঠে যে ইলেকট্রন ও কোয়ার্ক আদি কণা কী দিয়ে তৈরি হয়েছে? আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর নেই, কারণ বর্তমানের কোনো প্রযুক্তি দিয়েই আমরা এরচেয়ে সূক্ষ্ম স্তরে জানতে পারি না। বর্তমান বিশ্বে অনেক বৈজ্ঞানিক এই সূক্ষ্ম পদার্থকে স্ট্রিং সংজ্ঞক সূক্ষ্ম কাঠামো দিয়ে তৈরি বলে মনে করেন, কিন্তু তারা স্ট্রিং সম্পর্কে খুব বেশি ব্যাখ্যা করতে পারেন না। বস্তুত, তাদের এই তথাকথিত সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র গাণিতিক ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে।

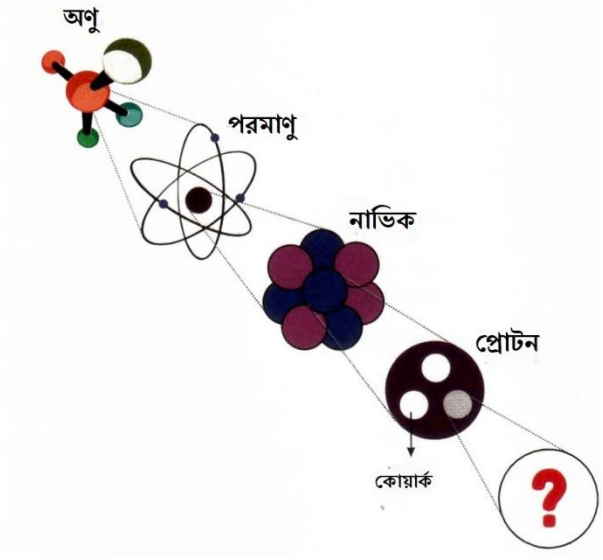

অণুর বিভাজনের বিভিন্ন পর্যায়

বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে, যে পদার্থ নিজের চেয়ে কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত হয় না, যাকে বিভাগ করতে-করতে শেষে যা অবশিষ্ট থাকে এবং সমস্ত মূলকণা, এমনকি সমস্ত তরঙ্গ ও আকাশ আদি পদার্থ যে পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়, সেটি হল প্রকৃতি পদার্থ।

3.4 প্রকৃতির স্বরূপ

আসুন, এবার আমরা বিবেচনা করবো যে প্রকৃতি পদার্থের কী কী গুণ আছে? বৈদিক ভৌতিকীতে **আদ্য মহর্ষি ব্রহ্মা** এবং **মহাদেব শিব** আদি মহান বেদবিজ্ঞানীদের মতে প্রকৃতি পদার্থের গুণাবলী নিম্নরূপ —

1. এই পদার্থের কখনো অভাব হয় না। সম্পূর্ণ সৃষ্টি তৈরি হওয়ার পরেও এই পদার্থ এখনও আমাদের চারপাশে বিদ্যমান আছে।
2. এই পদার্থ না জন্ম নেয়, না বৃদ্ধি প্রাপ্ত করে, না পুরোনো হয় আর না নষ্টও হয়। এটি এমন একটি পদার্থ যা সৃষ্টি এবং প্রলয় উভয় অবস্থাতেই সর্বদা সংরক্ষিত থাকে। সৃষ্টিতে **যত জড়**

ব্রহ্মাণ্ডের প্রাথমিক অবস্থা

পদার্থ আছে, তার মধ্যে প্রকৃতিই একমাত্র জড় পদার্থ, যার কখনও উৎপত্তি হয় না এবং কখনও বিনাশ হয় না। বাকি সমস্ত জড় পদার্থের নিজস্ব আয়ু আছে, যদিও আমরা তা না জানতে পারি, সেগুলো কখনও না কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু প্রকৃতির কোনো আয়ু নেই। এটি হল অনাদি ও অনন্ত, অজন্মা ও অমর।

3. ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তির পূর্বে এই পদার্থটি সম্পূর্ণ অবকাশ রূপ আকাশে সর্বত্র একরস ভরা থাকে, তাতে কোনো উত্থান-পতন হয় না, অর্থাৎ কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, এমন হয় না। যেন সমস্ত পদার্থ একটাই হয়। যেমন সমুদ্রে জল একরস ভরা থাকে, তেমনই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই পদার্থটি ভরা থাকে। সমুদ্রে ভরা জলের অণুগুলোর মধ্যে তো ফাঁকা স্থানও থাকে, তাদের গতিও থাকে, কিন্তু প্রকৃতি নামক পদার্থের মধ্যে এগুলোর কিছুই থাকে না।
4. এটি হল জড় পদার্থের সবচেয়ে সূক্ষ্ম অবস্থা। এরচেয়ে সূক্ষ্ম জড় পদার্থের অবস্থা এই ব্রহ্মাণ্ড কখনও সম্ভব নয়। এই পদার্থটি কণা, আকাশ, তরঙ্গ আদির রূপে হয় না।
5. মহাপ্রলয়ের অবস্থায় এই পদার্থটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। সেই সময় এই পদার্থে কোনো ধরণের কোনো নড়াচড়া হয় না।
6. এই পদার্থটি চেতন তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত হয় না। সৃষ্টির নির্মাণ করার জন্য চেতন তত্ত্ব এটিকে অবশ্যই অনুপ্রাণিত ও বিকৃত করে, কিন্তু এটিকে তৈরি করে না এবং তৈরি করতেও পারে না।
7. এটি হল পদার্থের এমন অবস্থা, যাকে কোনো প্রযুক্তি দিয়েও কখনও জানা বা গ্রহণ করা যাবে না।
8. এই সৃষ্টিতে যেসব জড় পদার্থ বিদ্যমান ছিল, আছে বা থাকবে, সেই সবকিছুর উৎপত্তির মূল কারণ হল এই জড় পদার্থই। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনো স্থান নেই, যেখানে এই প্রকৃতি নেই।
9. সম্পূর্ণ সৃষ্টি এই পদার্থ দিয়েই তৈরি এবং এই পদার্থের মধ্যেই উৎপন্ন হয়। এর বাইরে কোনো উৎপত্তি আদি ক্রিয়া কখনও হতে পারে না।
10. এই পদার্থটি এমন অন্ধকার রূপে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ অন্ধকার অন্য কোনো অবস্থায় হতে পারে না।
11. এই সৃষ্টিতে যা কিছু ধ্বংস হওয়ার যোগ্য, তা ধ্বংস হয়ে সবার শেষে তার কারণরূপী প্রকৃতি পদার্থেই বিলীন হয়ে যায়।
12. এই অবস্থায় কোনো কম্পন বিদ্যমান থাকে না আর না হওয়া সম্ভব।

13. এই অবস্থায় কোনো প্রকারের কোনো গতি থাকে না।
14. এই পদার্থ সৃষ্টির নির্মাণের জন্য পূর্ণ হয় অর্থাৎ এর অতিরিক্ত অন্য কোনো জড় পদার্থের প্রয়োজন হয় না।
15. এই পদার্থ সত্ত্ব – রজস্ – তমস্ গুণের সাম্যাবস্থার রূপে থাকে অর্থাৎ সেই সময় এই গুণগুলো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় হওয়ার কারণে অবিদ্যমানের মতোই থাকে।
16. এই প্রকৃতি পদার্থটি সমস্ত কণা থেকে শুরু করে লোক এবং আকাশ আদি সমস্ত উৎপন্ন পদার্থকে ধারণ করে।

বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সৃষ্টি উৎপত্তির পূর্ব অর্থাৎ প্রলয়কালে মূল পদার্থটি কী অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তা প্রকৃতির পূর্বোক্ত গুণাবলির মাধ্যমে জানা যায়। এইভাবে সৃষ্টির মূল পদার্থ সর্বত্র অর্থাৎ অনন্ত আয়তনে এমন এক বিরল অবস্থায় একরস হয়ে ছড়িয়ে থাকে, যেমনটা এই সৃষ্টি কালে কখনও বা কোথাও থাকতে পারে না। সেই সময় অনন্ত অন্ধকার বিদ্যমান থাকে। সেই পদার্থ অত্যন্ত শূন্য দ্রব্যমান, শূন্য ঘনত্ব এবং সর্বথা ঊর্জাহীন হয় অর্থাৎ সেই সময় ঊর্জা, প্রকাশ, তাপ, দ্রব্যমান, গতি, বল, আকাশ, ধ্বনি, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কম্পনাদি কিছুই বিদ্যমান থাকে না।

সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড যেন সেই অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে গভীর অন্ধকারে ডুবে ছিল। পদার্থ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তার বিদ্যমানতার কোনো লক্ষণ, ক্রিয়া, বল আদি একেবারেই বিদ্যমান থাকে না। সেই পদার্থ না কণা রূপে থাকে আর না তরঙ্গ রূপে থাকে। আকাশ নামক পদার্থ, যাকে স্পেস বলা হয়, সেটিও সেই সময় থাকে না, বরং সেই সময় বিদ্যমান পদার্থ এগুলোর চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম হয়, যার চেয়ে সূক্ষ্ম অবস্থা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। এই অবস্থা বিশিষ্ট পদার্থের প্রধান নাম হল প্রকৃতি। এর তিনটি গুণ থাকার কারণে একে ত্রিগুণাও বলা হয়েছে। মহাভারতে এর ত্রিশটি নাম বিশেষণ হিসেবে বর্ণিত আছে।

ক্রিয়াকলাপ

আপনার আশেপাশে পদার্থ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের থেকে সৃষ্টি উৎপত্তির প্রাথমিক ধাপগুলো বোঝার চেষ্টা করুন এবং তারপর তার তুলনা বৈদিক সৃষ্টি উৎপত্তির সাথে করুন।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রাথমিক অবস্থা

3.5 প্রকৃতির গুণ

প্রকৃতির তিনটি গুণ হল— সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলা হয়। এতে স্পষ্ট যে এই গুণগুলোর নিষ্ক্রিয় অবস্থাকেই সাম্যাবস্থা বলা হয়। এখন এই তিন গুণ নিয়ে আলোচনা করবো —

1. **সত্ত্ব** – সত্ত্ব হল সেই গুণ, যার কারণে কালক্রমে প্রকাশ ও আকর্ষণ বল আদির উৎপত্তি হয় তথা প্রাণীদের মধ্যে সুখ ও শান্তির অনুভূতি হয়।
2. **রজস্** – রজোগুণের কারণে প্রতিকর্ষণ-প্রক্ষেপক বল ও গতিশীলতার উৎপত্তি হয় অর্থাৎ এই গুণগুলোর মূল কারণ রজোগুণই হয়। প্রাণীদের মধ্যে এই গুণের কারণেই চঞ্চলতা, ক্রিয়াশীলতা, ঈর্ষা-দ্বেষ আদি গুণ উৎপন্ন হয়।
3. **তমস্** – তমোগুণের কারণে অন্ধকার, জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা, দ্রব্যমান আদি গুণের উৎপত্তি হয়। এর কারণে প্রাণীদের মধ্যে মূর্খতা, মোহ, অতি কামুকতা, আলস্য ও ক্রোধ আদি গুণ উৎপন্ন হয়।

মহাভারত অনুসারে, **মহর্ষি ব্রহ্মা**র মতে এই তিনটি গুণ একে অপরের সাথে জোড়া তৈরি করে, একে অপরের উপর নির্ভরশীল, একে অপরের সমর্থনে থাকে, একে অপরের অনুসরণ করে এবং একে অপরের সাথে মিশ্রিত থাকে। তমোগুণের জোড় সত্ত্বের সাথে, সত্ত্বের রজসের সাথে, রজসের সত্ত্বের সাথে, সত্ত্বের তমসের সাথে হয়। এটিকে বর্তমান ভৌতিকীর ভাষায় এইভাবে বোঝা যেতে পারে যে, যেখানেই দ্রব্যমান আছে, সেখানে বল অবশ্যই আছে, তা সে কেবল গুরুত্ব বলই হোক না কেন। যেখানে বল আছে, সেখানে কোনো-না-কোনো ক্রিয়া অবশ্যই হবে। যেখানে ক্রিয়া হবে, সেখানে বল অবশ্যই থাকবে, যেমন কোনো বল ফিল্ড ছাড়া হয় না এবং ফিল্ড ক্রিয়া ছাড়া হতে পারে না। একইভাবে যেখানে বল থাকবে, সেখানে দ্রব্যমানও অবশ্যই থাকবে। এতে কেবল কালই ব্যতিক্রম, প্রকৃতপক্ষে এটি ব্যতিক্রম এই কারণে যে, সেই বল চেতনের হয়, তাই সেখানে এই নিয়ম যথাযথভাবে প্রযোজ্য হয় না। তমোগুণকে নিয়ন্ত্রণ করলে রজোগুণ বৃদ্ধি পায় তথা রজোগুণকে নিয়ন্ত্রণ করলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়।

আসুন, এটিকে আমরা এইভাবে বুঝি, কোনো বস্তুর জড়তাকে নিয়ন্ত্রণ করলে তার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়, যেমন নাভিকীয় সংযোজনে দ্রব্যমান (জড়তা), ঊর্জা (গতি) তে রূপান্তরিত হয়ে যায় তথা কোনো কণার গতিকে রোধ করে তা থেকে প্রকাশ আদি ঊর্জার বৃদ্ধি হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্কাপিণ্ডের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সময় জ্বলে ওঠা এবং কোনো

ইলেকট্রনের প্রবাহে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলে প্রকাশ ও উষ্মার উৎপন্ন হওয়া (bremsstrahlung)।

উল্কাপিণ্ডের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ

মহর্ষি ব্রহ্মার মতে, যতক্ষণ পর্যন্ত সত্ত্ব গুণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ অবশ্যই রজোগুণও বিদ্যমান থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তমোগুণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ অবশ্যই সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ উভয়েরই বিদ্যমানতা থাকে। এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সত্ত্ব ও রজস্ গুণ তো তমোগুণ ছাড়াই বিদ্যমান থাকতে পারে, কিন্তু তমোগুণের বিদ্যমানতার জন্য সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ উভয়েরই বিদ্যমান থাকা বাধ্যতামূলক। কাল তত্ত্বের মধ্যে দুটো গুণ সত্ত্ব ও রজস্ বিদ্যমান থাকে এবং **তমোগুণ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।**

আসুন, আমরা এটিকে এভাবে বুঝি —

এই সৃষ্টিতে যে বস্তুতে প্রকাশ ও বল আদি গুণের বিদ্যমানতা থাকে, তাতে ক্রিয়া বা গতিশীলতা এবং খুব কম পরিমাণে জড়ত্ব বা দ্রব্যমান আদি গুণ বিদ্যমান থাকে। সর্বদা গতিশীল থাকা প্রকাশের মধ্যেও অবশ্যই দ্রব্যমান থাকে। এইভাবে প্রকাশের মধ্যে তিনটি গুণেরই বিদ্যমানতা থাকে। অন্যদিকে কোনো মূলকণা নিয়ে বিবেচনা করলে, তাতে দ্রব্যমানের পাশাপাশি গতি এবং খুব কম পরিমাণে প্রকাশও বিদ্যমান থাকে, এই কারণে সেগুলোও তিন গুণযুক্ত হয়।

এইভাবে আমরা এই অধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ডের মূল পদার্থ প্রকৃতি এবং তার সেই গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করেছি, যা সেই অবস্থায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রাথমিক অবস্থা

স্মরণীয় তথ্য

1. সৃষ্টির উৎপত্তি প্রকৃতি নামক পদার্থ থেকে হয়।
2. প্রকৃতি পদার্থে প্রকাশ এবং ক্রিয়াদি গুণের কোনোটিই বিদ্যমান থাকে না। এই কারণে সেই সময়ে বিদ্যমান মূল পদার্থকে না দ্রব্য, না উর্জা আর না আকাশ (স্পেস) বলা যেতে পারে।
3. এইভাবে প্রকৃতি অবস্থা নিম্নলিখিত স্বরূপ বিশিষ্ট হয়-
   (i.) পদার্থের আয়তন অনন্ত হয়।
   (ii.) পদার্থের দ্রব্যমান শূন্য হয়।
   (iii.) শীতলতা অনন্ত হয়।
   (iv.) ঘনত্ব শূন্য হয়।
   (v.) কোনো প্রকারের বল অথবা ক্রিয়া থাকে না। এর ফলে সেই পদার্থ সম্পূর্ণরূপে শান্ত, নিতান্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অনন্ত আয়তনে সম্পূর্ণরূপে একরস হয়ে ভরা থাকে।
   (vi.) সেটি না কণা রূপ, না তরঙ্গ রূপ এবং না আকাশের রূপে থাকে।
4. প্রকৃতি হল যেকোনো জড় পদার্থের সবচেয়ে সূক্ষ্ম, প্রারম্ভিক এবং স্বাভাবিক অবস্থা।
5. যে পদার্থ নিজের চেয়ে কোনো সূক্ষ্ম তত্ত্ব দিয়ে তৈরি হয় না, যার বিভাগ করতে-করতে শেষে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকে প্রকৃতি পদার্থ বলে।
6. প্রকৃতি পদার্থের কখনো অভাব হয় না। এই পদার্থ সৃষ্টি এবং প্রলয় উভয় অবস্থাতেই সর্বদা সংরক্ষিত থাকে।
7. প্রকৃতির তিনটি গুণ (সত্ত্ব, রজস্, তমস্) থাকে, যা সৃষ্টি উৎপত্তির পূর্বে অর্থাৎ প্রলয় কালে সাম্যাবস্থা রূপে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় থাকে।
8. সত্ত্ব হল সেই গুণ, যার কারণে পরবর্তীকালে প্রকাশ এবং আকর্ষণ বল আদির উৎপত্তি হয়।
9. রজোগুণের কারণে প্রতিকর্ষণ-প্রক্ষেপক বল এবং গতিশীলতার উৎপত্তি হয়।
10. তমোগুণের কারণে অন্ধকার, জড়তা, গুরুতা, নিষ্ক্রিয়তা, দ্রব্যমান আদি গুণের উৎপত্তি হয়।

অনুশীলনী

1. কোনো পদার্থের উৎপত্তির প্রক্রিয়া বোঝার জন্য সেই পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার পূর্বের পরিস্থিতি জানা কি বাধ্যতামূলক ? পরিষ্কার করুন।
2. ব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভিক অবস্থা কী ছিল ?
3. সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থায় হঠাৎ বিস্ফোরণ আলোড়ন কীভাবে শুরু হয়েছিল ?
4. আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টির উৎপত্তির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।
5. বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভিক অবস্থা কী ছিল ? ব্যাখ্যা করুন।
6. সৃষ্টির মূল উপাদান পদার্থ (প্রকৃতি)-এর ঘনত্ব, আয়তন এবং দ্রব্যমান কত হয় ?
7. প্রকৃতি কী ধরণের পদার্থ হয় এবং এর কী কী গুণ থাকে ?
8. প্রকৃতির গুণগুলোর সাম্যাবস্থার অর্থ কী ?
9. বিগ-ব্যাং থিওরিতে কী কী অসঙ্গতি আছে ?
10. সৃষ্টির প্রারম্ভিক অবস্থার জ্ঞান কেন প্রয়োজনীয় ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলুন।
11. কোন গুণের আধিক্যে কী তৈরি হয় ?
12. ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন তত্ত্ব আছে, যার মধ্যে তমোগুণ থাকে না ?

    (অ) কাল (ব) দিক

    (স) মহৎ (দ) প্রকাশ

13. এর মধ্যে কোনটি সত্য নয় ?

    (অ) তমসের যুগ্ম সত্ত্বের সাথে হয়।

    (ব) সত্ত্বের যুগ্ম রজসের সাথে হয়।

    (স) রজসের যুগ্ম সত্ত্বের সাথে হয়।

    (দ) রজসের যুগ্ম তমসের সাথে হয়।

14. কোনো বস্তুর গতি রোধ করলে কোন গুণ বৃদ্ধি পায় ?

    (অ) সত্ত্ব (ব) রজস্

    (স) তমস্ (দ) রজস্ এবং তমস্

15. এর মধ্যে কোন গুণ প্রকৃতি অবস্থায় বিদ্যমান থাকে ?

(অ) প্রকাশ (ব) গতি

(স) উষ্মা (দ) অন্ধকার

16. প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় এর মধ্যে কোন গুণটি থাকে না ?

(অ) অনাদি (ব) অনন্ত

(স) শব্দ (দ) একরস

* * * * *

4 অধ্যায়

কাল কি ?

গত অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে প্রকৃতি পদার্থ কী এবং তার গুণাবলী কী কী। প্রকৃতির সেই নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে মহাপ্রলয় বলা হয়। আর্ষ গ্রন্থ অনুসারে, সৃষ্টির সময়কাল যত হয়, মহাপ্রলয়ের সময়কালও ততই হল। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হলে সৃষ্টির নির্মাণ শুরু হয়। এই অধ্যায়ে আমরা জানবো যে সেই জড় রূপী প্রকৃতি পদার্থ থেকে সৃষ্টি কীভাবে উৎপন্ন হয়? সবার প্রথমে সেই প্রকৃতি থেকে কী উৎপন্ন হয়? বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে সর্বপ্রথম কালের উৎপত্তি হয়, যাকে আমরা সময় (Time) রূপে অনুভব করি। প্রথমে আমরা জেনে নিবো যে বর্তমান বিজ্ঞানে সময় কাকে বলা হয়, তারপর আমরা এই বিষয়ে বৈদিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করবো।

4.1 বর্তমান বিজ্ঞানে সময়ের ধারণা

সময় হল সেই বিষয়গুলোর মধ্যে একটি, যা আমাদের জন্য এখনও রহস্য হয়ে আছে। কেউ সময়কে দিক-কালের (spacetime) চতুর্থ আয়াম বলে, তো কেউ মস্তিষ্কের একটি ভ্রম মাত্র। আবার কিছু লোক এটিকে অতীত থেকে ভবিষ্যতে ঘটতে থাকা ঘটনার অগ্রগতি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। তারা বলে যে যদি কোনো নির্দেশ তন্ত্রে (coordinate system) সময়ের সাথে কোনো পরিবর্তন না হয়, তবে সেটি সময়হীন (timeless) হবে। আধুনিক ভৌতিকীর মধ্যে সময়কে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী ব্যবধান হিসাবেও সংজ্ঞায়িত করা হয়, কিন্তু বাস্তবে সময় কী? তা কেউ জানে না। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে সময়ের শুরু বিগ-ব্যাং এর সাথে হয়েছে, কিন্তু আধুনিক ভৌতিকীর মধ্যে এর কার্যপ্রণালী অজানা।

বর্তমানে সময়কে এক স্থানাঙ্ক (dimension) হিসাবে গণ্য করা হয়। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন নির্দেশ তন্ত্রে (reference frame) সময়ের মান ভিন্ন-ভিন্ন হয়। আকাশে সময় কোথাও ধীরে এবং কোথাও দ্রুত হওয়াও বর্তমান বিজ্ঞান স্বীকার করে।

$$\Delta t' = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

এখানে $\Delta t'$ হল গতিশীল নির্দেশ তন্ত্রে দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়, যেখানে Δt হল স্থির নির্দেশ তন্ত্রে একই ঘটনার সময়, c নির্বাতে প্রকাশের গতি এবং v হল বস্তুর গতি।

যতক্ষণ পর্যন্ত ঘড়ির আবিষ্কার হয়নি, ততক্ষণ আমরা সময়ের অনুমান দিন-রাত, আকাশে সূর্যের অবস্থান অথবা পৃথিবীতে তার ছায়া দেখে করতাম।

জয়পুরের জন্তর মন্তরে অবস্থিত সম্রাট যন্ত্র (একটি বিশাল সূর্য ঘড়ি), যার মাধ্যমে পর্যাপ্ত নির্ভুলতার সাথে সময় বলা যায়। এই যন্ত্রটির উচ্চতা ভূমি থেকে 90 ফুট।

বর্তমানে সময়ের পরিমাপ ঘড়ি দিয়ে ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ড আদিতে করা হয়, এর SI একক সেকেণ্ড, যা সিজিয়াম (Cs 133) পরমাণুর দুটি অতি সূক্ষ্ম ঊর্জা স্তরের মধ্যে বিকিরণের 9,19,26,31,770 সংক্রমণের (transition) সমান হয়। সময়ের সবচেয়ে সূক্ষ্ম একক প্ল্যাঙ্ক সময়, যা প্রায় 5.391×10^{-44} সেকেণ্ডের সমান, ধরা হয়।

কাল কি ?

আর্যাবর্তের (ভারত) কথা বললে, প্রায় 3,500 বছর পুরোনো জ্যোতিষ শাস্ত্রে কাল গণনার বিষয়ে বিস্তারিত পাওয়া যায়। জ্যোতিষে কালমানের একক নিম্নরূপ হয় —

1	ত্রুটি	=	1	সেকেণ্ডের 33750 তম ভাগ (1/33750 সেকেণ্ড)				
100	ত্রুটি	=	1	তত্পর				
30	তত্পর	=	1	নিমেষ				
18	নিমেষ	=	1	কাষ্ঠা				
30	কাষ্ঠা	=	1	কলা				
30	কলা	=	1	ঘটি (নাড়ি, দণ্ড)				
2	ঘটি	=	1	মুহূর্ত (ক্ষণ)				
15	মুহূর্ত	=	1	অহর্ (দিন)				
30	মুহূর্ত	=	1	অহোরাত্র (দিন রাত)				
10	গুরু (দীর্ঘ)	=	1	অসু (প্রাণ)				
6	অসু	=	1	পল				
60	পল	=	1	ঘটি				
60	ঘটি	=	1	অহোরাত্র				
30	অহোরাত্র	=	1	মাস				
12	মাস	=	1	বছর				
1	সেকেণ্ড	=	2.5	গুর্বক্ষর (দীর্ঘাক্ষর)	কাল	=	1/4	অসু
4	সেকেণ্ড	=	10	গুর্বক্ষর (দীর্ঘাক্ষর)	কাল	=	1	অসু
24	সেকেণ্ড	=	1	পল		=	6	অসু
1	মিনিট	=	2.5	পল		=	15	অসু
24	মিনিট	=	1	ঘটি (60 পল)		=	360	অসু
1	ঘন্টা	=	2.5	ঘটি		=	900	অসু
24	ঘন্টা	=	1	অহোরাত্র		=	21600	অসু
1	সেকেণ্ড	=	11.25	নিমেষ				
1	সেকেণ্ড	=	337.50	তত্পর				
1	সেকেণ্ড	=	33750	ত্রুটি				
1	নিমেষ	=	30	তত্পর				
1	অহোরাত্র	=	972000	নিমেষ				

[সমুল্লাস-12, বেদোক্ত জ্যোতিষ এবং বেদার্থ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী]

কাল কি ?

4.2 বর্তমান বিজ্ঞানের ‘সময়’–এর সমীক্ষা

এখানে একটি বড় কঠিন প্রশ্ন হল কাল (সময়) কাকে বলে? কাল নিয়ে অনেক পুস্তক লেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও এটা বলা হয়নি যে কাল আসলে কী? যা সর্বত্র সমান গতিতে বয়ে চলেছে? নিরন্তর প্রতিটি পদার্থের ক্ষয় করছে এবং নিরন্তর এগিয়েই চলেছে। আসলে বর্তমানে আমরা যাকে কাল (সময়) মনে করছি, সেটি হল সময়ান্তরাল। যখনই কালের কথা আসে, তখনই আমাদের মনোযোগ সবার আগে ঘড়ির দিকে যায়। ঘড়ি হল একটি যন্ত্র, যেটি কোনো অজ্ঞাত পদার্থকে মাপছে, যাকে আজ পর্যন্ত কেউ দেখতে পায়নি এবং অনুভবও করতে পারেনি। **ঘড়ি দিয়ে আমরা যাকে মাপছি, তা হল শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধান।**

আসুন, আমরা কাল নিয়ে ভিন্নভাবে চিন্তা করি —

যেমন আমরা দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কোনো জিনিস মাপছি, মনে করুন আপেল মাপছি। এই সময়ে আমরা জানি, আমরা কী জিনিস মাপছি, যেমন এখানে আমরা আপেল মাপছি। একইভাবে আমরা ঘড়ি দিয়ে কী মাপছি? যখন আমরা বলি যে এক ঘন্টা হয়ে গেছে, তখন এই এক ঘন্টা বা মিনিট কী? এই বিষয়ে আমরা অজ্ঞ। বর্তমান বৈজ্ঞানিকরা সময়কে আকাশের সাথেও জুড়ে দেখেন, কিন্তু তারা না আকাশ সম্পর্কে কিছু স্পষ্ট করেন আর না সময় সম্পর্কে। এই দুটি শব্দ কি শুধু ব্যবহারের জন্য নাকি এগুলো কোনো আসল পদার্থের নাম, যাদের এই **ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতে ভূমিকা থাকে?** আসুন, জানার চেষ্টা করি।

4.3 কালের বৈদিক ধারণা

পদার্থ বিজ্ঞানের বিশিষ্ট গ্রন্থ **বৈশেষিক দর্শনের রচয়িতা মহর্ষি কণাদ** শুধু দ্রব্যকে পদার্থ মানেন না, বরং তাদের গুণ, কর্ম আদিকেও পৃথক পদার্থ হিসাবে মেনেছেন। **মহর্ষি নয়টি দ্রব্যের মধ্যে কাল ও আকাশকেও দ্রব্য হিসাবে মেনেছেন।** তিনি দ্রব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন যে পদার্থ ক্রিয়া ও গুণের আশ্রয় হয় অর্থাৎ যার মধ্যে ক্রিয়া ও গুণ বিদ্যমান থাকে বা থাকতে পারে তথা কোনো কার্যরূপ পদার্থের সমবায় কারণ হয়, সেগুলো দ্রব্য বলে। এখানে সমবায় কারণের অর্থ হল, এই দ্রব্যগুলো তাদের থেকে উৎপন্ন পদার্থে সবসময় মিশ্রিত থাকে। এখানে আমরা শুধু ‘কাল’ নামক দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করছি। **মহর্ষি কণাদ** কাল, আকাশ ও

দিশার বিষয়ে অন্যান্য দ্রব্য থেকে আলাদা করে লিখেছেন যে, কাল, আকাশ ও দিশা হল নিষ্ক্রিয় পদার্থ। কালের লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন ছোট, বড় হওয়ার সাথে-সাথে দ্রুত ও বিলম্ব হওয়া আদি আচরণ হল কালের লক্ষণ।

মহর্ষি কণাদ তো প্রথমে দ্রব্যকে ক্রিয়া ও গুণ সম্পন্ন বলেছেন; আবার এদের মধ্যে তিনটি দ্রব্য কাল, আকাশ ও দিশাকে নিষ্ক্রিয় বলেছেন। এর রহস্য কী? এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, কাল কি সর্বদা নিষ্ক্রিয় এবং কেবল ব্যবহারে আসা এক কাল্পনিক দ্রব্য? মহর্ষি কণাদের দৃষ্টিতে কাল এমন একটি দ্রব্য, যা ক্রিয়াশীল হওয়ার পাশাপাশি নিষ্ক্রিয়ও বটে। অন্যদিকে **মহর্ষি য়াস্ক**-এর মতে, কাল এমন একটি পদার্থ যার মধ্যে প্রেরণ, ধারণ, গমন ও অধিগ্রহণ আদি কর্ম বিদ্যমান থাকে।

বস্তুত, কাল হল একটি দ্রব্য, যার স্বরূপ নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। অন্যদিকে সময় হল ব্যবহারে আনা একটি নির্দেশক মাত্র। আসুন, একটি উদাহরণের মাধ্যমে এটি বোঝার চেষ্টা করি। মনে করুন, আমরা দাঁড়িপাল্লায় আপেল ওজন করছি এবং আপেলের ওজন দাঁড়ালো ৫ কেজি। এখানে ওজন হল আপেল নামক দ্রব্যের একটি গুণ, আর সেই ওজনের মান '৫ কেজি' হল একটি পরিমাপ। আপেল হল সেই দ্রব্য যাকে মাপা হচ্ছে। একইভাবে, যখন আমরা দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান মাপি, তখন কাল ও সময়ের মধ্যে সেই একই সম্পর্ক থাকে যা আপেল ও ওজনের মধ্যে থাকে।

4.4 কালের উৎপত্তি

যখন সৃষ্টি নির্মাণের সময় আসে, সেই সময় যে ক্রিয়া সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়, তা হল এইরকম —

সর্বপ্রথম সর্বব্যাপক চেতন তত্ত্বের মধ্যে সৃষ্টি উৎপন্ন করার কামনা উৎপন্ন হয়। এটি হল সৃষ্টি উৎপত্তির সর্বপ্রথম ধাপ। এটি খেয়াল রাখা দরকার যে **জড় পদার্থের মধ্যে কোনো প্রবৃত্তি স্বতঃ হয় না।** যেভাবে আমাদের শরীর জড় হয় এবং চেতনার কারণে আমাদের শরীরে কাজ করার ইচ্ছা মনে উৎপন্ন হয়। সেইভাবে প্রকৃতি থেকে স্বতঃ সৃষ্টি উৎপত্তি হয় না এবং হতেও পারে না। এই কামনা উৎপন্ন হওয়ার পর যে পদার্থ সবার প্রথমে উৎপন্ন হয়, সেটিই হল কাল।

এবার আমি সৃষ্টি উৎপত্তির প্রথম ধাপের আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো। সবার প্রথমে চেতন তত্ত্ব প্রকৃতির সত্ত্ব, রজস্ ও তমস্, এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থায় 'ওম্' রশ্মির কম্পনকে সূক্ষ্মতম পরা রূপে সর্বত্র উৎপন্ন করে, এই 'ওম্' রশ্মিই সেই তিনটি গুণকে জাগ্রত বা সক্রিয়

করে। এদের মধ্যেও সর্বপ্রথম কাল তত্ত্বকে উৎপন্ন করার জন্য সত্ত্ব ও রজস্, এই দুটি গুণকেই জাগ্রত করে। এই দুটি গুণ উৎপন্ন হতেই কাল তত্ত্ব সক্রিয় হয়ে যায়। এই অবিরাম সক্রিয় কাল তত্ত্ব ত্রিগুণা প্রকৃতিকে জাগাতে অর্থাৎ সক্রিয় করতে শুরু করে। এই কাল তত্ত্ব দুটি গুণ সমন্বিত প্রকৃতি পদার্থে অব্যক্ত ভাবে সঞ্চারিত 'ওম্' রশ্মির রূপে থাকে। এইভাবে সেই 'ওম্'-এর সবচেয়ে সূক্ষ্মতম রূপ মূল প্রকৃতির সঙ্গে মিলেই কালের রূপ ধারণ করে।

এই অবস্থায় মূল প্রকৃতির মতো গুণের সাম্যাবস্থা থাকে না, এই কারণে একে সম্পূর্ণ অব্যক্ত মানা যায় না। এর ফলে তাতে অতি সূক্ষ্মতম বলও উৎপন্ন হয়। 'ওম্' রশ্মি সম্পূর্ণ মূল পদার্থে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই সময়েও প্রকৃতির সাম্যাবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ হয় না। প্রকৃতির এই অবস্থাই কাল নামে পরিচিত। 'ওম্' রশ্মির চেতনার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক থাকে। এই অবস্থা প্রকৃতিতে উৎপন্ন হয়, এই কারণে এটি জড় পদার্থ, কিন্তু যেহেতু এটি চেতন তত্ত্বের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, এই কারণে এটি চেতনের মতো আচরণ করে।

প্রকৃতির সেই প্রায় অব্যক্ত (সম্পূর্ণ অব্যক্ত নয়) অবস্থা, যেখানে 'ওম্' রশ্মির সর্বাধিক সূক্ষ্ম রূপের অব্যক্ত সঞ্চারণ ঘটে গেছে, যার ফলে প্রকৃতির সত্ত্ব ও রজোগুণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপে ব্যক্ত হয়ে যায়, কিন্তু তমোগুণ সম্পূর্ণ অব্যক্তই থাকে। অতি সূক্ষ্ম আকর্ষণ বল ও গতির উৎপত্তি যুক্ত প্রকৃতি পদার্থের এই অবস্থার নামই হল কাল, যা সম্পূর্ণ প্রকৃতি এবং তার থেকে উৎপন্ন পদার্থগুলোতে সবসময় প্রারম্ভিক বল উৎপন্ন করতে থাকে।

4.5 কালের স্বরূপ

1. কালতত্ত্বে প্রকৃতির সত্ত্ব ও রজস্ গুণ বিদ্যমান থাকে। এতে তমোগুণ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, তাই তার অভাবই থাকে। এই কারণে কালতত্ত্ব অবিরাম গতিশীল থাকে, এটি কখনও থামে না।
2. কাল ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পদার্থে তিনটি গুণের কম বা বেশি পরিমাণ অনিবার্যভাবে বিদ্যমান থাকে।
3. কাল হল সর্বব্যাপক, অবিরাম গমনশীল একরস তত্ত্ব, যা প্রতিটি পদার্থকে প্রেরণা জোগায়, কিন্তু নিজে সর্বোচ্চ চেতন তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোনো পদার্থ দ্বারা প্রেরিত হয় না।
4. কালের প্রেরণা থেকেই মন, প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয় এবং এইসব থেকে নানা পদার্থের উৎপত্তি হয়।
5. কালতত্ত্বই অনেক প্রকারের পদার্থ ও কর্মের বীজরূপ হয়। সৃষ্টির সমস্ত দ্রব্য, কর্ম, গুণ আদির

বীজ হল এই তত্ত্বই, কিন্তু এটি তাদের সাধারণ নিমিত্ত কারণ হয়, উপাদান নয়। এর অর্থ হল, কাল তত্ত্বের মধ্যে স্বয়ং এই পদার্থগুলোর একটি অবয়ব নেই।

6. কাল তত্ত্ব মনস্ তত্ত্ব আদিকে প্রেরিত করে সাতটি ব্যাহৃতি রশ্মি (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্) উৎপন্ন করে। এই সাতটি রশ্মির দ্বারাই কাল তত্ত্ব পরবর্তী রশ্মিগুলোকে উৎপন্ন করে।
7. কাল তত্ত্ব নিত্য অর্থাৎ অজন্মা ও অবিনাশী পদার্থকে জীর্ণ করে না এবং করতেও পারে না, অথচ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কাল ব্যাপ্ত হয়ে তাদের নিরন্তর জীর্ণ করতে থাকে।

কাল তত্ত্ব, যা হল প্রকৃতির উপরোক্ত অবস্থা, সেটিই ত্রিগুণা প্রকৃতিকে মহৎ তত্ত্ব আদিতে পরিবর্তিত করে এবং পুনরায় সেটিকে প্রেরিত করে। এই প্রক্রিয়ায় কাল তত্ত্ব প্রকৃতির তমোগুণকেও সক্রিয় করে মহৎ তত্ত্বাদি পদার্থের নির্মাণ করে। এইভাবে সেটি বিভিন্ন পদার্থকে নিজের প্রেরণা দ্বারা উৎপন্নও করে এবং পুনরায় তাদের প্রেরিত ও ধারণও করে। আধুনিক বিজ্ঞানও দ্রব্যকে ঊর্জা দ্বারা নির্মিত, প্রেরিত মানে, তার পাশাপাশি ঊর্জা দ্বারা দ্রব্যকে ধারণ করা ও তারই রূপও মানে। পরা 'ওম্' রশ্মি যুক্ত প্রকৃতি পদার্থ, যা কাল তত্ত্ব নামে পরিচিত, সেটি কখনো জীর্ণ হয় না। প্রলয় অবস্থাতেও প্রকৃতিকে প্রেরিত না করে অব্যক্ত রূপে এই তত্ত্ব যথাযথ বিদ্যমান থাকে। এইভাবে আমরা বলতে পারি যে কাল (বা ওম্ রশ্মি) সক্রিয় হওয়াই হল সৃষ্টির সর্বপ্রথম ধাপ, বাস্তবে কাল অব্যক্ত অবস্থায় সবসময়ে বিদ্যমান থাকে।

'ওম্'-এর সূক্ষ্মতম স্বরূপ তথা বিভিন্ন অক্ষররূপ বাক্ তত্ত্বের কখনো পূর্ণ বিনাশ হয় না, এই কারণেই এদের অক্ষর রশ্মি বলে। তবে হ্যাঁ, মহাপ্রলয় কালে এই সর্বথা অব্যক্ত অক্ষর 'ওম্'-এর প্রকৃতি রূপ পদার্থের সাথে সাক্ষাৎ সক্রিয় সম্পর্ক থাকে না। কাল তত্ত্ব অবশ্যই তার অব্যক্ততম রূপে বজায় থাকে। এটি প্রলয়কাল পর্যন্ত এই রূপেই বজায় থাকে তথা অন্যান্য প্রকৃতি রূপ পদার্থে এটি বীজ রূপে অনাদি ও অনন্ত রূপে সবসময়ে বিদ্যমান থাকে। এই অজর কাল চক্রের কারণেই সৃষ্টি-প্রলয়ের চক্র নিয়মিত ও নিরন্তর চলতে থাকে। অক্ষর রশ্মি সম্পর্কে আমরা পরের অধ্যায়ে পড়বো।

সারসংক্ষেপঃ এই সৃষ্টিতে সূক্ষ্মতম থেকে শুরু করে স্থূলতম পদার্থ পর্যন্ত সব পদার্থই কাল থেকে উৎপন্ন ও কাল থেকেই প্রেরিত হয়।

4.6 কাল কা ক্রিয়া বিজ্ঞান

এখন প্রশ্ন হল কালতত্ত্বের ক্রিয়াবিজ্ঞান কী ? আসুন, আমরা এটি বুঝতে চেষ্টা করি —

কাল কি ?

যখন পরা 'ওম্' রশ্মি (কাল) সর্বপ্রথম মূল প্রকৃতি তত্ত্বকে সৃষ্টির সবচেয়ে সূক্ষ্ম প্রেরণা দিয়ে তাকে বিকৃত করা আরম্ভ করে। প্রকৃতিতে অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান বিভিন্ন অক্ষর রশ্মিগুলো জাগ্রত হয়ে ধীরে-ধীরে মূল প্রকৃতিকে মহৎ, অহংকার ও মনস্তত্ত্ব রূপে উৎপন্ন করে, কিন্তু সত্ত্ব ও রজস্ গুণযুক্ত প্রকৃতি তথা 'ওম্'-এর কালরূপ নিজে সবসময় অবিকৃত থেকে তমোগুণের সাথে অন্য দুই গুণযুক্ত প্রকৃতিকেই সৃষ্টি রচনার জন্য প্রেরিত ও বিকৃত করে। সেই কাল তত্ত্ব 'ওম্'-এর পশ্যন্তী রূপকে উৎপন্ন করে মনস্তত্ত্বে স্পন্দন ও ক্রিয়াশীলতা উৎপন্ন করে সপ্ত ব্যাহৃতি রূপী সূক্ষ্ম রশ্মিগুলোকে উৎপন্ন করে। এরপরে সেই রশ্মিগুলোকে সাধন বানিয়ে প্রাণ, অপান আদি সাত মুখ্য প্রাণ রশ্মি, পুনরায় অন্যান্য প্রাণ, মরুৎ ও ছন্দ রশ্মিগুলোকে উৎপন্ন করে সৃষ্টি চক্রকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানেও কাল তত্ত্ব প্রত্যেক পদার্থ — মূলকণা, তরঙ্গ, আকাশ আদির ভিতরে বিদ্যমান থেকে তাদের ভিতরে বিদ্যমান 'ওম্'-এর পশ্যন্তী রূপ, ব্যাহৃতি সূক্ষ্ম রশ্মি থেকে শুরু করে সমস্ত রশ্মিকে প্রেরিত করে সবাইকে সক্রিয় করে, সাথে-সাথে তাদের মধ্যে উপযুক্ত জীর্ণতাও আনতে থাকে।

প্রশ্নঃ এই প্রেরণ ও জাগরণ কর্ম কী ?

উত্তরঃ আমরা লোকের মধ্যে অনুপ্রেরণা বা জাগরণের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ দেখি। একজন ব্যক্তি কোনো পশুকে লাঠি দিয়ে হাঁকায়, তখন সে সেই পশুকে লাঠি দিয়ে কোনো কাজ করার অনুপ্রেরণা করে। পিতা তার উদ্দণ্ড পুত্রকে তাড়না দিয়েই অনুপ্রেরণা করে, তাকে ধাক্কা মেরে-মেরে কোথাও পাঠিয়ে দেয়। সেই অনুপ্রেরণার পরে সেই পুত্র যেতে বা কাজ করতে বাধ্য হয়। আবার সেই পিতাই তার বুদ্ধিমান এবং আজ্ঞাকারী পুত্রকে চোখের ইশারা মাত্রেই অনুপ্রেরণা করে দ্রুত ক্রিয়াশীল করে তোলে। অন্যদিকে একজন ব্যক্তি কোনো কাজ দ্রুত করতে-করতে কোনো শোক সংবাদে আহত হয়ে নিজেকে দুর্বল মনে করে বসে পড়ে, সে সত্যিই দুর্বল হয়েও যায়। সারসংক্ষেপঃ চেতন তত্ত্ব কালকে অব্যক্ত ও অজ্ঞেয় ভাব থেকে প্রেরিত ও উৎপন্ন করে। পুনরায় কাল প্রকৃতিতে সূক্ষ্ম প্রেরণ ও স্পন্দন আরম্ভ করে। প্রকৃতি স্পন্দিত ও বিকৃত হয়ে মহৎ-অহংকার ও মনস্তত্ত্বে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এরপরে সেই প্রেরণ স্পন্দন প্রক্রিয়া এভাবেই চলতে থাকে। **যেকোনো পদার্থে তার পূর্ববর্তী পদার্থের প্রেরণ অবশ্য বিদ্যমান থাকে।** এই ভাবে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পদার্থ পরস্পর চেতন তত্ত্ব ও কালের প্রেরণ দ্বারা এক শৃঙ্খলায় বন্ধ হয়ে কার্য করে। কাল, চেতন তত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব আদির প্রেরণ কর্ম অতি সূক্ষ্ম, তাই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

4.7 সময় যাত্রা (টাইম ট্রাভেল) কি সম্ভব ?

কাল কি ?

কিছু মানুষ কালে আগে ও পিছিয়ে যাওয়ার (সময় যাত্রা) কথা বলেন, কিন্তু তা কি সম্ভব ? আসুন জানার চেষ্টা করি —

কালের পেছনে যাওয়া অর্থাৎ অতীতে যাওয়ার অর্থ কী? কোনো বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক কি কালের পেছনে গিয়ে নিজের তরুণ বা শিশু রূপকে দেখতে পারেন, এবং একই সাথে তিনি কি সেই রূপটি ফিরে পেতে পারেন? তিনি কি সেই সব ব্যক্তিদের সাথে দেখা করতে পারেন, যারা বর্তমানে মৃত? তিনি কি রামায়ণ বা মহাভারত কালে গিয়ে সেই যুগে বসবাসকারী মানুষ ও তৎকালীন সম্পূর্ণ পরিস্থিতি দেখতে বা পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন? এমনটা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, আমি এটি স্বীকার করি যে ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকরা কোনো প্রযুক্তির উদ্ভাবন করে মহাভারত যুদ্ধের শব্দগুলো জানতে পারেন (কারণ বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে শব্দ নিত্য হয়), কিন্তু বাস্তবে তারা তৎকালীন পরিস্থিতিগুলোকে পুনরায় উৎপন্ন করতে পারবেন না। কোনো রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে বৃদ্ধ ব্যক্তি তরুণ হতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সময় ফিরে এসেছে। বিজ্ঞান বল ও ঊর্জার কোনো বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্যে কোনো পদার্থ বিশেষে হতে চলা প্রক্রিয়াসমূহকে মন্থর বা দ্রুত করতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কালের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এমনটি করা হয়েছে।

যখন আমরা ভবিষ্যতে যাওয়ার কথা ভাবি, তখন এর অর্থ কী দাঁড়ায়? আপনি কি ভবিষ্যতে ঘটা প্রতিটি পরিস্থিতি সরাসরি দেখতে পারেন? এটি একটি নিছক কল্পনা। অতীত নির্দিষ্ট হলেও ভবিষ্যৎ তো নির্দিষ্টও নয়, তবে তার চাক্ষুষ দর্শন কীভাবে সম্ভব ? কোনো উচ্চস্তরের য়োগী ভবিষ্যতের কিছু অনুমান করতে পারেন, এটি সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় না যে তিনি কালে এগিয়ে গিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি কি সময় যাত্রা করে নিজেকে চিতায় জ্বলতে দেখতে পারেন? চোখের পলকে কি ভবিষ্যতের ভূগোল সাক্ষাৎ করা সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা গণিতকেই ধ্রুব সত্য মনে করে কালকে না বুঝেই এমন কথা বলেন। তারা আইনস্টাইনের সাপেক্ষতার সিদ্ধান্তের ব্যাপক অপব্যবহার করছেন। বাস্তবে তারা কাল এবং সময়ের ব্যাপ্তির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছেন না। যদি কোনো ব্যক্তি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতাকে অথবা তাদের মাপক মিটার, ফুট আদিকেই আকাশ মেনে নেন, তাহলে কি এটা তার ভ্রম হবে না? এই একই অবস্থা ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ড আদি অবধি মাপার মাপকগুলোকে কাল মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রেও হবে। বৈদিক বিজ্ঞান থেকে অনভিজ্ঞ বর্তমান বিজ্ঞান এভাবেই বহু শতাব্দী ধরে ভুল করছে এবং ভবিষ্যতেও এমনটা চলতে থাকবে, এমনটাই আমার অভিমত।

স্মরণীয় তথ্য

1. কাল একটি নিষ্ক্রিয় দ্রব্য, যা পরা 'ওম' রশ্মি দ্বারা ত্রিগুণ প্রকৃতি থেকে সর্বপ্রথম উৎপন্ন হয়।
2. কাল তত্ত্বে প্রকৃতির দুটি গুণ সত্ত্ব ও রজস্ বিদ্যমান থাকে এবং তমস্ গুণ সর্বথা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।
3. কালে তমস্ গুণ না থাকার কারণে, এটি সর্বদা গতিশীল থাকে।
4. কাল তত্ত্ব ত্রিগুণ প্রকৃতিকে মহৎ তত্ত্ব আদিতে পরিবর্তিত করে পদার্থ নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে।
5. কাল তত্ত্ব নিত্য ও অবিনাশী পদার্থগুলোকে জীর্ণ করে না, যখন কিনা অনিত্য পদার্থগুলোকে নিরন্তর জীর্ণ করতে থাকে।
6. কালের পিছনে যাওয়া অর্থাৎ অতীতে যাওয়ার মতো কথাগুলো কেবল কল্পনা মাত্র, এমনটা সম্ভব নয়।

অনুশীলনী

1. সৃষ্টি উৎপত্তির প্রাথমিক ধাপ কী ?
2. কাল কি একটি কাল্পনিক বস্তু ? যদি হ্যাঁ, তবে কীভাবে ? এবং যদি না, তবে কাল কী ?
3. কাল কাকে বলে ?
4. কালে আগে বা পিছনে যাওয়া কেন সম্ভব নয় ?
5. কালের স্বরূপ কী ? সৃষ্টি নির্মাণে এর কী ভূমিকা আছে ? এর ক্রিয়াবিজ্ঞান বোঝান।
6. বর্তমান বিজ্ঞানের সময় এবং কালের মধ্যে কী পার্থক্য আছে ?
7. প্রেরণের প্রক্রিয়া বলতে আপনি কী বোঝেন ?
8. কাল কোন পদার্থগুলোকে জীর্ণ করে না ?
9. কাল নিত্য না অনিত্য ? কালকে নিত্য মানলে কী চার নিত্য পদার্থ (ঈশ্বর, আত্মা, প্রকৃতি ও

কাল) বলে গণ্য করা হবে ?

10. বর্তমান পদার্থবিদ্যার কাল (সময়) ধারণার পর্যালোচনা করুন।

11. বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিতে কালের উৎপত্তি প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলুন।

12. সময় যাত্রা (টাইম ট্রাভেল) সম্পর্কে আপনার কী মতামত ? যুক্তি সহ লিখুন।

13. এক ঘন্টায় কত নিমেষ হয়?

ক্রিয়াকলাপ

সময় (টাইম) কী ? বর্তমান বিজ্ঞান এ সম্পর্কে কী বলে ? অধিক তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন এবং শেষে এর তুলনা বৈদিক ভৌতিকীতে বর্ণিত কালের সাথে করুন।

5 অধ্যায়

সৃষ্টি উৎপত্তির প্রারম্ভিক পর্যায়

কাল তত্ত্বের পরে যে পদার্থটি প্রথম উৎপন্ন হয়, তাকে বৈদিক ভৌতিকীতে মহৎ বলা হয়েছে। এই সৃষ্টিতে এটিই সেই প্রাথমিক উৎপন্ন পদার্থ, যা বল, ক্রিয়া আদির বীজস্বরূপ হয় তথা যার মধ্যে বিকৃতির পরিণামস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়। মহতের উত্তেজিত অবস্থাকে অহংকার বলা হয় এবং অহংকারের উত্তেজিত অবস্থাকে মন বলা হয়। যেমন কাঁচা আম কিছু পরিবর্তনের সাথে আধপাকা আমে রূপান্তরিত হয় এবং তারপর সেই আধপাকা আম পাকা আম হয়ে যায়।

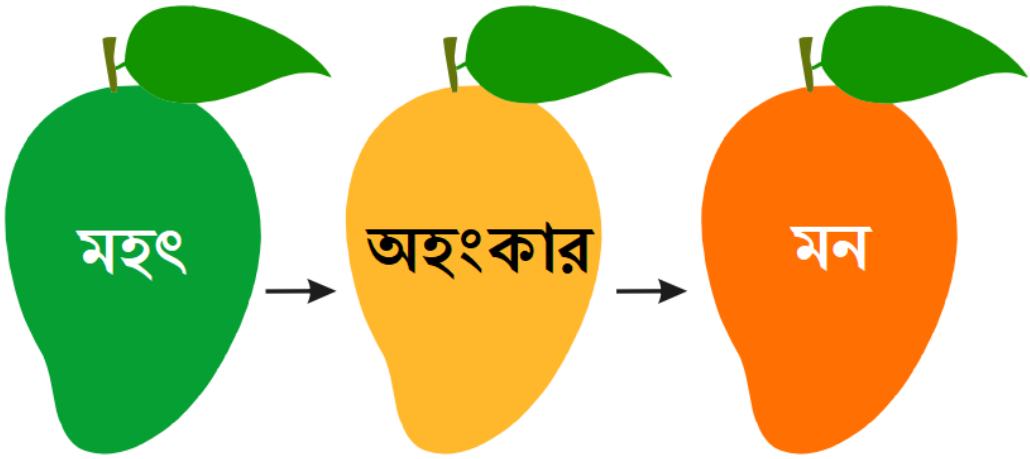

5.1 মহৎ তত্ত্ব

মহৎ তত্ত্বও অব্যক্ত প্রকৃতির লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ অব্যক্তের মতোই হয়, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অব্যক্ত হয় না। সাংখ্যদর্শনে মহর্ষি কপিল মহৎ, অহংকার এবং মন তিনটি পদার্থকে পৃথক-পৃথক মনে করেছেন। এখানে মহৎ তত্ত্বের স্বরূপ নিম্নরূপ —

1. এই পদার্থ সূক্ষ্ম, কিন্তু ব্যাপক বল এবং অতি মন্থর অব্যক্ত দীপ্তিযুক্ত হয়।
2. এই মহৎ তত্ত্বই সর্বপ্রথম সংযোগ, বিয়োগ আদি গুণযুক্ত হয়ে নানা পদার্থের নির্মাণ শুরু করে।
3. মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর দৃষ্টিতে কারণ বিদ্যুৎও (বিদ্যুতের সূক্ষ্মতম রূপ) এটাই হয়, যা

একরস প্রকৃতি অবস্থার সামান্য বিক্ষুব্ধ রূপে বিদ্যমান থাকে।

4. এই পদার্থটি সমস্ত পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করার স্বভাবের হয় অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম বলের উৎপত্তি সর্বপ্রথম এখানেই হয়।
5. এখান থেকেই জড় পদার্থ যেন প্রকটাবস্থায় আসতে শুরু করে অর্থাৎ প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা ভঙ্গ হয়ে যায়।
6. এই পদার্থটি সমস্ত পদার্থকে ধারণ করতে সক্ষম হয়।
7. এর কারণেই প্রতিটি পদার্থ সংরক্ষিত ও গতিশীল থাকতে পারে।

এই পদার্থে সর্বত্র আকর্ষণ এবং ভেদক বল উৎপন্ন হয়ে ক্রিয়াশীলতা উৎপন্ন হতে থাকে।

5.2 অহংকার

মহর্ষি কপিল-এর দৃষ্টিতে মহৎ তত্ত্বের চরম অর্থাৎ অগ্রিম রূপই অহংকার বলা হয়। অহংকার তত্ত্ব সত্ত্ব, রজস্ ও তমসের প্রধানতা অনুসারে যথাক্রমে বৈকারিক, তৈজস এবং ভূতাদি নাম ধারণ করে। মহৎ তত্ত্ব সেই সময় অহংকার বলা হয়, যখন এটি সৃষ্টি উৎপত্তির দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ নিজের প্রকট অবস্থায় থাকে। এরথেকে বিভিন্ন দেব পদার্থ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন এবং তিন ব্যাহৃতি রূপ সূক্ষ্ম ছন্দ রশ্মি রূপী লোক উৎপন্ন হয়, পাশাপাশি সমস্ত ছন্দ রশ্মি এর থেকেই উৎপন্ন হয়। এই সম্পূর্ণ সৃষ্টি অহংকার রূপই হল এবং তারই দ্বারা বিভিন্ন কামনা অর্থাৎ আকর্ষণ আদি বল যুক্ত হয়।

এখানে আমরা **অহংকার বা মহৎ তত্ত্বের** স্বরূপ নিয়ে ভাবলে স্পষ্ট হয় যে এতে বিদ্যুৎ আবেশ, দ্রব্যমান এবং স্পষ্ট ও অপেক্ষিত গতিশীলতা আদির প্রাদুর্ভাব হয় না। এমন পরিস্থিতিতে **বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় এটি না তো দ্রব্য হয়, না ঊর্জা এবং না আকাশ হয়। বৈদিক ভাষায় একে দ্রব্য ও ঊর্জা উভয়ই বলা যেতে পারে,** কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় এই পদার্থটি এখনও কল্পনাতীত।

আসুন, আমরা এই বিষয়ে আরও অধিক চিন্তন করার চেষ্টা করি। কাল তত্ত্ব সক্রিয় হওয়ার সাথে-সাথেই সম্পূর্ণ ত্রিগুণা প্রকৃতিতে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন হতে শুরু করে এবং 'ওম্' রশ্মির পরা অবস্থা অব্যক্ত ভাব থেকে সর্বত্র সঞ্চারিত হতে থাকে অর্থাৎ কাল তত্ত্বের সম্পূর্ণ প্রকৃতিতে সঞ্চারণ হতে থাকে। এই সঞ্চারণ এমন হয় যে সত্ত্বাদি তিনটি গুণ সক্রিয় হয়ে ওঠে, এই অবস্থাকেই মহৎ বলা হয়। একে এইভাবে বুঝেনিন যে যখন পরা 'ওম্' রশ্মি সত্ত্ব এবং রজস্, এই

দুটি গুণকেই সক্রিয় করে, তখন মূল প্রকৃতি কাল তত্ত্বের রূপ ধারণ করে এবং যখন পরা 'ওম' রশ্মি (কাল তত্ত্ব) সেই মূল প্রকৃতির তিনটি গুণকে সক্রিয় করে, তখন সেটি মহৎ তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবকাশ রূপ আকাশে একরস হয়ে ভরা থাকে অর্থাৎ এতেও প্রায় কোনো উত্থান-পতন হয় না। 'ওম' রশ্মির পরা অবস্থা সম্পূর্ণ পদার্থে একসাথে ব্যাপ্ত থাকে, যার ফলে তিনটি গুণ সবচেয়ে সূক্ষ্ম রূপে সক্রিয় বা জাগ্রত হতে শুরু করে। এর ফলে সেই পদার্থে এমন এক মৃদু দীপ্তি তৈরি হয়, যা সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে অন্য কোথাও হয় না। এই সৃষ্টিতে আমরা যে গভীর অন্ধকার দেখি, তার চেয়েও গভীর অন্ধকার মহৎ তত্ত্বে থাকে। মহৎ-এর চূড়ান্ত অবস্থা রূপ অহংকারও এমন অন্ধকারযুক্ত হয়। এই সময় পরারূপ 'ওম' রশ্মি ছাড়া অন্য কোনো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম রশ্মিও উৎপন্ন হতে পারে না।

5.3 মনস্তত্ত্ব

যখন সর্বত্র ব্যাপ্ত অহংকার তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' ছন্দ রশ্মির পশ্যন্তী রূপের সঞ্চার হয়, তখন অহংকারের সেই অবস্থাই মনস্তত্ত্ব নামে পরিচিত হয়। মনও মহৎ তত্ত্ব বা অহংকারের মতো সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। এটি নিজের থেকে উৎপন্ন প্রতিটি পদার্থকে বাইরে ও ভিতর থেকে ব্যাপ্ত করে। এই পদার্থ 'ওম্' রশ্মির পশ্যন্তী রূপের সাথে মিলিত হয়ে তাকে নিজের সাথে ধারণ করে রাখে। মনস্তত্ত্বের সার হল 'ওম্'-এর পশ্যন্তী রূপ এবং এই বাক্ তত্ত্ব থেকেই সমস্ত কর্ম উৎপন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই 'ওম্' রশ্মির কারণেই মনস্তত্ত্ব সক্রিয় হয় অথবা অহংকার তত্ত্ব মনস্তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। যদি মহৎ তত্ত্ব, মনস্তত্ত্বকে একটি সূক্ষ্ম ঊর্জার মতো মনে করে বিবেচনা করা হয়, তাহলে এমন মনে হয় যে এই অদৃশ্য ও অগ্রাহ্য ঊর্জা নগণ্য ক্ষমতা সম্পন্ন, যা একরসভাবে সর্বত্র ভরা থাকে। এর রশ্মিগুলো প্রায় শূন্য অথবা অতি অল্প আবৃত্তি এবং অনন্তের সমতুল্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয়। এর ফলে এই তত্ত্বটিও প্রায় অচল রূপে সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে। মনস্তত্ত্বের ভিতরে সমস্ত সংযোগ-বিয়োগাদি ক্রিয়া এই রশ্মির কারণেই শুরু হয়। এই 'ওম্' রশ্মি রূপ বাক্ তত্ত্বই মনস্তত্ত্বকে সর্গ প্রক্রিয়া শুরু করার যোগ্য করে তোলে অর্থাৎ তাকে সক্রিয় করে।

এইভাবে সম্পূর্ণ অবকাশরূপ আকাশ সেই সময় মনস্তত্ত্ব এবং 'ওম্'-এর পশ্যন্তী রূপের মিশ্রণে ভরে যায়। সেই সময় সম্পূর্ণ পদার্থে কিছু ব্যক্ত, কিন্তু মানুষের প্রযুক্তিগত দৃষ্টিতে অব্যক্ত দীপ্তি ও সূক্ষ্মতম আলোড়ন বিদ্যমান থাকে। এখানে মনস্তত্ত্ব আগামী পদার্থের উৎপত্তির জন্য সক্ষম হয়ে উঠে। এই পদার্থে এখনও একরসতা ভঙ্গ হয়নি, কিন্তু হওয়ার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, বীজ বপন করার আগে যেমন লাঙল দিয়ে জমি তৈরি করা

হয় এবং বীজ বোনার জন্য তৈরি হয়ে থাকে, ঠিক সেই ভাবে মনস্তত্ত্ব অগ্রিম স্তরের পশ্যন্তী রশ্মিগুলো তৈরির জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তারপরে অন্যান্য পদার্থের উৎপত্তির প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে শুরু হবে।

5.4 মনস্তত্ত্বে স্পন্দনের প্রক্রিয়া

মনস্তত্ত্বে সর্বপ্রথম সূক্ষ্ম পরিমাণের স্পন্দন হয়, যা দৈবী গায়ত্রী আদি সাত ভাগে বিভক্ত হয়। তার পরে ক্রমান্বয়ে বড় পরিমাণে স্পন্দন উৎপন্ন হতে থাকে। এই স্পন্দনগুলো অত্যন্ত দ্রুত

গতিতে এবং খুব ব্যাপক স্তরে পরস্পর মিশ্রিত ভাব বজায় রেখে হয়, তবুও সেই সমস্ত স্পন্দনের পৃথক-পৃথক্ কিন্তু অজ্ঞেয় অস্তিত্ব সবসময় বজায় থাকে। যেভাবে কোনো পুকুরে অনেক স্থানে পাথর ফেললে অনেক তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেগুলো পরস্পর ধাক্কা খায়, মিশ্রিত হতে থাকে বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের পৃথক অস্তিত্ব সবসময় বজায় থাকে এবং যেভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডে অনেক প্রকারের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, পরস্পর ধাক্কা খেয়ে কিছু মুহূর্তের জন্য সুপার পজিশনের পরিস্থিতিও তৈরি করে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এদিক-ওদিক গতিও করে, তবুও তাদের পৃথক অস্তিত্ব সবসময় বজায় থাকে। যদি এমন না হতো তাহলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে দৃশ্য, শ্রাব্য এবং সঞ্চার আদি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যেত। ঠিক সেভাবেই সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায়ে মহৎ তত্ত্বের মধ্যে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিরূপী যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেগুলো অতি দ্রুত গতিশীল হওয়া সত্ত্বেও এবং পরস্পর ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে। যদি এমন না হতো তাহলে বিভিন্ন স্পন্দন একে অপরকে নষ্ট করতে পারতো, যার ফলে কোনো সৃজন কর্ম উৎপন্ন বা জারি থাকতে পারতো না।

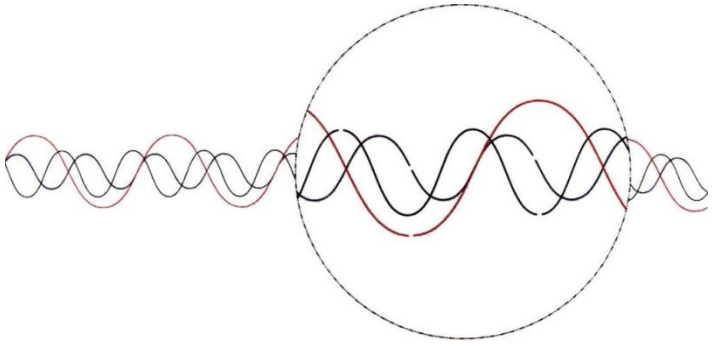

ছন্দ রশ্মির মধ্যে বিরাম

সৃষ্টি উৎপত্তির প্রারম্ভিক পর্যায়

বিভিন্ন ছন্দ রূপী স্পন্দনে অর্ধেক-অর্ধেক ভাগে একটি অতি সূক্ষ্ম বিরাম থাকে। এই ধরণের বিরামের কারণে অনেক মরুৎ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে যায়। কিভাবে উৎপন্ন হয়? এটা এখনও গবেষণার বিষয়। এই মরুৎ রশ্মিগুলোর গতি চার প্রকারের হয়। এই বিরামকে আমরা বেদ মন্ত্রের রচনা থেকে বুঝতে পারি। এখানে আমি উদাহরণ হিসাবে প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটি নিবো —

তৎসবিতুর্বরেণ্যম্ । ভর্গো দেবস্য ধীমহি । ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

এখানে ' । ' এই বিরাম আছে, যেখানে সূক্ষ্ম মরুৎ রশ্মি ('হিম্' এবং ব্যাহৃতি আদি) উৎপন্ন হতে থাকে। এরপর এই ছন্দ রশ্মিগুলো থেকে অনেক প্রকারের মূল কণা বলা হয় যে কণাগুলো উৎপন্ন হয়, যাদের প্রধানত চারটি গুণ থাকে —

1. আবেশ
2. দ্রব্যমান
3. ঘূর্ণন
4. গতিশীলতা

এসবের উৎপত্তি মনস্তত্ত্বে সেই স্পন্দনগুলোর কারণেই হয়। এই স্পন্দনগুলো কি কি ? এদের কি কি গুণ আছে ? এই সব বিষয়ে আমি পরের অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

স্মরণীয় তথ্য

1. কাল তত্ত্বের পরে সর্বপ্রথম মহৎ তত্ত্ব উৎপন্ন হয়।
2. মহতের উত্তেজিত অবস্থা অহংকার এবং অহংকারের উত্তেজিত অবস্থা মন নামে পরিচিত।
3. অহংকার তৈরি হওয়া পর্যন্ত সৃষ্টিতে বিদ্যুৎ আবেশ, দ্রব্যমান, আকাশ, তরঙ্গ, কণা আদির নির্মাণ হয় না।
4. যখন কাল তত্ত্ব 'ওম্' ছন্দ রশ্মির পশ্যন্তী রূপের সঞ্চারণ অহংকারে করে, তখন পদার্থের সেই অবস্থাই মনস্তত্ত্ব হয়।
5. মনস্তত্ত্বের মধ্যে ছন্দ রশ্মিরূপী যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেগুলো পরস্পর ধাক্কা খেলেও

নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে।

6. মহৎ তত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বকে প্রায় শূন্য, অদৃশ্য, একরসবৎ ও অগ্রাহ্য ঊর্জার মতো মনে করা যেতে পারে।

অনুশীলনী

1. সৃষ্টির এমন কোন প্রাথমিক পদার্থ আছে, যা বিকৃত হয়ে সৃষ্টি রচনার কাজে লাগে? তার স্বরূপ বুঝিয়ে বলুন।
2. মহৎ, অহংকার এবং মনস্ তত্ত্বের মধ্যে কী পার্থক্য? উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলুন।
3. মনস্ তত্ত্বে স্পন্দন কে করে এবং এই পদার্থের মধ্যে বর্তমান ভৌতিকীতে সংজ্ঞায়িত আকাশ, ঊর্জা এবং মূল কণা আদি বিদ্যমান থাকে কি না? যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলুন।
4. মনস্ তত্ত্বের আয়তন ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় কম হয় নাকি বেশি?
5. বর্তমানেও কি মহৎ, অহংকার ও মনস্তত্ত্বের অস্তিত্ব আছে?
6. মহৎ, অহংকার এবং মনস্তত্ত্বের মধ্যে কী সম্পর্ক?
7. প্রকৃতি মহৎ তত্ত্বে কখন পরিবর্তিত হয়?
8. অহংকারের কয়টি ভেদ হয়?
9. অহংকার কখন মনস্ তত্ত্বের রূপে পরিবর্তিত হয়?
10. কারণ বিদ্যুৎ কাকে বলা হয়েছে?

(অ) মনস্ তত্ত্ব (ব) মহৎ তত্ত্ব

(স) অহংকার তত্ত্ব (দ) কাল তত্ত্ব

* * * * *

6 অধ্যায়

রশ্মি এবং তাদের গুণাবলী

বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত অনুসারে, বর্তমান ভৌতিকী দ্বারা তথাকথিত সমস্ত মূল কণা এবং বিভিন্ন তরঙ্গাণুর উৎপত্তি বৈদিক মন্ত্রের ঘনীভবন থেকে হয়। এই মন্ত্রগুলো এখনও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বাণীর পশ্যন্তী রূপে বিদ্যমান আছে। **যদি কখনও এমন কোনো প্রযুক্তি বিকশিত হয়, যার মাধ্যমে পশ্যন্তী ধ্বনি শোনা যায়, তবে আমরা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি স্থানে বেদের সস্বর মন্ত্র শুনতে পাবো।** ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি একাকী না থেকে দলবদ্ধভাবে থাকে। যখন সেই রশ্মির সমূহ পৃথকভাবে বিচরণ করতে-করতে স্বতন্ত্র থাকে, তখন সেগুলো আকাশের রূপ হয়। যখন সেই রশ্মির সমূহ কিছু ছন্দ রশ্মি দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অতি ঘন রূপ প্রাপ্ত করে, তখন সেগুলোই বিভিন্ন প্রকারের মূলকণার রূপ ধারণ করে নেয়। যখন সেই রশ্মিসমূহ এই দুটির মধ্যবর্তী অবস্থা প্রাপ্ত করে, তখন সেগুলোই বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গাণুর (কোয়ান্টা) নির্মাণ করে। এই অধ্যায়ে আমরা এই রশ্মিগুলোর শ্রেণীবিভাগ এবং তাদের গুণাবলী বোঝার চেষ্টা করবো। আসন্ন অধ্যায়গুলো বোঝার জন্য আমাদের এই রশ্মিগুলোর গুণাবলী বোঝা অত্যন্ত জরুরি।

6.1 অক্ষর রশ্মি

সকল প্রকারের রশ্মি সূক্ষ্ম অক্ষর রূপ অবয়ব দ্বারা নির্মিত হয়। এই কারণে আমরা সর্বপ্রথম অক্ষর রূপ পদার্থ নিয়ে বিচার করবো।

মহৎ তত্ত্ব এই অক্ষরগুলোর কম্পন রূপেই হয়। কালের উৎপত্তির সময়ই সাম্যাবস্থায় অক্ষর রশ্মির বীজ রূপ অব্যক্ত রূপে উৎপন্ন হয়, যা 'ওম্' রশ্মির পরা রূপে সঞ্চারিত হতেই ব্যক্ত হয়ে যায়। এই রশ্মিগুলো সম্পূর্ণভাবে কখনওই অবিদ্যমান হয় না, এমনকি তা মহাপ্রলয়ের অবস্থাই হোক না কেন। এই রশ্মিগুলো তখনই ছন্দ রূপ ধারণ করে, যখন সেগুলো শব্দ রূপ ধারণ করে নেয়। একে এভাবে বোঝা যেতে পারে, যেমন কম্পিউটারের স্ক্রিনে অক্ষর অব্যক্ত থাকে এবং যখন আমরা কিবোর্ডে বোতাম

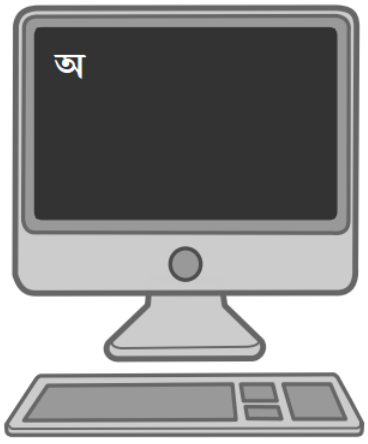

টিপি, তখন সেগুলো আমাদের সামনে ব্যক্ত হয়ে যায়। সেই রকম মহাপ্রলয়ের অবস্থায় অব্যক্ত অক্ষর 'ওম্' রশ্মির সঞ্চালনে ব্যক্ত হয়ে যায়। অক্ষর রশ্মি দুই প্রকারের হয় —

1. স্বর — মনস্তত্ত্বের ভিতরে এগুলো অত্যন্ত লঘু কম্পন রূপে (যা সর্বাধিক সূক্ষ্ম হয়) বিদ্যমান থাকে। এই লঘু রশ্মিগুলো স্বয়ং প্রকাশিত হয় অর্থাৎ এগুলোকে সক্রিয় হওয়ার জন্য ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োজন হয় না, তবে এগুলো ক্রমাগত দীর্ঘ দূরত্ব পর্যন্ত গতিশীল থাকতে পারে না।

2. ব্যঞ্জন — এই অব্যক্ত সূক্ষ্মতম অবয়বও মহত্তত্ত্বেরই রূপ হয়, যা সর্বদা স্বরের সাথে সংযুক্ত হয়ে গতিশীল হতে পারে। মহৎ বা অহংকারে আকস্মাৎ সূক্ষ্মতম স্ফোট রূপে উৎপন্ন ব্যঞ্জন, যা এক স্থানে উৎপন্ন হয়ে থেকে যায়। সেটি কোনো স্বর রূপী সূক্ষ্ম কম্পনের সাথে মিলিত হলে গতি, বল ও প্রকাশের অব্যক্ত রূপের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এটি স্বরের সাথে মিলে সূক্ষ্ম ছন্দের রূপ ধারণ করে নেয়। 'ওম্', 'ভূঃ', আদি ছন্দ রশ্মি হল এর উদাহরণ।

যেমন মুক্তা দিয়ে মালা তৈরি হয়, তেমনই অক্ষর ও ব্যঞ্জন রশ্মি মিলে বড় ছন্দ রশ্মি (ঋচা/মন্ত্র) তৈরি হয়।

ওম্ (অ + উ + ম্)

এতে 'অ', 'উ' দুটি স্বর এবং 'ম্' ব্যঞ্জনের যোগ থাকে। যদিও 'ম্' ব্যঞ্জন 'অ' এবং 'উ' এই দুটি স্বরের সাথে পৃথকভাবে মিলিত হয়ে 'ম' তথা 'অম্' ও 'মু' তথা 'উম্' ছন্দ তৈরি করতে পারে, তবে 'অ+উ'='ও'-এর সাথে 'ম্' যুক্ত হয়ে যে 'ওম্' ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়, তা সর্বাধিক ব্যাপক বল ও গতিতে সম্পন্ন হয়। 'ওম্' ছন্দে মনস্ তত্ত্ব বা মহৎ তত্ত্বের মাত্রা অন্য যেকোনো দৈবী গায়ত্রী ছন্দের চেয়ে বেশি হওয়ায় এর ব্যাপকতা সর্বাধিক হয়।

- এটি অন্য সব রশ্মির বীজ রূপ হয়। সব প্রাণ এবং ছন্দ রশ্মি এই থেকেই উৎপন্ন ও প্রেরিত হয়।
- এই রশ্মি মনস্তত্ত্বকে স্পন্দিত করে সব ধরণের রশ্মি আদি পদার্থ উৎপন্ন করে।
- এই রশ্মি সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে উৎপন্নও করে, সাথে বেঁধেও রাখে। মনস্তত্ত্বে এটি পশ্যন্তী অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, অথচ মহৎ বা কালে পরা অবস্থায় থাকে।

মহৎ বা মনস্তত্ত্বে উৎপন্ন এটি এমন একটি স্পন্দন, যা এত সূক্ষ্ম হয়, যেন সেটি স্পন্দনই নয় অথবা এটিকে এমন তরঙ্গ বলা যেতে পারে, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রায় অনন্ত, তখন কম্পাঙ্ক প্রায় শূন্য

হয়। বাস্তবতা তো এই যে, এটিকে প্রকাশ করাই অসম্ভব। এই প্রকার বিজ্ঞানের ভাষায় এটিকে অত্যন্ত ক্ষীণ শক্তিসম্পন্ন অব্যক্ত সূক্ষ্মতম এবং সর্বপ্রথম উৎপন্ন ঊর্জার রূপ বলা যেতে পারে।

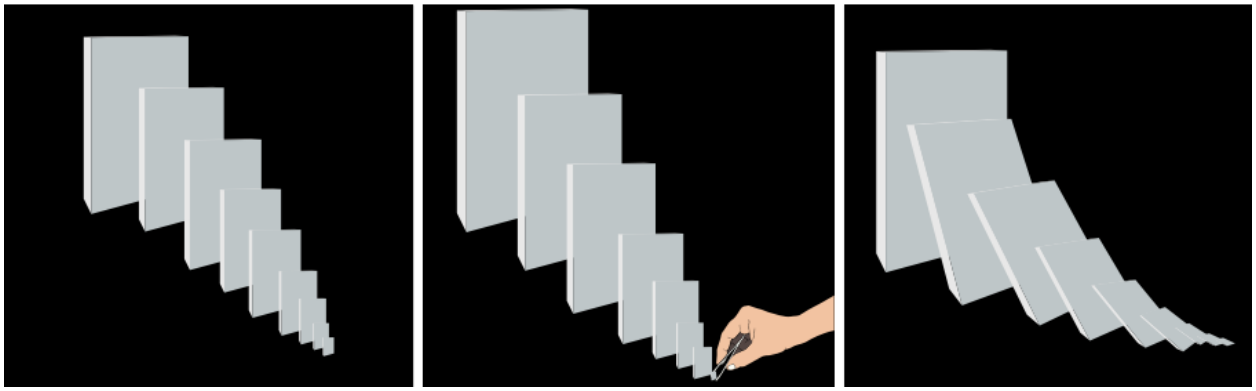

ছোট খণ্ড পড়ে যাওয়ার ফলে স্থূল খণ্ডগুলোর ক্রমশ পড়ে যাওয়া

ধ্যাতব্য হল, **সূক্ষ্মতম ঊর্জাই স্থূল ঊর্জাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।** উদাহরণস্বরূপ, যেভাবে মস্তিষ্ক সূক্ষ্ম বল দ্বারা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার থেকে স্থূল বল উৎপন্ন করে।

6.2 প্রাণ ও ছন্দ তত্ত্ব

যখন 'ওম্' রশ্মির পশ্যন্তী রূপের তীব্রতা অর্থাৎ ঊর্জা বেড়ে যায়, সেই সময় চেতন তত্ত্ব কাল তত্ত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ মহত্তত্ত্ব-অহংকার বা মনস্তত্ত্বের বিশাল সাগর, যা সর্বত্র একরসের মতো ভরা থাকে, তাকে সূক্ষ্ম পশ্যন্তী 'ওম্' বাক্ রশ্মি দ্বারা এমনভাবে স্পন্দিত করতে থাকে, যেন কোনো শক্তি কোনো মহাসাগরে একসাথে তীব্র গতিতে বিভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম-স্থূল ঢেউ উৎপন্ন করছে, ঠিক সেইভাবে চেতন তত্ত্ব 'ওম্' রশ্মির দ্বারা মনস্ তত্ত্বের মধ্যে প্রাণ ও ছন্দ রশ্মিরূপী ঢেউ নিরন্তর উৎপন্ন করতে থাকে।[2] যখন এগুলোর উৎপত্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন সেই প্রক্রিয়া হঠাৎ অত্যন্ত তীব্র গতিতে হয়। এই ঢেউগুলো (রশ্মিগুলো) প্রধানত চার প্রকারের হয়—

(অ) মূল ছন্দ রশ্মি
(ব) প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি
(স) মাস ও ঋতু রশ্মি
(দ) অন্য ছন্দ ও মরুৎ রশ্মি।

---

[2] 'ওম্' ছন্দ রশ্মির সঙ্গে সঙ্গত না হলে সমস্ত প্রাণ রশ্মি ডার্ক এনার্জিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

(অ) মূল ছন্দ রশ্মি

অক্ষর রশ্মির উৎপত্তির পর নিম্নলিখিত প্রাথমিক ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয় —

ব্যাহৃতি রশ্মি

যে রশ্মিগুলো বিশেষভাবে নিজেদের চারপাশে অন্য রশ্মিগুলোকে আকর্ষণ করে অথবা বহন করে, তাদের ব্যাহৃতি রশ্মি বলে।

প্রাথমিক ছন্দ রশ্মিগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম সাতটি ব্যাহৃতি রশ্মির উৎপত্তি মনস্তত্ত্ব থেকে নিম্নলিখিত ক্রমে হয় —

1. ভূঃ — 'ওম্' ছন্দ রশ্মির পশ্যন্তী রূপের উৎপত্তির ঠিক পরেই এই ব্যাহৃতি রশ্মির উৎপত্তি হয়। মনস্তত্ত্বে সর্বপ্রথম এই ব্যাহৃতি রশ্মির উৎপত্তি হয়। যখন কখনও **ঋক্**[3] সংজ্ঞক রশ্মি, পৃথিবী তত্ত্ব বা অপ্রকাশিত কণার উৎপত্তি হয়, সেগুলোতে এই রশ্মির প্রধানতা থাকে। এই রশ্মি বিভিন্ন রশ্মিকে নিজের সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হয় তথা বাধক সূক্ষ্ম রশ্মিকে নিষিদ্ধ করে ক্রিয়াকে নির্বাধ করে তোলে।

2. ভূবঃ — মনস্তত্ত্বে **'ভূঃ'** রূপ স্পন্দনগুলোকে 'ওম্' রশ্মি বিকৃত করে 'ভূবঃ' রশ্মি উৎপন্ন করে। কালক্রমে এই রশ্মিগুলো আকাশ তথা **য়জুঃ** নামক সংজ্ঞক রশ্মি উৎপন্ন করতে সর্বপ্রধান ভূমিকা পালন করে।

3. স্বঃ — **'ওম্'** রশ্মির দ্বারা মনস্তত্ত্বে 'স্বঃ' রশ্মি রূপ স্পন্দন উৎপন্ন হয়। কালক্রমে **সাম** রশ্মি এবং প্রকাশাণু (ফোটন) নির্মাণে এই রশ্মিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

4. মহঃ — এই সূক্ষ্ম রশ্মি অন্য ব্যাহৃতি রশ্মিগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করতে নিজের ভূমিকা পালন করে।

5. জনঃ — এই রশ্মি অন্য রশ্মিগুলোতে সর্বতঃ উৎপন্ন হয়ে তাদের সংযুক্ত করে অন্য ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন করে। এই রশ্মি বাধক রশ্মিগুলোকে প্রতিবন্ধিত করতে বিশেষ সক্ষম হয়।

6. তপঃ — এই রশ্মি অন্য ব্যাহৃতি রশ্মিগুলোর পৃষ্ঠ ভাগ অথবা কিনারে স্থিত হয়ে সেগুলোতে বাইরের অংশে ছড়িয়ে পড়ে বা সংগত হয়ে সেগুলোকে রক্ষা করে।

7. সত্যম্ — এই রশ্মি সব রশ্মির সাথে সংগত ও পূর্ণ ব্যাপ্ত হয়ে সেগুলোকে আধার প্রদান করে তাদের বহির্বিভাগে অবস্থান করে।

---

[3] এই রশ্মিগুলি সম্পর্কে পরে জানানো হবে।

মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস বলেছেন যে, ব্যাপ্তি রশ্মিগুলো বিভিন্ন বেদ-ঋচাসমূহ রূপী ছন্দ রশ্মিগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করতে এবং নিরাপদ রূপ প্রদান করতে সাহায্য করে। এই রশ্মিগুলোর অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি এবং সেগুলো থেকে নির্মিত বিভিন্ন কণা, তরঙ্গ বা আকাশ আদি সব কিছুই দুর্বল বা নষ্ট হয়ে যাবে।

(খ) প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি

উপরোক্ত সূক্ষ্ম রশ্মিগুলোর পর প্রাথমিক প্রাণ রশ্মিগুলোর উৎপত্তি হয়। এদের বিষয়ে **মহর্ষি য়াজ্ঞবল্ক্য** বলেছেন যে, সকল প্রাণ রশ্মি কখনোই স্থির থাকে না অর্থাৎ সর্বদা বিচরণ করতে থাকে। সকল প্রাণ রশ্মিই অক্ষরেরই সমূদায় হয়। প্রাণতত্ত্ব দড়ির মতো নিয়ন্ত্রণকারী হয়, এটি মনস্তত্ত্ব এবং 'ওম্' রশ্মির মিলনেই উৎপন্ন হয়। **প্রাণতত্ত্ব মূলত একটিই হয়, কিন্তু এর নানাবিধ গতির কারণে এতে ভিন্নতা দেখা দেয়। মহর্ষি ব্যাস** বলেন যে, গতির কারণে প্রাণ সাত প্রকারের (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, সূত্রাত্মা বায়ু এবং ধনঞ্জয়) হয়। এগুলোই মুখ্য প্রাণ হয়। বস্তুত, এই রশ্মিগুলো এগারো প্রকারের হয়। মনস্তত্ত্ব বা অহংকারে 'ওম্' রশ্মি দ্বারা উৎপন্ন স্পন্দনের তীব্রতা, গতি এবং স্বভাবের পার্থক্যের কারণে একটি প্রাণতত্ত্বেরই এগারোটি রূপ হয়। আসুন, সংক্ষেপে এই রশ্মিগুলোর গুণাগুণ বুঝে নিই —

1. সূত্রাত্মা বায়ু — সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিগুলো বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিকে পরস্পরের সাথে সংগত করার বিশেষ গুণ সম্পন্ন হয়। 'ওম্' রশ্মির পর সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির ভূমিকাই সর্বোচ্চ। মনস্তত্ত্বের ভিতরে 'ওম্' রশ্মি দ্বারা এগুলো এমন অব্যক্ত স্পন্দন রূপে উৎপন্ন হয়, যা পরস্পরের সাথে জালের মতো বোনা থাকে। এই রশ্মিগুলো এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে, প্রতিটি রশ্মি থেকে আরও সূক্ষ্ম রশ্মি নির্গত হয়ে একটি জাল তৈরি করে। এই কারণেই সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিগুলো নিজের সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা রূপী সূক্ষ্ম রশ্মির (স্পন্দন) মাধ্যমে অন্য সব রশ্মি আদি পদার্থকে নিজের সাথে তথা পরস্পরের সাথে বেঁধে রাখে।

সূত্রাত্মা বায়ুকে একটি সুতোর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা সমস্ত কণা বা রশ্মিকে একে অপরের সাথে গেঁথে রাখে। যখন সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির সাথে ধনঞ্জয় রশ্মির মিলন ঘটে, তখন সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির তীব্রতা খুব বেড়ে যায়। সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিতে বিকর্ষণ বল একেবারেই থাকে না।

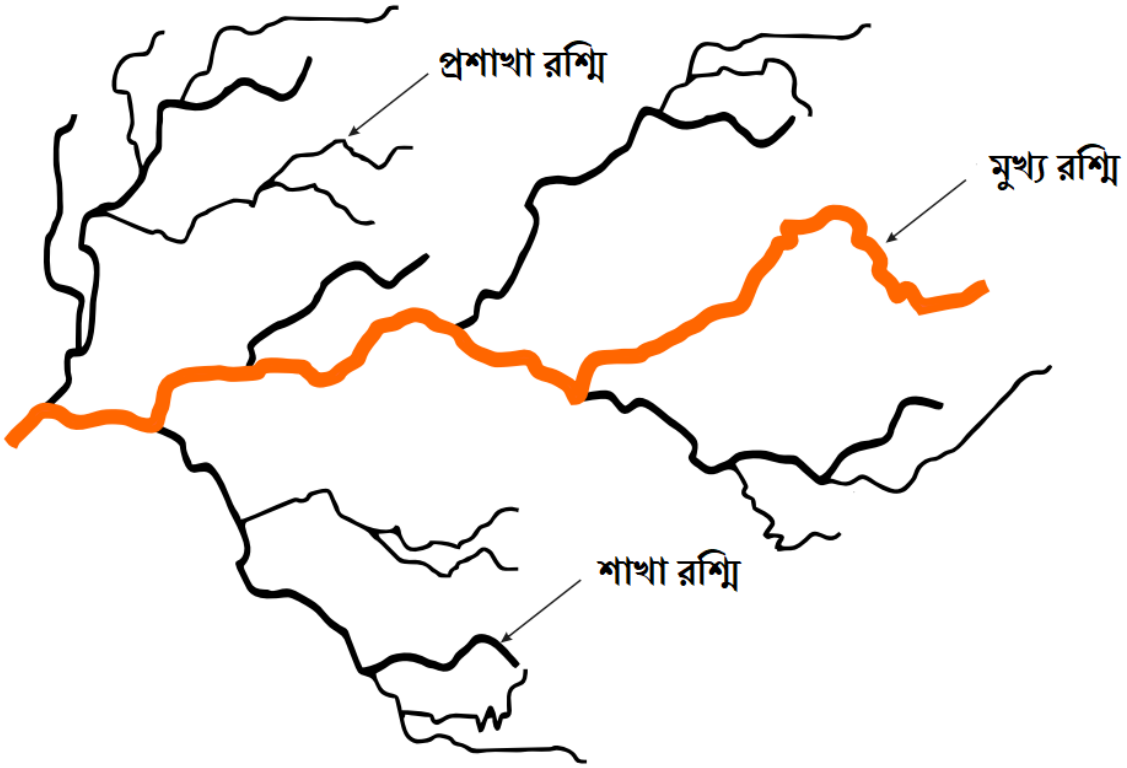

সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির শাখা এবং প্রশাখাগুলো

2. ধনঞ্জয় — এই রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্বের মধ্যে সর্বাধিক দ্রুতগতি সম্পন্ন স্পন্দন হিসেবে উৎপন্ন হয়। **এই প্রাণ-রশ্মিগুলোর গতি আলোর গতির তুলনায় চার গুণ বেশি হয়।** যদি আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিমি ধরা হয়, তবে ধনঞ্জয় রশ্মির গতি হবে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় বারো লক্ষ কিমি। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে এরচেয়ে বেশি গতি কোনো পদার্থের নেই। এখানে আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে তো আলোর চেয়ে বেশি গতি কারও হতে পারে না, তাহলে ধনঞ্জয় প্রাণের এত গতি কীভাবে সম্ভব? এটি কি রিলেটিভিটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নয়? এর উত্তর হল, সেখানে আলোর গতির কথা আকাশের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, অর্থাৎ আকাশে কোনো বস্তুর গতি আলোর চেয়ে বেশি হতে পারে না। অন্যদিকে, ধনঞ্জয় রশ্মি হল আকাশের চেয়েও সূক্ষ্ম, তাই এর গতির জন্য আকাশের প্রয়োজন হয় না, এটি মনস্তত্ত্বের স্তরে বিচরণ করে। এইভাবে এই রশ্মি রিলেটিভিটি সিদ্ধান্তের কোনো বিরোধিতা করে না।

এই রশ্মিগুলোর সংযোগ বা আবরণের ফলে যেকোনো রশ্মি বা কণা আদি পদার্থের গতি তীব্র হয়ে যায়। প্রকাশ বা যেকোনো বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ এই ধনঞ্জয় রশ্মিগুলোর দ্বারাই টেনে

আনা হয়, এই কারণেই তাদের গতি ও শক্তি তীব্র হয়। এই রশ্মিগুলো যেখানে বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ এবং তীব্রগামী সূক্ষ্ম কণাগুলোর গতির কারণ হয়, সেখানে সূত্রাত্মা বায়ুর সাথে মিলিত হয়ে কণাগুলোর অক্ষের উপর ঘূর্ণনেরও কারণ হয়।

3. প্রাণ — সকল প্রাথমিক প্রাণের মধ্যে এই প্রাণ রশ্মিগুলোর স্থান সর্বোচ্চ বলে মনে করা হয়, এর নাম থেকেই সব ধরণের প্রাণ রশ্মি গ্রহণ করা হয়। যখন মনস্তত্ত্ব 'ওম্' ছন্দ রশ্মিসমূহ তীব্র বেগ ও বলের সাথে গমন করে, তখন এর ফলে মনস্তত্ত্বে স্পন্দনের রূপে উৎপন্ন রশ্মিগুলোকে 'প্রাণ' বলা হয়। এগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বলের প্রধান্য থাকে। এটি সবার আকর্ষক হয়ে সবাইকে আকর্ষণ বলযুক্ত করে সেই কণা বা তরঙ্গগুলোতে ভিতর থেকে বাইরে নিরন্তর সঞ্চারিত হতে থাকে। এই সৃষ্টিতে যেখানেই আকর্ষণ বলের অস্তিত্ব আছে, সেখানে এই বলের মূল কারণ হিসেবে এই তত্ত্বের উপস্থিতি অবশ্যই বিদ্যমান আছে। **মহর্ষি ব্যাস** প্রাণের তত্ত্ব বিষয়ে বলেছেন —

''প্রাণঃ কম্পনাৎ'' (ব্রহ্মসূত্র 1.3.39)

এর থেকে স্পষ্ট যে, প্রাণ সূক্ষ্ম স্পন্দন বিশিষ্ট হয়। মনে রাখবেন, এই সংজ্ঞা সকল প্রাণ রশ্মির জন্য হয়, কেবল এই প্রাণের জন্য নয়।

4. অপান — এই রশ্মি মনস্তত্ত্বের ভিতরে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা এমন এক স্পন্দন হয়, যার গতি প্রাণ নামক প্রাথমিক প্রাণের ঠিক বিপরীত তথা যা বিভিন্ন স্পন্দনকে পৃথক-পৃথক করার স্বভাবযুক্ত হয়। প্রাণ ও অপান উভয় রশ্মিই একসাথে অবস্থান করে পরস্পর বিপরীত দিকে স্পন্দিত হতে থাকে, এই কারণে অপান রশ্মি বিকর্ষণ বল উৎপন্ন করার মূল কারণ হয়। এই রশ্মিগুলোর প্রাণ রশ্মির প্রতি আকর্ষণের ভাব থাকে।

প্রাণ রশ্মিগুলো সত্ত্ব প্রধান এবং অপান রশ্মিগুলো রজস্ প্রধান হয়। এই কারণে প্রাণ ও অপান রশ্মি যথাক্রমে বল ও ক্রিয়া প্রধান হয়। বস্তুতঃ এই উভয় প্রকারের রশ্মি পরস্পর সংযুক্ত থাকে। কোথাও এদের পৃথক অবস্থা দেখা যায় না। এদের সংযুক্ত প্রভাবে প্রত্যেক পদার্থে বল এবং ক্রিয়া উভয়ই সম্পন্ন হয়। যখন কোনো পদার্থে প্রাণের প্রধান্য এবং অপান গৌণ রূপে বিদ্যমান থাকে, তখন সেই পদার্থে আকর্ষণ বলের প্রধান্য থাকে কিন্তু ক্রিয়াশীলতা গৌণ হয়। যখন কোনো পদার্থে অপানের প্রধান্য এবং প্রাণ গৌণ হয়, তখন সেই পদার্থে ক্রিয়াশীলতা প্রধান এবং বলের ন্যুনতা থাকে। এই সৃষ্টিতে সকল বল আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ উভয় রূপেই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু গুরুত্বাকর্ষণের বল সাধারণত আকর্ষণ প্রভাবই ফেলে। এর কারণ হল এই

বলে প্রাণ রশ্মির প্রাধান্য এবং অপান রশ্মির অপ্রাধান্য আছে। অন্যদিকে, ক্রিয়াশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে, যে পদার্থে যত বেশি গুরুত্বাকর্ষণ বল বা দ্রব্যমান থাকবে, সেটি ততই কম সক্রিয় হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে অপান প্রাণের নিম্নতা বা অবিদ্যমানতা প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে, গুরুত্বাকর্ষণ বল রশ্মির মধ্যে কেবল আকর্ষণ বল বিদ্যমান থাকে, কিন্তু সেই রশ্মিগুলোর ক্রিয়াশীলতা খুব কম হয়, এই কারণেই এগুলো অত্যন্ত কম আবৃত্তির হয়, অর্থাৎ দুর্বল হয়।

প্রশ্ন — যখন প্রাণ এবং অপান উভয়ই জোড়ায় থাকে, তখন এর মধ্যে একজনের প্রাধান্য এবং অন্যজনের অপ্রাধান্য কীভাবে বলা যেতে পারে ?

উত্তর — জোড়ার মধ্যেও একজন বেশি শক্তিশালী হতে পারে এবং যে শক্তিশালী হয়, তার প্রাধান্যই মানা হয়। যেমন কিছু প্রাণীর মধ্যে পুরুষ প্রধান হয়, আবার কিছুতে স্ত্রী।

5. ব্যান — এই রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্বের মধ্যে 'ওম্' রশ্মি দ্বারা এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে সেগুলো প্রাণ এবং অপানের মধ্যে সংযোগের কাজ করতে পারে। ব্যান রশ্মি ছাড়া প্রাণ এবং অপান একসাথে থাকতে পারে না। ব্যান রশ্মিগুলো কেবল প্রাণ এবং অপানকে বেঁধে রাখে না, বরং অন্যান্য রশ্মি এবং কণা আদি পদার্থকে বেঁধে রাখতে প্রাণ এবং অপান রশ্মির সাথে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রকাশিত কণা তৈরির ক্ষেত্রে ব্যান রশ্মিগুলো অপান রশ্মিগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে প্রকাশিত কণাকে অপ্রকাশিত কণার তুলনায় অত্যন্ত কম ঘনত্ব প্রদান করে। যখন 'ওম্' রূপী অক্ষর রশ্মি দুইবার আবৃত্ত হয়ে পুনরায় পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন ব্যান নামক প্রাথমিক প্রাণ উৎপন্ন করে।

6. সমান — যখন 'ওম্' রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্বের মধ্যে সমান গতি এবং বলের সাথে স্পন্দন উৎপন্ন করে, তখন সেই সময় সমান নামক প্রাণ রশ্মি উৎপন্ন হয়। এই প্রাণ রশ্মিগুলো বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির বল এবং গতিকে সুষম রাখে, বিশেষ করে প্রাণ এবং অপান নামক প্রাণ রশ্মির ভারসাম্য বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই রশ্মিগুলো সমান লয়ের সাথে নিরন্তর গমন করতে থাকে।

7. উদান — যখন মনস্তত্ত্বে 'ওম্' রশ্মির স্পন্দন এমনভাবে হয় যে মনস্তত্ত্বে উৎক্ষেপণ গুণের প্রাদুর্ভাব ঘটতে থাকে, সেই সময় উৎপন্ন স্পন্দনগুলো ঊর্ধ্বমুখী হয়। এই রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্বে এক ধরণের টান সৃষ্টি করে গতিশীল হয়, এর ফলে উৎপন্ন উদান নামক স্পন্দনগুলো ঊর্ধ্বগতি-সম্পন্ন হয়। এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন রশ্মির মধ্যে উৎক্ষেপণ গুণ (অর্থাৎ কোনো বলের বিরুদ্ধে বল

প্রয়োগ করা; যেমন ঘর্ষণ বল প্রয়োগকৃত বলের বিরুদ্ধে কাজ করে) উৎপন্ন করতে সহায়ক হয়। উদান রশ্মি নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত লয়ের সাথে গতি করে এবং ব্যাপক স্তরে এক প্রকারের দীপ্তি উৎপন্ন করে।

8. নাগ — এটি হল প্রাণ নামক প্রাণ তত্ত্বের উপপ্রাণ, যা প্রাণ নামক রশ্মিগুলোর বিক্ষুব্ধ ও অব্যবস্থিত হলে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবস্থিত রূপ প্রদান করতে সহায়ক হয়। নাগ প্রাণ রশ্মির প্রধানতায় উষ্ণতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। এদের স্পন্দন অতি সূক্ষ্ম ও মন্দ হয়, যা অন্যান্য প্রাণ রশ্মির সাপেক্ষে স্থির বলেই মনে করা যেতে পারে।

9. কূর্ম — এই রশ্মিগুলো অপান প্রাণের উপপ্রাণ হয়, যা অপান রশ্মিকে বল ও প্রেরণ প্রদান করে। আমরা জানি যে, অপান প্রাণ রশ্মিগুলো বিকর্ষণ বল প্রধান হয়, তবুও ব্যান রশ্মির মাধ্যমে প্রাণ রশ্মির সাথে বাঁধা থাকে। এই কূর্ম উপপ্রাণ সংযোগ প্রক্রিয়ায় কচ্ছপের মতো অপান রশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম হয়। যেভাবে মাথা পুরো শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেভাবেই কূর্ম রশ্মিগুলো প্রাণ ও অপানের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে নিজেদের ভূমিকা পালন করে।

10. কৃকল — এই প্রাণ তত্ত্ব হল উদান প্রাণের উপপ্রাণ। ভেদন ক্ষমতা বা তীব্রতা প্রদান বা প্রাপ্ত করার প্রাণ তত্ত্বই কৃকল নামে পরিচিত। যখনই উদান রশ্মির উৎক্ষেপণ বলে কিছু বাধা আসে, তখনই মনস্তত্ত্বে 'ওম্' রশ্মির দ্বারা কৃকল প্রাণ রশ্মি রূপ স্পন্দন আকস্মাৎ উৎপন্ন হয়ে উদান রশ্মিকে ধাক্কার সাথে বল প্রদান করে তার উৎক্ষেপণ বলকে সক্রিয় বা নির্বাধ করে দেয়।

11. দেবদত্ত — এটি হল সমান প্রাণের উপপ্রাণ। এটি জানা কথা যে, সমান প্রাণ রশ্মিগুলো, প্রাণ তথা অপান রশ্মিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক হয়। এই রশ্মিগুলো সমান প্রাণের সাথে সমলয়ে স্পন্দিত হতে-হতে প্রাণ ও অপানের লয় বজায় রাখে।

জ্ঞাতব্য — বিভিন্ন উপপ্রাণ রশ্মির (স্পন্দন) গতির দিক নিজ-নিজ প্রাণ রশ্মির গতির দিকের বিপরীত হয়, সাথে এদের স্পন্দন সম্পর্কিত প্রাণ রশ্মির স্পন্দন থেকে সূক্ষ্ম হয়, যা তাদের কাছে নিরন্তর উৎপন্ন হতে থাকে।

(স) মাস ও ঋতু রশ্মি

মাস রশ্মি

মাস হল বিশেষ প্রকারের রশ্মির নাম, যা প্রাণ ও অপানের সংযুক্ত রূপের ত্রিশ বার স্পন্দিত হতে নির্মিত হয়। একটি মাসের মধ্যে ত্রিশটি প্রাণ-অপান যুগ্ম থাকে। (ধ্যান রাখবেন, এর অর্থ এই

নয় যে, একটি মাস রশ্মির মধ্যে ত্রিশটি প্রাণ ও ত্রিশটি অপান হয়ে মোট ষাটটি রশ্মি যথাযথভাবে বিদ্যমান থাকে, বরং বাস্তবতা হল এই ষাটটি রশ্মির স্পন্দনের ফলস্বরূপ একটি মাস রশ্মি রূপী স্পন্দন হয়, যা সেই স্পন্দনগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় অথবা সেই ষাটটি স্পন্দনই একটি নতুন স্পন্দনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, অনেক রশ্মির মিলনে কোনো বা কোনো রশ্মির উৎপত্তির যেখানেই আলোচনা হোক, সেখানে এই প্রকারই বোঝা উচিত।) ত্রিশ প্রাণ-অপান যুগ্ম থেকে বারো মাস রশ্মির নির্মাণের ক্ষেত্রে এই যুগ্মগুলোর বারো প্রকারের বিশেষ সংযোগই কারণ হয়। যদি এমন না হতো, তাহলে একই প্রকারের মাস রশ্মি উৎপন্ন হতে পারতো। এই মাস রশ্মিগুলো ছাড়া সৃষ্টি বা সূর্য আদি লোকের নির্মাণ সম্ভব হতে পারে না। এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন রশ্মিকে যুক্ত করার কাজ করে।

এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন রশ্মি, যা য়োষা ও বৃষা রূপে ব্যবহার করে, তাদের নির্দিষ্ট বিন্দু রূপ অংশকে উত্তেজিত করে পরস্পর সংযোগ ঘটাতে সহায়ক হয়। বারো প্রকারের মাস রশ্মিগুলো নিম্নরূপ —

1. মধু
2. মাধব
3. শুক্র
4. শুচি
5. নভস্
6. নভস্য
7. ঈষ্
8. ঊর্জ্
9. সহস্
10. সহস্য
11. তপস্
12. তপস্য

ঋতু রশ্মি

ঋতু হল একটি পদার্থ, যা রশ্মির রূপে হয়। দুই-দুটি মাস রশ্মির যুগ্মকে ঋতু বলা হয়। ঋতু রশ্মিগুলো দিশা উৎপন্ন করে অর্থাৎ এদের কারণে বিভিন্ন লোক বা কণাগুলোর ঘূর্ণনের দিশা

নির্ধারিত হতে সাহায্য পাওয়া যায়। সমস্ত উৎপন্ন পদার্থও 'ঋতু' বলা হয়, কারণ তারা সবাই নিরন্তর গমন করতে থাকে।

ঋতু রশ্মিগুলো প্রকাশ উৎপন্ন করতে তাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যে কোনও পদার্থের সাথে এদের মিলনে উষ্মার তীব্রতা বাড়ে। এই রশ্মিগুলো কণা ও তরঙ্গাণুর (কোয়ান্টা) পারস্পরিক সংমিশ্রণ-বিয়োজনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অংশের মতো স্থানগুলোতে যেখানে ঊর্জার উৎপত্তি হয়, সেখানে এই রশ্মিগুলোর প্রাধান্য থাকে। নক্ষত্রের বাইরের বিশাল অংশেও ঋতু রশ্মিগুলোর বিশেষ প্রাধান্য থাকে। ঋতু রশ্মিগুলো বিভিন্ন প্রাণাদি রশ্মিকে তীব্রভাবে শোষণ করে, এই কারণে যে কোনও পদার্থের সাথে এদের মিলনে সেই পদার্থটি উষ্মাকে তীব্রভাবে শোষণ করে। এই রশ্মিগুলো অন্যান্য রশ্মিকে নিজেদের সাথে সঙ্গত করতে অথবা তাদের আচ্ছাদিত করতে বিশেষভাবে সক্ষম হয়।

ছয়টি ঋতু রশ্মি হল এইরকম —

1. বসন্ত (মধু + মাধব)
2. গ্রীষ্ম (শুক্র + শুচি)
3. বর্ষা (নভস্ + নভস্য)
4. শরৎ (ঈষ্ + ঊর্জ)
5. হেমন্ত (সহস্ + সহস্য)
6. শিশির (তপস্ + তপস্য)

(দ) অন্যান্য ছন্দ রশ্মি

কাল মাপক রশ্মি

কাল তত্ত্ব হল এমন একটি পদার্থ, যারমধ্যে তমোগুণের সম্পূর্ণ অভাব থাকে। কাল তত্ত্বের পরে কাল মাপক প্রাণ, অপান, উদান, মাস এবং ঋতু রশ্মিগুলোই এমন রশ্মি হয়, যেগুলোতে তমোগুণের মাত্রা সম্পূর্ণ অভাব না থাকলেও এর মাত্রা এত কম হয় যে এই রশ্মিগুলো অন্যান্য সমস্ত রশ্মির তুলনায় অবিরাম ও বাধাহীনভাবে গমনকারী হয়। এগুলো কাল তত্ত্বের মতো অবিরাম ও নিরপেক্ষ গমনকারী হয় না, তবে অন্যান্য রশ্মির তুলনায় এদের এই স্বভাবই থাকে। এখন আমরা বিবেচনা করবো যে এগুলোকে কাল মাপক হিসাবে কীভাবে গণ্য করা হয়েছে? আসুন জেনে নিই —

1. প্রাণ — যে ব্যবধানে একটি প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির স্পন্দন হয়, সেই ব্যবধানকে এক প্রাণ বা অহন্ বলা হয়। এই রশ্মি অক্ষর দিয়ে তৈরি হয়। এদের মধ্যে প্রতিটি অক্ষর এক-এক করে স্পন্দিত হয়। সব ছয়টি স্পন্দনের একটি সংযুক্ত স্পন্দনকে প্রাণ রশ্মি (অহন্) বলা হয়। প্রাণ ঋতু রশ্মিগুলো ('ভূঃ', 'ভুবঃ', 'সুবঃ' তথা 'ওম্') ৬টি সূক্ষ্ম স্পন্দন দিয়ে তৈরি হয়। 'ষড়্ঋতুনা' দৈবী পঙ্‌ক্তি ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে ৬ ঋতু রশ্মিকে সংযুক্ত করে প্রাণ তত্ত্বকে উৎপন্ন করে।

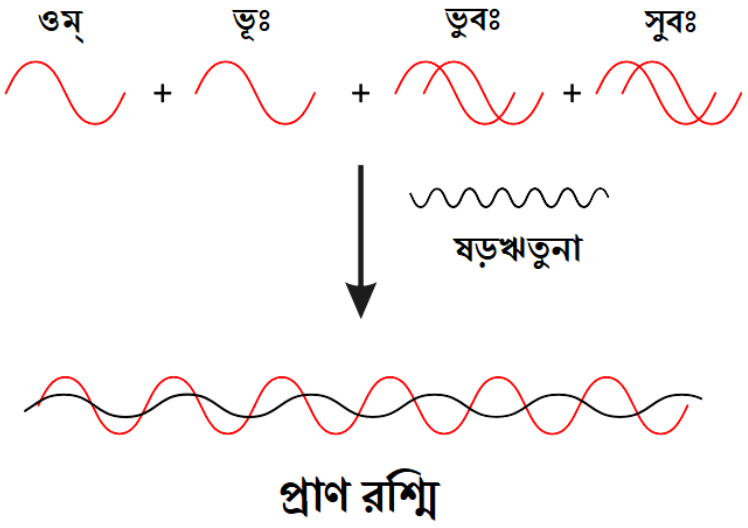

প্রাণ রশ্মির উৎপত্তি

যেভাবে বর্তমান ভৌতিকবিদ্ সিজিয়াম-133 অ্যাটমের সংক্রমণ (transition)-এর 9,19,26,31,770 আবৃত্তির সময়কে এক সেকেন্ড বলেন। এর থেকে কেউ একথা বলতে পারে না যে সেকেন্ডই সময় হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি হল সময় পরিমাপের একটি পদ্ধতি। আকাশকে মাপার মাধ্যম হল মিটার, কিলোমিটার আদি। একইভাবে প্রাণ, অপান আদি যেখানে বিশেষ পদার্থ (রশ্মি) হয়, সেখানেই এই পদগুলো সময়ের মাপকও হয়।[4]

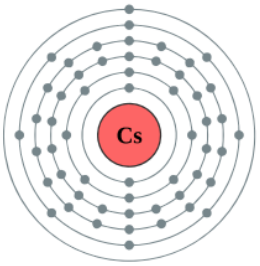

Cs পরমাণু

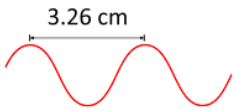

f = 9,19,26,31,770 Hz

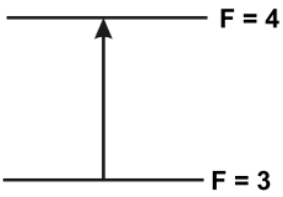

6s ইলেকট্রন স্তরের হাইপারফাইন বিভাজন

[4] একটি প্রাণ এবং একটি অপান বর্তমান কালের মাপকগুলিতে কত সময়? এটি এখনও গবেষণার বিষয়।

2. অপান — যত সময়ে একটি অপান রশ্মি একবার স্পন্দিত হয়, সেই সময়কে অপান বলা হয়। এই রশ্মি ষোলো ঋতু রশ্মি অর্থাৎ চার-চার ঋতুর চার আবৃত্তিগুলো দিয়ে গঠিত। এখানে চিত্রানুসারে প্রতিটি ব্যাহৃতি ঋতু রশ্মি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

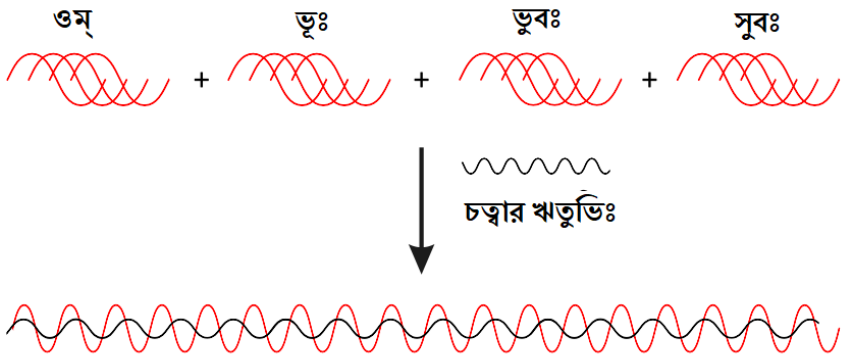

অপান রশ্মি

অপান রশ্মির উৎপত্তি

যদি পূর্বের মতো একটি অক্ষরকে একটি ঋতু রশ্মি ধরা হয়, তবে 'সুবঃ' বাদে অন্য তিনটি রশ্মির চারটি আবৃত্তি থেকে ষোলটি অক্ষর মিলে অপান রশ্মি উৎপন্ন করে।

ঋষি রশ্মি

অনেক প্রাণ রশ্মি, যা এই সৃষ্টিতে বিভিন্ন অতিসূক্ষ্ম রশ্মি থেকে উৎপন্ন হয়, ঋষি রশ্মি নামে পরিচিত। এই ঋষি রশ্মিগুলো অনেক প্রকারের মন্ত্র রূপ ছন্দ রশ্মিকে উৎপন্ন, ধারণ এবং সক্রিয় করে। তাদের থেকে উৎপন্ন মন্ত্র রূপ ছন্দ রশ্মি, যা এই সৃষ্টিতে কাজ করে, তাতে এই ঋষি রশ্মিগুলোরও সহযোগী ভূমিকা থাকে।

দ্রষ্টব্য — অন্যান্য ছন্দ রশ্মির গুণ এবং তাদের শ্রেণীবিভাগ পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হবে।

6.3 ছন্দ রশ্মির 7 প্রকারের প্রভাব

যেকোনো বেদ মন্ত্রের (ছন্দ রশ্মি) নিম্নলিখিত প্রভাবগুলো থাকে —

1. দেবতার প্রভাব (দেবতা হল সেই পদার্থের নাম, যা কোনো ছন্দ রশ্মি দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। যেমন কোনো ছন্দ রশ্মির দেবতা ইন্দ্র, এর অর্থ হল সেই রশ্মি থেকে বিদ্যুতের বৃদ্ধি হবে।)
2. ছন্দের প্রভাব (ছন্দগুলোর বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায় পাঠযোগ্য।)
3. ঋষির প্রভাব (কোনো ছন্দ রশ্মি যে ঋষি রশ্মি থেকে উৎপন্ন হয়, তাতে সেই ঋষি রশ্মির

কিছু গুণ চলে আসে।)

4. স্বরের প্রভাব

5. পদের প্রভাব (অর্থাৎ শব্দের প্রভাব)

6. অক্ষরের প্রভাব

7. সম্পূর্ণ ঋচা/ছন্দ রশ্মি/মন্ত্রের প্রভাব

6.4 রশ্মিগুলোর সংযোগ প্রক্রিয়া

বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট সুতোর টুকরোর মতো আকৃতির হয়, যাদের দুটি প্রান্ত ভিন্ন-ভিন্ন গুণযুক্ত হয়। ঠিক যেমন চুম্বকের দুটি বিপরীত গুণ সম্পন্ন প্রান্ত থাকে এবং কাছাকাছি আনলে একে অপরকে আকর্ষণ করে। ঠিক সেভাবেই রশ্মিগুলোর প্রান্তগুলো একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সংযুক্ত হয়ে যায়।

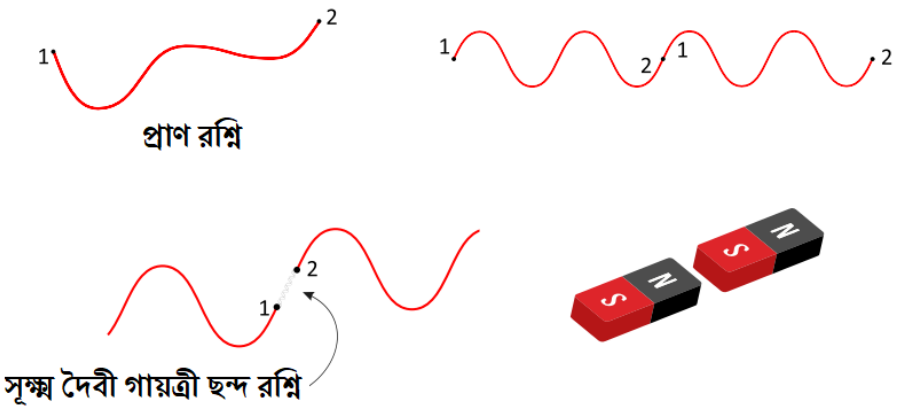

রশ্মিগুলোর বিপরীত গুণযুক্ত প্রান্তগুলোর সংযোগের প্রক্রিয়া

এই প্রান্তগুলো একে অপরের সাথে দড়ির প্রান্তের মতো যুক্ত থাকে। এদের সংযুক্ত প্রান্তগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম দৈবী গায়ত্রী ছন্দ রশ্মিগুলো ক্রমাগত সঞ্চারিত হতে থাকে। বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিগুলোর এই দুটি প্রান্তই বিভিন্ন বল এবং ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র ও কারণ হয়। সেই ক্রিয়া এবং বলগুলোর নিয়ম ও সঞ্চালনও সূক্ষ্ম বাক্ রশ্মিগুলোর সহযোগিতায় এই প্রান্তগুলোই করে থাকে। এই সূক্ষ্ম রশ্মিগুলো অব্যক্ত রূপে এই প্রান্তগুলোর মধ্যে ক্রমাগত সঞ্চারিত হতে থাকে এবং অবশেষে সম্পূর্ণ সৃষ্টির নির্মাণ এই মূল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই হয়। মনে রাখা দরকার যে সুতোর মতো গঠনের অর্থ এই নয় যে এদের কঠিন বা বাস্তব মনে করা হোক। বস্তুতঃ, এগুলো মনস্তত্ত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম স্পন্দনেরই রূপ হয়, যেমন জলের মধ্যে ঢেউ হয়। এই ঢেউগুলোর জোড়া লাগাকে এদের প্রান্তগুলোর জোড়া লাগা হিসেবেই মানা উচিত।

6.5 রশ্মিগুলোর সংখ্যা সীমিত বা অসীম

যদিও এই ব্রহ্মাণ্ডে ছন্দ রশ্মিগুলো স্বরূপের দিক থেকে খুবই সীমিত সংখ্যায় বিদ্যমান আছে, কিন্তু বারবার আবৃত্তি হওয়ার কারণে এই ব্রহ্মাণ্ডে তাদের সংখ্যা অসীম। ঠিক যেমন একটি সেতার বা বীণাতে কয়েকটি তার থাকে, কিন্তু সেগুলোতে উৎপন্ন কম্পনের বারবার আবৃত্তির ফলে অসংখ্য স্বর উৎপন্ন হতে পারে। এই ব্রহ্মাণ্ডে মূল কণাগুলোর সংখ্যাও স্বরূপের দিক থেকে সীমিতই হয়, কিন্তু মোট সংখ্যার দিক থেকে সেগুলো অসংখ্য হয়। এই কারণে, একইভাবে বিভিন্ন লোক হিসাবে বিদ্যমান মূল কণাগুলোর পরিমাণ মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা মূল কণাগুলোর তুলনায় কমই হয়। এই সৃষ্টিতে সীমিত প্রকারের মূলকণা এবং অ্যাটমগুলো অসীম প্রকারের অণু তৈরি করে। এতেও সেই কণা এবং অ্যাটমগুলোর মিলনের পরিমাণ এবং আবৃত্তির পার্থক্য থাকে।

প্রাণ নামক প্রাণ এবং ছন্দ রশ্মিগুলো আকাশ তত্ত্ব উৎপন্ন করতে সাহায্য করে, পাশাপাশি সেগুলো উষ্মার উৎপাদনেও বিশেষ অবদান রাখে। এই রশ্মিগুলোর বিন্যাসের উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন কণার আয়ু নির্ধারিত হয়। সূক্ষ্ম প্রাণ রশ্মিগুলো কোনো ভৌতিক টেকনিকের দ্বারা কখনোই ব্যক্তরূপ প্রাপ্ত করতে পারে না, কিন্তু যখন সেগুলো ল্যাপটন, কোয়ার্ক আদির রূপে উৎপন্ন হয়, তখনই সেগুলো ভৌত টেকনিক দ্বারা অভিব্যক্ত হতে পারে। এই ল্যাপটন, কোয়ার্ক আদি পদার্থ বিভিন্ন প্রাণ এবং ছন্দাদি রশ্মির ভাণ্ডার হয়। যদিও প্রাণ বা ছন্দাদি রশ্মিগুলোর সমস্ত ক্রিয়া বা বল ভৌতিক টেকনিক দ্বারা অব্যক্তই থাকে, তবুও সেগুলো ব্যক্ত বল বা ক্রিয়াগুলোতে তাদের অব্যক্ত এবং অনিবার্য ভূমিকার সাথে বিদ্যমান থাকে। এগুলোর অনুপস্থিতিতে কোনো ব্যক্ত বল বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং এই সৃষ্টিতে কোনো পদার্থের অভিব্যক্তিও সম্ভব নয়।

স্মরণীয় তথ্য

1. সমস্ত মূল কণা এবং বিভিন্ন তরঙ্গাণুর উৎপত্তি বৈদিক মন্ত্রের ঘনীভবন থেকে হয়। এই মন্ত্রগুলো এখনও ব্রহ্মাণ্ডে বাণীর পশ্যন্তী রূপে বিদ্যমান আছে।
2. যখন রশ্মিগুলোর সমূহ পৃথক-পৃথক বিচরণ করতে-করতে স্বতন্ত্র থাকে, তখন সেগুলো আকাশের রূপ হয়।
3. যখন সেই রশ্মিগুলোর সমূহ কিছু ছন্দ রশ্মির দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অত্যন্ত ঘন রূপ

প্রাপ্ত করে, তখন সেগুলোই বিভিন্ন প্রকারের মূল কণার রূপ ধারণ করে।

4. যখন সেই রশ্মিসমূহ এই দুটির মধ্যবর্তী অবস্থা প্রাপ্ত করে, তখন সেইগুলোই বিভিন্ন প্রকারের তরঙ্গাণু (কোয়ান্টা) তৈরি করে।
5. মহৎ তত্ত্ব অক্ষরের কম্পন রূপেই থাকে।
6. কালের উৎপত্তির সময়ই সাম্যাবস্থায় অক্ষর রশ্মির বীজ রূপ অব্যক্ত রূপে উৎপন্ন হয়, যা 'ওম' রশ্মির পরা রূপে সঞ্চারিত হতেই ব্যক্ত হয়ে যায়।
7. 'ওম' ছন্দ রশ্মি অন্যান্য সমস্ত রশ্মির বীজ রূপ হয়। সমস্ত প্রাণ এবং ছন্দ রশ্মিগুলো এই থেকেই উৎপন্ন ও অনুপ্রাণিত হয়।

8. সূক্ষ্মতম উর্জাই স্থূল উর্জাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
9. যে রশ্মিগুলো নিজের চারপাশে অন্যান্য রশ্মিগুলোকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে বা বহন করে, তাদের ব্যাহৃতি রশ্মি বলে। এগুলো সাত প্রকারের (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং সত্যম্) হয়।
10. সমস্ত প্রাণ রশ্মি কখনও স্থির থাকে না অর্থাৎ ক্রমাগত চলতে থাকে। সাত প্রকার গতির

কারণে প্রাণ মূলত সাত প্রকার (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, সূত্রাত্মা বায়ু এবং ধনঞ্জয়) হয়।

11. মাস হল বিশেষ প্রকারের রশ্মির (মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস্, নভস্য, ঈষ, ঊর্জ্, সহস্, সহস্য, তপস্ এবং তপস্য) নাম, যা প্রাণ ও অপানের সংযুক্ত রূপের ত্রিশবার স্পন্দিত হওয়ার ফলে তৈরি হয়। এক মাসে ত্রিশটি প্রাণ-অপান যুগ্ম থাকে।

12. মাস রশ্মি ছাড়া সৃষ্টি বা সূর্যাদি লোক নির্মাণ সম্ভব হতে পারে না। এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন রশ্মিকে সংযুক্ত করার কাজ করে।

13. ঋতু হল একটি পদার্থ, যা রশ্মি (বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত এবং শিশির) রূপে হয়। দুই-দুটি মাস রশ্মির যুগ্মকে ঋতু বলা হয়।

14. ঋতু রশ্মি দিশাকে উৎপন্ন করে, অর্থাৎ এদের কারণে বিভিন্ন লোক বা কণার ঘূর্ণনের দিশা নির্ধারণে সহায়তা পাওয়া যায়। এই রশ্মিগুলো প্রকাশ উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

15. প্রাণ, অপান, উদান, মাস এবং ঋতু রশ্মির মধ্যে তমোগুণের মাত্রা অত্যন্ত কম থাকে। এই রশ্মিগুলো অন্যান্য সব রশ্মির তুলনায় অবিচ্ছিন্ন এবং বাধাহীনভাবে চলে।

16. যে ব্যবধানে একটি প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মির স্পন্দন হয়, সেই ব্যবধানকে এক প্রাণ বা অহন্ বলা হয়।

17. যে সময়ে একটি অপান রশ্মি একবার স্পন্দিত হয়, সেই সময়কে অপান বলা হয়।

18. অনেক ছন্দ রশ্মি, যা এই সৃষ্টিতে বিভিন্ন অতিসূক্ষ্ম রশ্মি থেকে উৎপন্ন হয়, ঋষি রশ্মি নামে পরিচিত।

19. বিভিন্ন প্রাণ রশ্মি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট সুতোর টুকরোর মতো আকৃতির হয়, যাদের উভয় প্রান্ত ভিন্ন-ভিন্ন গুণকারী হয়।

20. ছন্দ রশ্মিগুলো স্বরূপের দিক থেকে খুব সীমিত সংখ্যায় বিদ্যমান, কিন্তু বারবার আবৃত্তি হওয়ার কারণে এই ব্রহ্মাণ্ডে তাদের সংখ্যা অসীম।

অনুশীলনী

1. রশ্মি কাকে বলে ? অক্ষর রশ্মি কী ? এগুলো কত প্রকারের হয় ?

2. সৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রশ্মি কোনটি এবং তার স্বরূপ কী ?

3. রশ্মি প্রধানত কত প্রকারের হয় ? তাদের নাম লিখুন।

4. ব্যাহৃতি রশ্মি কত প্রকারের হয় এবং তাদের গুণ কী কী ?

5. প্রাথমিক প্রাণ কত প্রকারের হয় ? তাদের মধ্যে সবচেয়ে সূক্ষ্ম প্রাণ কোনটি ?

6. ধনঞ্জয় রশ্মির গুণাবলী লিখুন।

7. প্রাণ এবং অপানের গুণাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

8. কোন প্রাণের উপমা কচ্ছপ দিয়ে করা হয়েছে ?

9. কোন প্রাণ রশ্মি সর্বাধিক গতিশীল এবং কোন প্রাণ রশ্মি সবচেয়ে ধীর গতি সম্পন্ন হয় ? এই দুটি রশ্মির গুণাবলীও ব্যাখ্যা করুন।

10. মাস এবং ঋতু রশ্মি কাকে বলে ? এগুলো কত প্রকারের হয় ? নামগুলো উল্লেখ করুন।

11. ঋতু রশ্মির প্রধান কাজ কী কী ?

12. প্রাণ, অপান এবং ব্যান রশ্মির উৎপত্তি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

13. সৃষ্টিতে বেদ মন্ত্রের কী প্রভাব হয় ?

14. রশ্মির স্বরূপ কার সাথে মেলে ?

* * * * *

7 অধ্যায়

ছন্দ রশ্মির শ্রেণীবিভাগ

7.1 ভূমিকা

সৃষ্টি উৎপত্তি প্রক্রিয়াতে ছন্দ রশ্মির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, সমগ্র সৃষ্টিই হল ছন্দ রশ্মির খেলা। এই স্পন্দনগুলো বাক্ ও প্রাণ নামে পরিচিত। এই বাক্ তত্ত্বই হল 'ছন্দ', অর্থাৎ ছন্দ রশ্মিগুলো, যা মনস্তত্ত্বের অভ্যন্তরে স্পন্দন হিসেবে থাকে, সেগুলোই বাক্ তত্ত্ব হয়। 'ওম', 'ভূঃ', 'ভুবঃ', 'স্বঃ' আদি ছন্দ রশ্মি এবং প্রাথমিক প্রাণরূপী রশ্মিগুলো সকল মনস্তত্ত্বে সূক্ষ্ম স্পন্দন সৃষ্টি করে। ছন্দ রশ্মিগুলো —

- প্রকাশ উৎপন্ন করে।
- কোনো কণা বা তরঙ্গাণুকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে।
- বলগুলোকে সংযুক্ত করে এবং উৎপন্ন করে।
- প্রাণ রশ্মির মতো আচরণ করে।
- বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গাণু(কোয়ান্টা) এবং সমস্ত লোকের ভিত্তি হিসাবে তাদের ধারণ করে।
- সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এগুলোর দ্বারাই বাঁধা।

7.2 প্রথম প্রকারের শ্রেণীবিভাগ

চেতন তত্ত্ব 'ওম্' ছন্দ রশ্মির দ্বারা মনস্তত্ত্বকে স্পন্দিত করে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিকে উৎপন্ন করে। ছন্দ রশ্মি তিন প্রকারের হয় — 'ঋক্', 'য়জুঃ' এবং 'সাম'। এই তিন প্রকারের ছন্দ রশ্মি নির্মাণে মনস্তত্ত্ব এবং 'ওম্' রশ্মির ভূমিকার সাথে-সাথে যথাক্রমে 'ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ'-এর প্রধান ভূমিকা থাকে। সমস্ত ছন্দ রশ্মি এমন স্পন্দন রূপে উৎপন্ন হয়, যা উৎপন্ন হওয়ার সাথে-সাথেই বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিকে আবৃত করে যুগ্ম তৈরি করতে শুরু করে।

1. ঋক্ — এই রশ্মিগুলো সূক্ষ্ম দীপ্তিযুক্ত হয়। এই সৃষ্টিতে যে সমস্ত মূলকণা আছে, তাদের সকলের উৎপত্তিতে এই ছন্দ রশ্মিগুলোর প্রধান ভূমিকা থাকে। ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জিতেও ঋক্ রূপী ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য থাকে। এই রশ্মি থেকে উৎপন্ন পদার্থ যখন অপ্রকাশিত বা ঘন রূপ ধারণ করে, সেই সময় তাতে আকর্ষণ বলেরও প্রবলতা হয়ে যায়। এই ছন্দ রশ্মি তথা

সাম রশ্মিতে বাক্ তত্ত্ব অর্থাৎ 'ওম্' রশ্মির প্রাধান্য (মনস্তত্ত্বের সাপেক্ষে) থাকে। এই কারণে এই দুই প্রকারের রশ্মিগুলো বিশেষ বলযুক্ত হয়। এইভাবে উপরোক্ত গুণাবলী যুক্ত ছন্দ রশ্মিগুলোকে ঋক্ বলা হয়।

2. য়জুঃ — এই ছন্দ রশ্মিগুলো বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আকাশ তত্ত্বে (স্পেস) এদের প্রাধান্য এবং ব্যাপকতা থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত প্রকারের গতি এই ছন্দ রশ্মিগুলোর ভিতরে নিরন্তর চলতে থাকে। এর সাথে এই রশ্মিগুলো নিরন্তর গতিশীল হয়। এই ছন্দ রশ্মিগুলোতে বাক্ তত্ত্বের চেয়ে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে। এই কারণে এই রশ্মিগুলো অন্য রশ্মিগুলোকে আধার প্রদান করে।

3. সামঃ — এই সৃষ্টিতে সমস্ত প্রকারের তরঙ্গাণু (কোয়ান্টা) এবং তথাকথিত মধ্যস্থ কণাতে (মিডিয়েটর পার্টিকলস) এদেরই প্রাধান্য থাকে। ব্রহ্মাণ্ডস্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ নিরন্তর সাম রশ্মির দ্বারা ওতপ্রোত থাকে। এই ছন্দ রশ্মিগুলোতে ভেদন ক্ষমতা বিশেষ থাকে। **বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা সংজ্ঞায়িত ঊর্জাও দ্রব্যের পালন ও রক্ষণ করে।**

'ঋক্' সংজ্ঞক সমস্ত ছন্দ রশ্মিতে 'ভূঃ' ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য থাকে এবং অন্য দৈবী ছন্দ রশ্মিগুলো গৌণ থাকে। এইভাবে 'য়জুঃ' সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মিগুলোতে 'ভুবঃ' এবং 'সাম' সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মিগুলোতে 'স্বঃ' দৈবী ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য থাকে, অন্য দৈবী ছন্দ রশ্মিগুলো গৌণ থাকে।

সমস্ত প্রকারের ছন্দ রশ্মি, যা মন্ত্রের রূপে বেদ সংহিতাগুলোতে উপলব্ধ এবং তাদের মধ্যে কিছু অনুপলব্ধও আছে, এই ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান আছে। এদের দ্বারাই সম্পূর্ণ সৃষ্টি তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত প্রকারের মন্ত্র রূপ ছন্দ রশ্মিগুলো উপরোক্ত তিন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

7.3 দ্বিতীয় প্রকারের শ্রেণীবিভাগ

এবার আমরা ছন্দ রশ্মিগুলোর অন্য প্রকারের শ্রেণীবিভাজনের ওপর বিস্তারিত বিচার করবো —

এই সৃষ্টিতে ছন্দ রশ্মি অনন্ত বা অসংখ্য মাত্রায় বিদ্যমান আছে, কিন্তু গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে এদের প্রধান রূপে সাতটি বিভাগ হয়। এই সাতটি ছন্দ হল — গায়ত্রী, উষ্ণীক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী। এই সাতটি ছন্দ রশ্মিরও দৈবী, আসুরী, প্রাজাপত্য, য়াজুষী, সাম্নী, আর্চী, আর্ষী এবং ব্রাহ্মী, এই আটটি ভেদ মানা হয়।

এবার আমরা এই সাতটি ছন্দ রশ্মির বিষয়ে ক্রমশঃ বিচার করবো —

1. গায়ত্রী — 'ওম' ছন্দ রশ্মি যখন মনস্তত্ত্বকে প্রেরিত করতে শুরু করে, তখন সর্বপ্রথম যে রশ্মি (স্পন্দন) উৎপন্ন হয়, তাকে গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি বলে। এই রশ্মি তিন প্রকারের গতিযুক্ত হয়। এর গতি অন্যান্য ছন্দের তুলনায় সর্বাধিক হয়। সৃষ্টি রচনার প্রথম পর্যায়ে এদেরই সর্বাধিক প্রাধান্য থাকে। এই রশ্মি থেকে প্রকাশের উৎপত্তি হয়। পিঙ্গল ছন্দ সূত্রে গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি থেকে উৎপন্ন প্রকাশকে শ্বেত (সাদা) বর্ণ বলা হয়েছে। এই ছন্দ রশ্মি অন্যান্য সব ছন্দ রশ্মির মুখের সমান হয়। এর অর্থ হল, যেভাবে মুখ থেকে উচ্চারিত বাণী অন্য ব্যক্তিকে প্রেরিত করে, সেভাবে গায়ত্রী রশ্মি অন্যান্য সব ছন্দ রশ্মিকে প্রেরিত করে। এই রশ্মিগুলো সবাইকে বল প্রদান করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

2. উষ্ণিক — এই রশ্মিগুলো গায়ত্রী রশ্মিগুলোকে উপর থেকে আবৃত করে এবং সেগুলোর মধ্যে অন্য ছন্দ রশ্মির প্রতি পারস্পরিক আকর্ষণের ভাব তৈরি করে। বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির মধ্যে এগুলো সংযোজকতা বৃদ্ধি করে। এই রশ্মিগুলো অন্যান্য রশ্মিকে নিজেদের সাথে এমনভাবে যুক্ত করতে সহায়ক হয়, যেমনটা শরীরের ঘাড় ধর এবং মাথাকে যুক্ত করে। এর পাশাপাশি এই রশ্মিগুলো অন্যান্য রশ্মি থেকে নির্গত অতি সূক্ষ্ম রশ্মিগুলোকে ক্রমাগত শোষণ করতে থাকে, যার ফলে যজন অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই রশ্মিগুলো প্রাণ রশ্মিকে আচ্ছাদিত করতে ত্বকের মতো গায়ত্রী রশ্মির উপর লোমের (চুলের) মতো সংযুক্ত থাকে। এগুলো অন্য রশ্মিগুলোর প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এগুলো অন্য রশ্মিকে তীক্ষ্ণ করতে সাহায্য করে। এই রশ্মিগুলোর প্রভাবে গায়ত্রী রশ্মি আরও সক্রিয় হয়, যার ফলে উষ্ণতাও বৃদ্ধি পায়। এগুলো থেকেই ব্রহ্মাণ্ডে সারঙ্গ অর্থাৎ রঙিন রূপের উৎপত্তি হতে শুরু করে।

3. অনুষ্টুপ — এই ছন্দ রশ্মিগুলো অন্য ছন্দ রশ্মিগুলোকে অনুকূলভাবে ধরে রাখে। এর অর্থ হল, এই রশ্মিগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে অথবা এদের উপস্থিতিতে সকল ছন্দ রশ্মি তাদের কাজ খুব সহজে এবং সক্রিয়ভাবে করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো রশ্মি প্রকাশ উৎপন্ন করতে ভূমিকা পালন করে, তবে সেই রশ্মিটি অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মির সাথে মিলে সহজে আরও অধিক প্রকাশ উৎপন্ন করবে। এই রশ্মিগুলো অন্য ছন্দ রশ্মির য়োনি রূপ হয়, এর অর্থ হল এই ছন্দ রশ্মিগুলোর মধ্যে সব ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে। এর পাশাপাশি অনেক ছন্দ রশ্মি অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি থেকেই উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে 'ওম্' রশ্মির মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। এই রশ্মিগুলো প্রাণ রশ্মি থেকে ক্রমাগত প্রবাহিত হয়। এগুলোর মধ্যে ভেদন ক্ষমতা থাকে। এগুলো থেকে লাল মিশ্রিত বাদামী রঙের উৎপত্তি হয়।

ছন্দ রশ্মির শ্রেণীবিভাগ

4. বৃহতী — এই রশ্মিগুলো অন্যান্য রশ্মি, বিভিন্ন কণা বা লোক তৈরির সময় পদার্থকে সব দিক থেকে আবৃত ও সংকুচিত করে নির্মাণাধীন কণা বা লোকগুলোর পরিধি তৈরিতে সহায়ক হয়। এগুলো সেই লোক বা কণাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে থাকে। আকাশ তত্ত্বে এই রশ্মিগুলোর প্রাধান্য থাকে। বিভিন্ন নক্ষত্র আদি প্রকাশিত লোকগুলোর কেন্দ্রীয় অংশেও এদের প্রাচুর্য থাকে। এগুলো সংযুক্ত হওয়া কণা থেকে তৈরি নতুন কণাকেও পরিধি রূপে আবৃত করে তাকে ঘনীভূত করে রাখে। প্রাণ রশ্মি এই বৃহতী রশ্মিগুলোর উপস্থেন্দ্রিয়ের সমান কাজ করে। ব্রহতীর কারণেই জ্বালাযুক্ত অগ্নির উৎপত্তি হয়। এই রশ্মিগুলো সবাইকে সীমাবদ্ধ করার কাজ করে। এদের বর্ণ কৃষ্ণ (কালো) হয়।

5. পঙক্তি — এই রশ্মিগুলোতে পাঁচ প্রকার গতি বিদ্যমান থাকে। এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন রশ্মি বা কণা আদি পদার্থ দ্বারা ক্রমাগত শোষিত হতে থাকে। এই কারণে এই রশ্মিগুলো বিশেষ য়োজনশীল অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার স্বভাবযুক্ত হয়। এই রশ্মিগুলো প্রাণ রশ্মির মজ্জার সমান কাজ করে। যেভাবে শরীরে বিদ্যমান অস্থিগত মজ্জা সম্পূর্ণ শরীরের রক্তকে জীবন্ত বানিয়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, ঠিক সেভাবেই পঙক্তি ছন্দ রশ্মিগুলোর উপস্থিতিতে প্রাণ রশ্মিগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। এগুলো থেকে নীল বর্ণের উৎপত্তি হয়।

6. ত্রিষ্টুপ্ — এই ছন্দ রশ্মিগুলো সমস্ত ছন্দ রশ্মি সমষ্টির নাভিরূপ হয়ে পরস্পরকে বেঁধে রাখে। নক্ষত্রের ভিতরে, বিশেষ করে সেগুলোর কেন্দ্রীয় অংশে এদের প্রাচুর্য থাকে। এদের কারণে তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ তরঙ্গের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধি হয়। এই রশ্মিগুলো অন্যান্য ছন্দ রশ্মিগুলোকে তীব্র তেজ ও বল প্রদান করে। এগুলো প্রাণ রশ্মির মাংস রূপ হয় অর্থাৎ এদের দ্বারা বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিগুলো পূর্ণ বল প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। এই রশ্মিগুলো অন্যান্য রশ্মি ও কণা আদি পদার্থকে তিন প্রকারে ধরে রাখে, এই কারণেই এদের ত্রিষ্টুপ্ বলা হয়। এগুলো অসুর পদার্থ অর্থাৎ ডার্ক এনার্জি আদির বাধক প্রভাবকে নষ্ট করতে সক্ষম হয়। আকাশ তত্ত্বেও এদের প্রাচুর্য থাকে। এগুলো থেকে লাল রঙের উৎপত্তি হয়।

7. জগতী — এই রশ্মিগুলো সর্বাধিক দূর পর্যন্ত গমন করতে সক্ষম হয়। সম্পূর্ণ জগৎ এই রশ্মিগুলোতেই প্রতিষ্ঠিত, তাই এদের জগতী বলা হয়। এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন সংযোজ্য কণা বা তরঙ্গাণুকে (কোয়ান্টা) বেঁধে রাখে এবং বিভিন্ন কণাকে সংযোগ আদি প্রক্রিয়ার জন্য সক্ষম করে। ঊর্জা ও ইলেকট্রনের নিঃসরণ ও শোষণের প্রক্রিয়া এই রশ্মিগুলোর কারণেই সম্পন্ন হয়। এই রশ্মিগুলো সম্পূর্ণ ছন্দ রশ্মি সমূহের মেরুদণ্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর অর্থ

হল, এই রশ্মিগুলো সম্পূর্ণ প্রাণ রশ্মি সমূহকে কাঠামোগত ভিত্তি প্রদান করে, যার উপর সমস্ত ছন্দ রশ্মি আশ্রিত থাকে। এগুলো থেকে গৌর বর্ণের উৎপত্তি হয়।

এই ভাবে এই সাতটি ছন্দ রশ্মির স্বরূপের সাধারণ বর্ণনা করার পর এদের বিভিন্ন বিভাগের বর্ণনা করবো।

7.4 ছন্দ রশ্মির আটটি বিভাগ

সকল সাতটি ছন্দ রশ্মি মূলত আট প্রকারের হয়। এই আট প্রকার নিম্নরূপ —

1. দৈবী — এই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বপ্রথম এই ছন্দ রশ্মিগুলোর উৎপত্তি হয়। 'ওম্', 'ভূঃ', 'ভুবঃ', 'সুবঃ' আদি মূল ছন্দ রশ্মিই দৈবী ছন্দ রশ্মি নামে পরিচিত। এদের কারণে অব্যক্ত সূক্ষ্মতম জ্যোতি তথা অতি সূক্ষ্ম বলের উৎপত্তি হয়। এটি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকে। পূর্বোক্ত সকল সাতটি ছন্দ রশ্মির দৈবী রূপে অক্ষর সংখ্যা নিম্নরূপ হয় — দৈবী গায়ত্রী–1, দৈবী উষ্ণিক–2, দৈবী অনুষ্টুপ্–3, দৈবী বৃহতী–4, দৈবী পঙক্তি–5, দৈবী ত্রিষ্টুপ্–6 এবং দৈবী জগতী–7 অক্ষর থাকে।

2. য়াজুষী — এদের প্রভাবে সূক্ষ্ম রশ্মিতে সূক্ষ্ম ও নিরন্তর গতি ও য়জন ক্রিয়া উৎপন্ন হতে থাকে। এইসময় আকাশ তত্ত্বের উৎপত্তি হতে থাকে। সম্পূর্ণ পদার্থ নিরন্তর স্পন্দিত করতে থাকে।

3. প্রাজাপত্যা — এই ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হলে বিভিন্ন রশ্মির সংযোগ, বন্ধন আদির প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ হয়ে নতুন রশ্মি উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াও দ্রুত হয়। এই রশ্মিগুলো লঘু ছন্দ রূপেই হওয়াতে মরুৎ নামে পরিচিত, যা ধীরে ধীরে গমন করে।

4. সান্নী — বিভিন্ন বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, কথিত মিডিয়েটর পার্টিকলস আদির উৎপত্তিতে এদের ভূমিকা থাকে। এর প্রভাবে প্রকাশ, উষ্মা এবং বিভিন্ন প্রকার বলের সমৃদ্ধি হতে থাকে।

5. আসুরী — এই রশ্মির প্রভাবে অসুর (ডার্ক ম্যাটার বা ডার্ক এনার্জি) তত্ত্বের উৎপত্তি হয় অথবা রশ্মিগুলো নিজেরাই ডার্ক রূপে বিদ্যমান থাকে। এই রশ্মিগুলোতে পারস্পরিক আকর্ষণ অত্যন্ত অল্প বা নগণ্য হয়, কিন্তু বিকর্ষণ বা প্রক্ষেপক বলের প্রাধান্য থাকে। এদের মধ্যে মনস্তত্ত্ব এবং অপান প্রাণের প্রাধান্যও থাকে।

6. আর্চী — এই রশ্মিগুলোর প্রভাবে বিভিন্ন অপ্রকাশিত পদার্থ অর্থাৎ নানা মূলকণা ও জগতের সৃষ্টি হতে শুরু করে। এই কারণে, এই রশ্মিগুলো বিভিন্ন রশ্মি এবং তরঙ্গ কণা আদির ঘনীভবন এবং ভেদন প্রক্রিয়াকে তীব্র করে।

ছন্দ রশ্মির শ্রেণীবিভাগ

7. আর্ষী — প্রাণাদি রশ্মি থেকে উৎপন্ন অধিকাংশ ছন্দ রশ্মিই আর্ষী নামে পরিচিত। যখন ব্রহ্মাণ্ডে কসমিক মেঘ এবং সেগুলো থেকে বিভিন্ন লোক নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন প্রধানত এই আর্ষী ছন্দ রশ্মির প্রাধান্য থাকে।

8. ব্রাহ্মী — এই ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হলে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির বল ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে।

এইভাবে, প্রতিটি গায়ত্রী আদি ছন্দের মোট আট প্রকারের বিভাগ আছে। এইভাবে, এখানে মোট ৫৬ প্রকারের ছন্দ রশ্মি বর্ণিত হয়েছে। এই ছন্দ রশ্মিগুলোতে অক্ষরের সংখ্যা কত, তা আমরা নিচের তালিকা থেকে বুঝতে পারবো —

ছন্দঃ	গায়ত্রী	উষ্ণিক	অনুষ্টুপ	বৃহতী	পঙক্তি	ত্রিষ্টুপ্	জগতী
আর্ষী	24	28	32	36	40	44	48
দৈবী	1	2	3	4	5	6	7
আসুরী	15	14	13	12	11	10	9
প্রাজাপত্যা	8	12	16	20	24	28	32
য়াজুষী	6	7	8	9	10	11	12
সান্নী	12	14	16	18	20	22	24
আর্চী	18	21	24	27	30	33	36
ব্রাহ্মী	36	42	48	54	60	66	72

এই তালিকায় আপনি যে সমান অক্ষর সংখ্যাযুক্ত ছন্দগুলো দেখছেন, তার কারণ হল অক্ষরের বিন্যাসে পার্থক্য। যেমন আপনি সমভারিক (আইসোবার) সমস্থানিক (আইসোটোপ) উপাদান সম্পর্কে পড়েছেন। এই বিষয়টি ছন্দ শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করেই বোঝা সম্ভব।

7.5 ছন্দের অন্যান্য উপভেদ

এখন আমি প্রতিটি প্রকারের ছন্দ রশ্মির অন্যান্য কিছু ভেদের আলোচনা করবো। উপরোক্ত প্রকারের ছন্দ রশ্মিকে পুনরায় অক্ষর ভেদের কারণে নিম্নরূপ বিভক্ত হয় —

1. সামান্য ছন্দ — যেসব ছন্দ রশ্মিতে অক্ষরের সংখ্যা পূর্বানুসারী অর্থাৎ তালিকা ও বর্ণনানুযায়ী হয়, সেগুলোকে আমরা সামান্য ছন্দ বলতে পারি। এইসবের সামান্য প্রভাব ছন্দের প্রভাবই হবে।

ছন্দ রশ্মির শ্রেণীবিভাগ

2. ভুরিক্ ছন্দ — এই প্রকারের ছন্দ রশ্মিগুলোতে উপরোক্ত সামান্য ছন্দের চেয়ে একটি অক্ষর বেশি থাকে। এই ছন্দ রশ্মিগুলোর ধারক ও পোষণ ক্ষমতা অন্যান্য প্রকারের ছন্দ রশ্মির চেয়ে বিশেষ বেশি হয়। এই রশ্মিগুলো বাহুর মতো হওয়ায় ধারণ, আকর্ষণ, আটকানো আদি গুণকে অপেক্ষাকৃত বেশি সমৃদ্ধকারী হয়।

3. স্বরাট্ ছন্দ — যখন কোনো ছন্দ রশ্মিতে অক্ষরের সংখ্যা সামান্যের চেয়ে ২ টি বেশি হয়, তখন সেই ছন্দ রশ্মি স্বরাটের রূপ ধারণ করে। এই ছন্দ রশ্মিগুলো অন্যদের চেয়ে প্রকাশ বা বৈদ্যুতিক প্রভাব উৎপন্ন করতে বিশেষ সক্ষম হয়।

4. বিরাট্ ছন্দ — যখন কোনো ছন্দ রশ্মিতে সামান্যের চেয়ে অক্ষরের সংখ্যা ২ টি কম হয়, তখন সেই ছন্দ রশ্মি বিরাট্ নামে পরিচিত হয়। এর সমস্ত অক্ষর বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশিত হতে সক্ষম হয়। এই ছন্দ রশ্মি অন্য ছন্দ রশ্মিগুলোর প্রতি সংযোজক গুণাবলীতে বিশেষভাবে যুক্ত থাকে। এর প্রভাব ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক হয়।

5. নিচৃত্ ছন্দ — এই রশ্মিগুলো ভেদক ও বন্ধক উভয় প্রকারের বল দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে যুক্ত থাকে। যখন সামান্য ছন্দ রশ্মি থেকে একটি অক্ষর কম হয়ে যায়, তখন সেই ছন্দ রশ্মি নিচৃত্ রূপ ধারণ করে অর্থাৎ সেই সামান্য ছন্দ রশ্মির প্রভাব অধিক তীক্ষ্ণ ভেদক হয়ে যায়।

এইভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডে শত শত প্রকারের ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান আছে। অক্ষরের সংখ্যা ও সেগুলোতে অক্ষর বিন্যাসের পার্থক্যের কারণে ছন্দ রশ্মিগুলোর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে থাকে।

7.6 রশ্মির ছন্দ কীভাবে নির্ণয় করবেন ?

কোনো রশ্মির ছন্দ জানার জন্য সেই মন্ত্রে স্বরগুলোর গণনা করুন, কারণ তাদের সংখ্যা দিয়েই ছন্দ নির্ধারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত মন্ত্রে 23 টি অক্ষর (স্বর) আছে। সামান্য (24) থেকে একটি অক্ষর কম হওয়ার কারণে এটি হল নিচৃত্ ছন্দ। তাই এর ছন্দ হল **আর্ষী নিচৃত্ গায়ত্রী।**

ছন্দ রশ্মির শ্রেণীবিভাগ

7.7 রশ্মির পরিবর্তন হওয়া

এই সৃষ্টিতে বিভিন্ন মৃদু ও তীব্র বলযুক্ত বিভিন্ন প্রকারের কণা এবং বিকিরণ মিলে এবং তারও পূর্বে বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি মিলে অবশেষে তীব্র জ্বালাযুক্ত বিশাল নক্ষত্র আদি লোকের সৃষ্টি করে। লোক নির্মাণের এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তীব্র ঊর্জাযুক্ত তরঙ্গ যখন তাদের কিছু পরিমাণ ঊর্জা হারাতে শুরু করে, তখন সেই তরঙ্গগুলোই কম ঊর্জাযুক্ত অন্যান্য তরঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। সেই তরঙ্গগুলো এবং বিভিন্ন প্রকারের কণা নিজেদের মতো একই গুণধর্মযুক্ত পদার্থের জন্ম দেয়। বিশেষ কারণ উপস্থিত হলে বিভিন্ন কণা অন্য কণায় এবং বিকিরণও অন্য বিকিরণে পরিবর্তিত হতে থাকে। একইভাবে সৃষ্টিতে ছন্দ রশ্মিগুলোও একে অপরের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। ত্রিষ্টুপ ছন্দ রশ্মিগুলো সবচেয়ে বেশি বলশালী হয়। সেগুলোই ক্ষীণবল হলে গায়ত্রী, জগতী আদি অন্য ছন্দ রশ্মিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। অন্যদিকে গায়ত্রী আদি ছন্দ রশ্মিগুলোও ত্রিষ্টুপ আদি ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন করে।

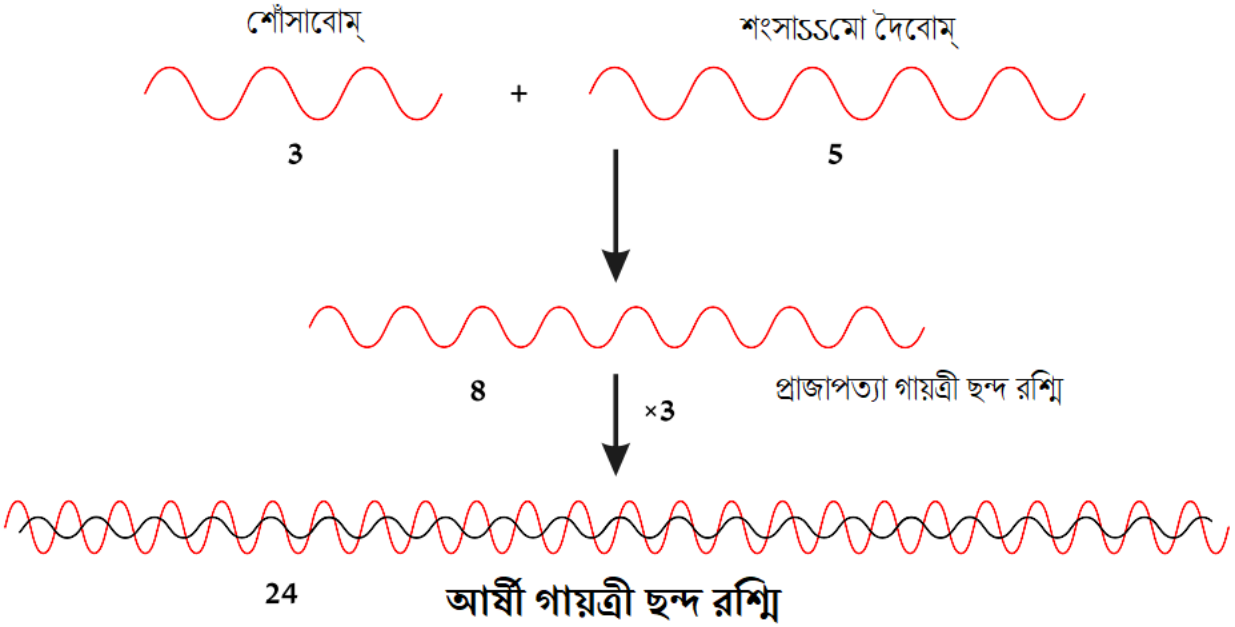

ছোট ছন্দ রশ্মি থেকে বড় ছন্দ রশ্মির নির্মাণ

একটি ছন্দ রশ্মি অন্য একটি ছন্দ রশ্মির সাথে মিশে একটি নতুন তৃতীয় ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন করে। এখানে উদাহরণস্বরূপ গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি নির্মাণের প্রক্রিয়ায় তিন অক্ষর যুক্ত 'শোঁসাবোম্' ছন্দ রশ্মি পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট 'শংসাISSমো দৈবোম্'-এর সাথে মিশে আট অক্ষর বিশিষ্ট 'প্রাজাপত্যা গায়ত্রী' ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন করে। প্রাজাপত্যা গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি তিনবার সংযুক্ত হয়ে আর্ষী গায়ত্রী ছন্দ উৎপন্ন করে।

ছন্দ রশ্মির শ্রেণীবিভাগ

এই সৃষ্টিতে বিভিন্ন নিরাবেশিত কণা সূক্ষ্ম এবং সংকুচিত মরুৎ রশ্মির সাথে সংযোগ করে বিদ্যুৎ আবেশিত কণাতে রূপান্তরিত হতে থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা জানা এমন মূলকণা, যা পরস্পর একে-অপরের মধ্যে পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকে, সেই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার পিছনে এই সংকুচিত মরুৎ রশ্মিগুলোই উত্তরদায়ী হয়। এই সংকুচিত মরুৎ রশ্মিগুলোকে বর্তমান বৈজ্ঞানিকরা ইলেকট্রন-কোয়ার্ক আদি কণা নামে অভিহিত করেন।

সৃষ্টির সমস্ত জড় পদার্থ একে অপরের মধ্যে পরিবর্তিত হতে পারে এবং হতে থাকে। বিভিন্ন সূক্ষ্ম রশ্মি অথবা বিকিরণের একে অপরের মধ্যে পরিবর্তিত হওয়া সৃষ্টির সামান্য ক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা কখনো-কখনো এবং কোথাও-কোথাও হয়ে থাকে। সামান্য প্রক্রিয়া হল এই যে, বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গগুলো তাদের নিজস্ব স্বরূপ বজায় রাখে।

এপর্যন্ত আমি চেতন তত্ত্ব দ্বারা প্রকৃতি পদার্থ থেকে কাল ও মহৎ তত্ত্ব থেকে শুরু করে প্রাণ ও ছন্দ আদি বিভিন্ন সূক্ষ্ম রশ্মির উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে বুঝিয়েছি, এখন পরবর্তী পদার্থগুলোর উৎপত্তি ও স্বরূপের বর্ণনা এরপর করা হবে। বর্তমান বিজ্ঞান কাল ও আকাশের স্বরূপ বা উৎপত্তি বিজ্ঞান সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। মূলকণা ও তরঙ্গের উৎপত্তি ও গঠনও এখনও পর্যন্ত বর্তমান বিজ্ঞানের কাছে অজানা। এপর্যন্ত আমি সৃষ্টি বিজ্ঞানে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি, সেই বিষয়গুলোর উপর বর্তমান ভৌতিকীর মধ্যে কোনো কল্পনাও নেই আর এই জ্ঞান ছাড়া সৈদ্ধান্তিক ভৌতিকীর বিকাশ যাত্রা এগোতে পারছে না, তাতে একটি ছেদ পড়েছে, এই কথা বৈজ্ঞানিকরা নিজেরাই অনুভব করছেন যে, তারা এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।

স্মরণীয় তথ্য

1. ‘ওম্’, ‘ভূঃ’, ‘ভূবঃ’, ‘স্বঃ’ আদি ছন্দ রশ্মি এবং প্রাথমিক প্রাণ রূপী রশ্মিগুলো সবই হল মনস্তত্ত্বে উৎপন্ন সূক্ষ্ম স্পন্দন।
2. ছন্দ রশ্মি তিন প্রকারের হয়, ‘ঋক্’, ‘য়জুঃ’এবং ‘সাম’। এদের নির্মাণে মনস্তত্ত্ব এবং ‘ওম্’ রশ্মির ভূমিকার সাথে-সাথে যথাক্রমে ‘ভূঃ’, ‘ভুবঃ’ এবং ‘স্বঃ’-এর প্রধান ভূমিকা থাকে।
3. সমস্ত ছন্দ রশ্মি এমন স্পন্দন হিসাবে উৎপন্ন হয়, যা উৎপন্ন হওয়ার সাথে-সাথেই বিভিন্ন প্রাণ

ছন্দ রশ্মির শ্রেণীবিভাগ

রশ্মির সাথে বন্ধন তৈরি করে।

4. এই সৃষ্টিতে ছন্দ রশ্মি অনন্ত বা অসংখ্য পরিমাণে বিদ্যমান আছে, কিন্তু গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে প্রধানত এদের সাতটি বিভাগ (গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী) হয়।
5. সাত প্রকারের ছন্দ রশ্মিরও দৈবী, আসুরী, প্রাজাপত্যা, য়াজুষী, সাম্নী, আর্চী, আর্ষী এবং ব্রাহ্মী, এই আটটি ভেদ মানা হয়।
6. সর্বপ্রথম যে রশ্মিগুলো (স্পন্দন) মনস্তত্ত্বে উৎপন্ন হয়, সেগুলো গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি নামে পরিচিত। এই রশ্মিগুলো সবাইকে বল প্রদান করার কাজ করে।
7. আট প্রকারের ছন্দ রশ্মির অক্ষর ভেদের কারণে আবার পাঁচটি (সামান্য, ভুরিক্, স্বরাট্, বিরাট্ এবং নিচৃত্ ছন্দ) ভেদ হয়।
8. ব্রহ্মাণ্ডে শত-শত প্রকারের ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান আছে। অক্ষরের সংখ্যা ও তাদের অক্ষর-বিন্যাসের ভেদে ছন্দ রশ্মির স্বরূপ পরিবর্তিত হতে থাকে।
9. কোনো রশ্মির ছন্দ জানার জন্য সেই মন্ত্রে স্বর গণনা করা হয়, কারণ তাদের সংখ্যা থেকেই ছন্দের নির্ধারণ হয়।
10. লোকপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রে 23 টি অক্ষর (স্বর) [সামান্য (24) থেকে এক অক্ষর কম] থাকার কারণে এটি নিচৃত্ ছন্দ হয়। তাই এর ছন্দ হল আর্ষী নিচৃত্ গায়ত্রী।
11. বিভিন্ন কণা অন্য কণায় এবং বিকিরণও অন্য বিকিরণে পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমন, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিগুলো সবচেয়ে বেশি বলশালী হয়, ক্ষীণবল হলে গায়ত্রী, জগতী আদি অন্য ছন্দ রশ্মিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

অনুশীলনী

1. ঋক্, য়জু ও সাম এই তিন প্রকারের ছন্দ রশ্মির গুণাবলি বর্ণনা করুন।
2. ছন্দ রশ্মির প্রধান প্রকারগুলো কী কী ? এদের মধ্যে কোন ছন্দ রশ্মি সবার প্রথমে উৎপন্ন হয় এবং কোন ছন্দ রশ্মি সবচেয়ে বেশি বল উৎপন্ন করে ?
3. পদার্থের ঘনীভবন, কণা এবং লোকগুলোর পরিধি গঠনের প্রক্রিয়ায় কোন ছন্দ রশ্মির

সবচেয়ে বেশি ভূমিকা থাকে ?

4. ছন্দ রশ্মিগুলোর দ্বিতীয় প্রকারের শ্রেণীবিভাগ কীসের ভিত্তিতে হয় ?

5. ছন্দ রশ্মিগুলোর আটটি বিভাগ কী কী ? এবং এদের মধ্যে আসুরী ছন্দ রশ্মির গুণ কী ?

6. আকাশ সৃষ্টির সময় কোন ছন্দ রশ্মিগুলো উৎপন্ন হচ্ছিল ?

7. ছন্দগুলোর কত প্রকারের উপ-বিভাগ হয় এবং তাদের মধ্যে কোন প্রকারের ছন্দ রশ্মি সবচেয়ে বেশি তীব্র প্রভাব সৃষ্টি করে ?

8. রশ্মিগুলোর একে অপরের মধ্যে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলুন।

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

৪ অধ্যায়

আকাশ

গত অধ্যায়ে বর্ণিত রশ্মিগুলোর উৎপত্তির সময়েই আকাশের উৎপত্তি হয়। 'আকাশ' শব্দটি দুটি রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রথম রূপটি হল অবকাশ রূপ আকাশ, যা অভাব বা শূন্য রূপ। অন্যদিকে, বেদের মধ্যে অপর ব্যোম নামে দ্বিতীয় আকাশের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ইঙ্গিতকে **মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী** 'ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এই আকাশ একটি বিশেষ পদার্থের নাম, যা নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

৪.১ আকাশের উৎপত্তি

মনস্তত্ত্ব থেকেই পাঁচটি মহাভূত উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির বিভিন্ন প্রকার মিলনের মাধ্যমেই এই সৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ — এই পাঁচটি মহাভূতই এদের থেকে তৈরি, যার মধ্যে আকাশ মহাভূতের উৎপত্তি সবার আগে হয়। বর্তমান ভৌতিক বৈজ্ঞানিকরা আকাশ তত্ত্ব (স্পেস) সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্ত বা সংশয়ের মধ্যে আছেন। তারা আকাশকে ত্রিমাত্রিক (3D) মনে করেন, কিন্তু আকাশের স্বরূপ কী? শূন্যস্থানই কি আকাশ? নাকি আকাশ কোনো পদার্থ? এই প্রশ্নগুলোর তাদের কাছে কোনো স্পষ্ট উত্তর নেই। তারা গুরুত্বাকর্ষণ বল অথবা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বলের মাধ্যমে আকাশকে বক্র বা বিকৃত মনে করেন, কিন্তু একে কোনো বিশেষ পদার্থ বলতে দ্বিধাবোধ করেন।

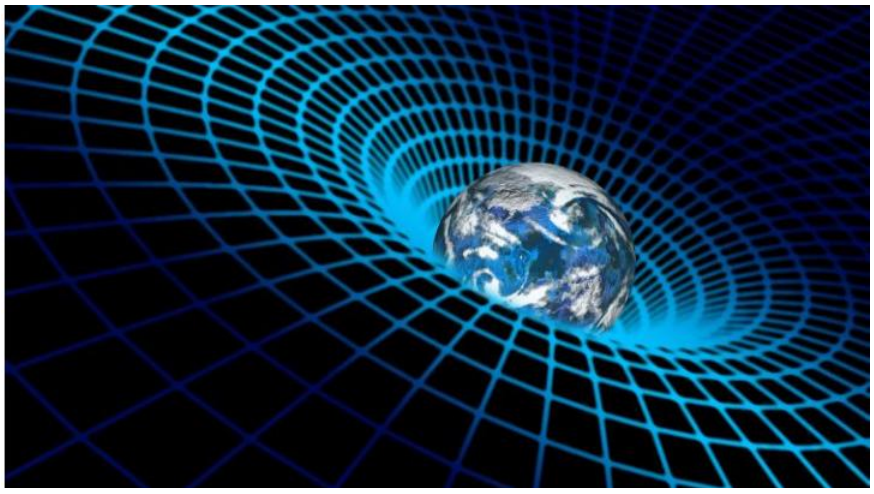

যখন আকাশ কোনো পদার্থই নয়, তখন বলের কারণে বিকৃতি অথবা বক্রতা কিসের মধ্যে হবে? আশ্চর্যের বিষয় হল, বর্তমান উন্নত বলে গণ্য ভৌতিক বিজ্ঞান গুরুত্বাকর্ষণ বলকে আকাশের বক্রতা রূপেই মানে ও জানে, কিন্তু আকাশ কী? তা তারা জানে না। এদিকে বৈদিক বিজ্ঞান আকাশ তত্ত্বের বিষয়ে ব্যাপক তথ্য উপস্থাপন করে। বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে আকাশ তত্ত্বের স্বরূপ সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ —

8.2 আকাশের স্বরূপ

আকাশ হল একটি পদার্থ, সব ধরণের কণা ও তরঙ্গাণু আকাশ তত্ত্বেই উৎপন্ন হয় ও তাতেই বাস করে। আকাশ প্রাণ রশ্মি রূপেই বিদ্যমান থাকে। যখন প্রাণ, অপান এবং উদান রশ্মির এক হাজার বার আবৃত্তি হতে থাকে, তখন বিভিন্ন প্রাণের সঙ্গমে অন্যান্য ছন্দ রশ্মি আকাশ তত্ত্ব রূপে উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন ছন্দ ও প্রাণ রশ্মির মিশ্রণ আকাশ তত্ত্বকে বক্র বা বিকৃত করার ক্ষমতা রাখে। আকাশ স্বয়ং রশ্মি রূপ এবং এই রশ্মি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়। আকাশ তত্ত্ব বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গাণুকে ধরে রাখতে সহায়ক হয়। এতে বৃহতী ছন্দ রশ্মি প্রচুর মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এটি এত সূক্ষ্ম হয় যে এর স্বরূপ অভাব বা শূন্যতার মতো মনে হয়। এতে রশ্মির প্রাচুর্য থাকে তথা এটি সব পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে। এটি ছিদ্রের মতো অর্থাৎ ফাঁপা হওয়ার মতো আচরণ করে। এতে 'ওম্', ত্রিষ্টুপ্, মরুৎ, সূত্রাত্মা বায়ু ও ছন্দ আদি রশ্মির প্রাচুর্য আছে। এটি বিভিন্ন বড় ছন্দ রশ্মি, মূল কণা, বিকিরণ আদিকে গতিশীল থাকার জন্য অবকাশ ও মার্গ প্রদান করে। **মহর্ষি কণাদ**-এর কথায়, **'যার মধ্যদিয়ে বিভিন্ন পদার্থের প্রবেশ করা বা বেরিয়ে যাওয়া হয়, তাকে আকাশ বলে।'**

আকাশে বিদ্যমান প্রাণ রশ্মিগুলো অত্যন্ত শিথিল অবস্থায় চক্রীয় গতিতে ঘুরতে থাকে। এদের পারস্পরিক বন্ধন অতি কম হয়। এই কারণে আকাশ তত্ত্বে বিভিন্ন কণা বা বিকিরণ স্বাধীন এবং নিরাপদ রূপে গতিবিধি করে থাকে। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অধীনে যখন 'ওম্', 'ভূঃ', 'ভুবঃ', 'স্বঃ' ছাড়াও অন্যান্য দৈবী ছন্দ রশ্মি এবং সূত্রাত্মা বায়ু সহ প্রাণ, অপান আদি প্রাণ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে কিছু রশ্মির সংঘাতে এক সূক্ষ্ম ও প্রায় একরসবৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়। এই পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে প্রাণ, অপান এবং উদানের এক সহস্রবার আবৃত্তি হয়ে গিয়েছিল। তখন দৈবী অনুষ্টুপ্ এবং য়াজুষী (বৃহতী, পঙক্তি ও ত্রিষ্টুপ্) রশ্মিও উৎপন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই চারটি ছন্দ রশ্মি পরস্পর এমনভাবে মিশ্রিত হয় যে তারা দৈবী অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির সমান প্রভাব দেখায়। বিভিন্ন প্রাণ, অপান আদি রশ্মিগুলো, বিভিন্ন দৈবী ছন্দ রশ্মির সাথে মিশ্রিত হয়ে এমন দৈবী অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি তৈরি করে, যা সাধারণত নিষ্কম্প হয়। এই রশ্মিগুলো নিজ স্থানেই

স্পন্দিত হতে থাকে, মনস্তত্ত্বে সর্বত্র চলাচল করে না।

আকাশ তত্ত্বের উপাদান প্রাণ ও মরুৎ রশ্মিগুলো শিথিল অবস্থায় পারস্পরিক সংঘর্ষের রূপে বিদ্যমান থাকে। এই সংঘর্ষে বিদ্যমান সেই রশ্মিগুলো চক্রাকারে ঘুরতেও থাকে, অর্থাৎ তাদের রেখীয় গতি থাকে না, তবে ঘূর্ণন গতি অতি ধীর বেগে হতে থাকে। এই রশ্মিগুলো আকাশ রশ্মি রূপে পরিচিত। এই রশ্মিগুলো এই অবস্থায় এতটাই শিথিল থাকে যে বিভিন্ন বড় ছন্দ রশ্মি, কণা বা তরঙ্গাণু সহজেই এদের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে। চলাচল করার সময় কণা, তরঙ্গাণু বা রশ্মি যখন আকাশ তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন তারা ঘূর্ণনরত পূর্বোক্ত শিথিল আকাশ রশ্মিগুলোর (প্রাণ ও মরুৎ) মধ্যে দিয়ে সহজেই পিছলে যেতে যেতে গতি করে। তবুও এই শিথিল রশ্মিগুলো সবসময় সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকে। এই কারণেই যখন আকাশ তত্ত্ব কোনো বলের দ্বারা সংকুচিত বা বিকৃত হয়, তখন সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি দ্বারা আকাশ রশ্মির ঘূর্ণন গতি প্রভাবিত হওয়ার কারণেই তা হয়। এই তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত প্রকাশযুক্ত, সবচেয়ে হালকা অর্থাৎ নগণ্য দ্রব্যমান এবং বিদ্যুৎ বল বিশিষ্ট হয়।

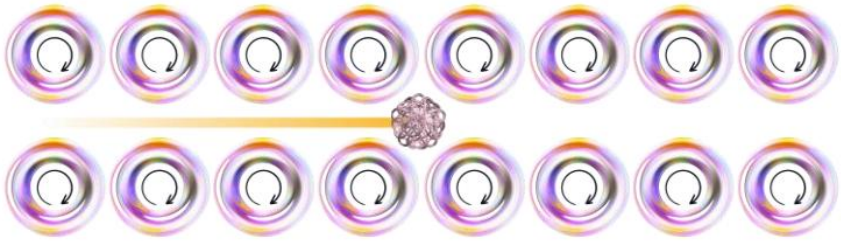

আকাশে তরঙ্গাণুর গমন

এই ভাবে আকাশ বিভিন্ন একক দিয়ে তৈরি জালের মতো হয়। এই এককগুলো পরস্পর সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি দিয়ে বাঁধা থাকে। এই এককগুলো নিরন্তর নিজেদের অক্ষে ঘুরতে থাকে। এদের পারস্পরিক বন্ধন অতি শিথিল হয়, যার কারণে এর মধ্যে দিয়ে কোনো তরঙ্গ অথবা কণা সহজেই চলাচল করতে পারে। আকাশ এই তরঙ্গ অথবা কণাগুলোকে চলাচল করার জন্য রাস্তার কাজ করে। এর অঙ্গীভূত কিছু রশ্মি কোনো কণা বা তরঙ্গকে ভিত্তি প্রদান করে, আবার অন্য কিছু রশ্মি সেই তরঙ্গ ও কণাগুলোকে এমনভাবে ঘর্ষণ প্রদান করে, যেমন রাস্তায় চলার সময় রাস্তা ঘর্ষণ বল প্রদান করে। ঠিক যেমন রাস্তার ঘর্ষণ বলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে উৎপন্ন বল গাড়ির চাকাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বল প্রদান করে, তেমনই কিছু রশ্মি কোনো কণা ও তরঙ্গকে আকাশে গমন করার সময় প্রতিক্রিয়া বল প্রদান করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে কোনো কণা ও তরঙ্গ মুক্ত রূপে আকাশে গমন করে। কণা ও তরঙ্গ গতি করার সময় আকাশের কিছু রশ্মি, আকাশের

এককগুলোকে কিছুটা বিচলিত করে পথ তৈরির কাজ করে।

পথের সাথে চাকার ঘর্ষণ আকাশের সাথে কোনো কণার এককের ঘর্ষণ

আকাশ তত্ত্ব প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি এবং সূক্ষ্ম ছন্দ রশ্মি দিয়ে তৈরি হয়। যেকোনো প্রকার আকর্ষণ-বিকর্ষণ বলের সময় আকাশের সংকুচিত বা প্রসারিত হওয়া এই কারণেই সম্ভব হয়, কারণ আকাশ হল এই রশ্মিগুলো দিয়ে তৈরি।

আকাশ তত্ত্বও সূক্ষ্ম প্রাণ এবং মরুৎ রশ্মির মিশ্ররূপ হয়। এতে ত্রিষ্টুপ্ এবং বৃহতী ছন্দ রশ্মিও প্রধানভাবে বিদ্যমান থাকে, আবার বিভিন্ন কণার মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির প্রধানতা থাকে। আকাশ তত্ত্বের রশ্মি বিভিন্ন কণার সংযোগ-বিয়োগে অতি সূক্ষ্ম স্তরে বিভিন্ন কণাকে স্পর্শ বা সিঞ্চিত করতে থাকে, কিন্তু তাদের নিজস্ব আকর্ষণাদি বল নগণ্যর মতো হয়।

8.3 দিকসমূহের স্বরূপ

আপনি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ আদি দশ দিক সম্পর্কে জানেন, কিন্তু আপনি কি কখনো ভাবতে পারেন যে দিক-ও হল আকাশের মতো এক প্রকারের পদার্থ। দিক্-তত্ত্ব (দিশা) আকাশের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। দিক্-তত্ত্ব আকাশ তত্ত্বের সেই অংশ, যা কোনো কণা বা লোক আদি পদার্থকে সব দিক থেকে ঘিরে রাখে তথা সেই পদার্থের ঘূর্ণন, সংযোজন আদি ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। দিক্ তত্ত্বও আকাশ মহাভূতের মতো রশ্মি রূপ হয়। কাল তত্ত্ব হল এদের অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। এই তিনটি পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক এই হল যে, এই তিনটি মহাভূতকে প্রেরিত ও নিয়ন্ত্রিত তো করে, কিন্তু কোনো পদার্থের অংশ হয় না আজ সারা ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের নির্মাণ হচ্ছে এবং এর জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে। এই ক্রিয়াগুলোতে এই তিনটি পদার্থ প্রত্যক্ষভাবে অংশ না নিয়ে পরোক্ষভাবে প্রেরণা দেওয়ার কাজ করে। বিভিন্ন বাক্ অর্থাৎ ছন্দ রশ্মিগুলোই দিক্ তত্ত্বের রূপ ধারণ করে। সংক্ষেপে দিক্ তত্ত্বের স্বরূপ নিম্নরূপ —

1. দিক্ তত্ত্বে অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির প্রধান্য থাকে।

2. দিক্ হল দশটি — চার দিক্, চার উপ-দিক্ (দুই দিকের মধ্যবর্তী) এবং ঊর্ধ্ব (উপর) ও ধ্রুব (নিচে) দিক্। সকল দিকের পৃথক-পৃথক ভূমিকা আছে।
3. ছন্দ বা প্রাণ রূপ দিক্ তত্ত্ব বিভিন্ন কণা, তরঙ্গ বা লোকসমূহকে পরিধি হিসেবে ঢেকে রাখে।
4. এই তত্ত্ব পদার্থসমূহকে ঘূর্ণন গতি প্রদান করতে সহায়তা করে।
5. এই তত্ত্বে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, সূতাত্মা বায়ু ও ধনঞ্জয় রশ্মি বিদ্যমান থাকে। এদের মধ্যে সূত্রাত্মা বায়ু প্রধানত পরিধি নির্মাণ করে।
6. যেকোনো পদার্থের উপরিভাগে বিদ্যমান ছন্দ রশ্মিগুলোই দিক্ তত্ত্বের রূপ হয়।
7. দিক্ রূপ রশ্মিগুলো বিভিন্ন কণা বা লোককে অন্য কণা বা লোক থেকে নির্গত রশ্মিগুলোকে হরণ করে তাদের পরস্পর বেঁধে রাখতে সাহায্য করে।

স্মরণীয় তথ্য

1. আকাশ হল একটি বাস্তবিক পদার্থ, যা সূক্ষ্ম বৈদিক ছন্দ রশ্মির বিশেষ সংযোগে উৎপন্ন হয়।
2. প্রাণ, অপান এবং উদান রশ্মি যখন এক হাজার বার আবৃত্ত হতে থাকে, তখন বিভিন্ন প্রাণের সংগমে অন্য ছন্দ রশ্মি আকাশ তত্ত্ব রূপে উৎপন্ন হয়।
3. আকাশ তত্ত্ব এতটাই সূক্ষ্ম হয় যে এর স্বরূপ অভাব বা শূন্যতার মতো মনে হয়।
4. আকাশে বিদ্যমান প্রাণ রশ্মিগুলো অত্যন্ত শিথিল অবস্থায় চক্রাকারে ভ্রমণ করে। এদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন অত্যন্ত কম থাকে।
5. সূতাত্মা বায়ু রশ্মি দ্বারা আকাশ রশ্মিগুলোর ঘূর্ণন গতি প্রভাবিত হওয়ার কারণে আকাশ তত্ত্ব সংকুচিত বা বিকৃত হয়।
6. এই তত্ত্ব সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত প্রকাশযুক্ত, সবচেয়ে হালকা অর্থাৎ নগণ্য দ্রব্যমান বিশিষ্ট হয়। এতে 'ওম্', ত্রিষ্টুপ্, মরুৎ, সূত্রাত্মা বায়ু ও ছন্দ আদি রশ্মির প্রাচুর্য থাকে।
7. আকাশ বিভিন্ন একক দিয়ে তৈরি জালের মতো হয়। এই এককগুলো পরস্পর সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি দিয়ে বাঁধা থাকে। এই এককগুলো নিরন্তর নিজের অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে।
8. এই এককগুলোর পারস্পরিক বন্ধন অতি শিথিল হয়, যার কারণে এর মধ্যদিয়ে কোনো তরঙ্গ অথবা কণা সহজে গমন করতে পারে। এই ইউনিটগুলো অন্যান্য ছন্দ রশ্মির প্রতি

অন্যোন্যক্রিয়া করে ঘনীভূত, বিকৃত হতে পারে এবং বাঁকা বা প্রসারিত হতে পারে।

9. আকাশ তরঙ্গ অথবা কণাগুলোর গমন করার জন্য রাস্তার কাজ করে।
10. দিক্ তত্ত্ব হল আকাশ তত্ত্বের সেই অংশ, যা কোনো কণা বা লোক আদি পদার্থকে সব দিক থেকে আবৃত করে রাখে তথা সেই পদার্থের ঘূর্ণন, সংযোজন আদি ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।
11. দিক্ তত্ত্বে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, সূত্রাত্মা বায়ু ও ধনঞ্জয় রশ্মি বিদ্যমান থাকে। এদের মধ্যেও সূত্রাত্মা বায়ু প্রধানত পরিধি তৈরি করে।
12. দিক্ রূপ রশ্মি বিভিন্ন কণা বা লোককে অন্য কণা বা লোক থেকে নির্গত রশ্মি হরণ করে তাদের পরস্পর বাঁধতে সাহায্য করে।

অনুশীলনী

1. আকাশ কত প্রকারের হয় এবং বর্তমান বিজ্ঞানে আকাশের ধারণাকে বোঝাও।
2. বৈদিক ভৌতিকীতে আকাশ নামক পদার্থ কোন-কোন রশ্মি দিয়ে তৈরি হয় ? তার উৎপত্তি প্রক্রিয়াকে বোঝাও।
3. আকাশ নামক পদার্থের মধ্যদিয়ে সূক্ষ্ম কণা, তরঙ্গ এবং অন্যান্য সব পদার্থ কীভাবে অবাধে গমন করে ?
4. আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটিকে আধুনিক ভৌতিকী এবং বৈদিক ভৌতিকী দ্বারা বোঝাও।
5. দিক্ কাকে বলে ? এর গুণগুলো উল্লেখ করো ?

ক্রিয়াকলাপ

গুরুত্বাকর্ষণ তরঙ্গ এবং কোনো অত্যধিক দ্রব্যমানযুক্ত লোক দ্বারা প্রকাশের কিরণ বেঁকে যাওয়াকে বৈদিক রশ্মি তত্ত্বের দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করুন।

9 অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকারের বল

আমরা জানি যে সৃষ্টির সঞ্চালনের জন্য বলই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ। বল হল পদার্থের সেই মূলভূত গুণ, যার মাধ্যমে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; এর মাধ্যমেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হচ্ছে এবং সময় এলে এর মাধ্যমেই ধ্বংস হবে। সৃষ্টির সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম তথা বিশাল থেকে বিশাল পদার্থের নিয়ন্ত্রণ বল নামক গুণের মাধ্যমেই হয়।

9.1 বলের স্বরূপ

বল গুণের বিষয়ে **মহর্ষি য়াস্ক** তাঁর **'নিরুক্ত** (৩.৯)' গ্রন্থে বলেছেন —

'বলম্ কস্মাত্ বলম্ ভরম্ ভবতি বিভর্ত্তেঃ'

অর্থাৎ, যা কোনো পদার্থের ধারণ ও পোষণ করে, সেই গুণকে বল বলা হয়। আমরা সবাই জানি যে বলের মাধ্যমেই সৃষ্টির সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে সূক্ষ্মতম কণা পর্যন্ত একে অপরকে ধারণ করে আছে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, বলের মাধ্যমে পদার্থের পোষণ কীভাবে হয়? এখানে 'পোষণ' শব্দের অর্থ হল — সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব এই বল নামক গুণের উপর নির্ভর করে।

আসুন, এটিকে এইভাবে বুঝি, প্রত্যেক স্থূল পদার্থ সূক্ষ্ম কণার সংযোগে উৎপন্ন হয় এবং সেই সংযোগের উপরই সেই পদার্থের জীবন নির্ভর করে। যদি সেই পদার্থের উপাদানস্বরূপ সূক্ষ্ম কণাগুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল বল হঠাৎ করে সমাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে এবং তা সূক্ষ্ম কণাতে ভেঙে যাবে। এখন কি সূক্ষ্ম কণাগুলোর অস্তিত্বও বলের উপর নির্ভরশীল? হ্যাঁ, তবে তা কীভাবে? একে এইভাবে বুঝুন যে প্রতিটি কণা বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ ও প্রাণ রশ্মি এবং সেই রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্ব, মহৎ তত্ত্ব ও মূলরূপ থেকে প্রকৃতিরূপী মূল পদার্থ দিয়ে তৈরি। এই কারণে সমস্ত মূল কণা এবং তরঙ্গাণুও সূক্ষ্ম রশ্মিগুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের কারণেই অস্তিত্বে আসে, এই কারণে তাদের জীবনও বলের উপরই নির্ভর করে। মনে রাখবেন যে বর্তমান ভৌতিকীতে বলের কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা নেই, অন্যদিকে বৈদিক বিজ্ঞানে 'বল' শব্দটির জ্ঞান থেকেই বল নামক গুণের সমগ্র স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়।

9.2 বলের প্রকার

আধুনিক বিজ্ঞান মূল রূপে চারটি বলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। সেটি এই চারটি বলের জন্য চার প্রকারের মধ্যস্থ কণা (মিডিয়েটর পার্টিকেলস) –কে উত্তরদায়ী বলে। এই চারটি বল হল —

1. গুরুত্বাকর্ষণ বল – গ্র্যাভিটন
2. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল – ফোটন
3. নাভিকীয় প্রবল বল (স্ট্রং ফোর্স) – মেসন
4. নাভিকীয় দুর্বল বল (উইক ফোর্স) – W^+, W^-, Z^0

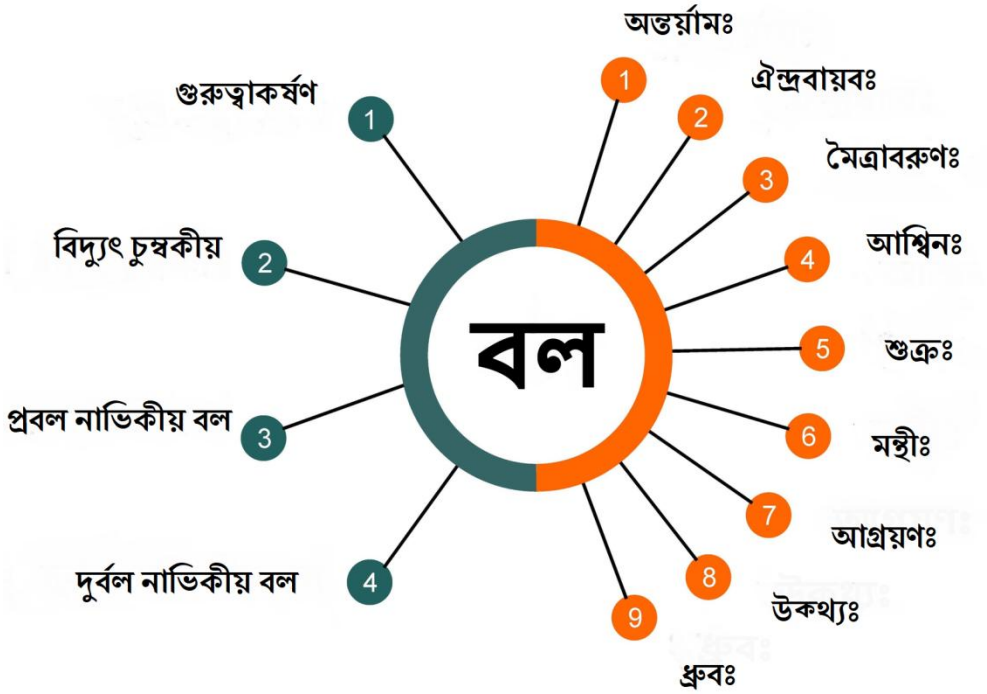

বলের প্রকারভেদ

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল বিদ্যুৎ আবেশিত পদার্থের মধ্যে কাজ করে, যার কারণে বিদ্যুৎ আবেশিত কণাগুলো একে অপরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে। এই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় তথা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে তৈরি, স্থাপন এবং সঞ্চালন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বলের অভাবে সৃষ্টি মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এই বলের কারণেই বিভিন্ন অণু আদি পদার্থ ভারসাম্যপূর্ণ এবং গতিশীল থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের বল

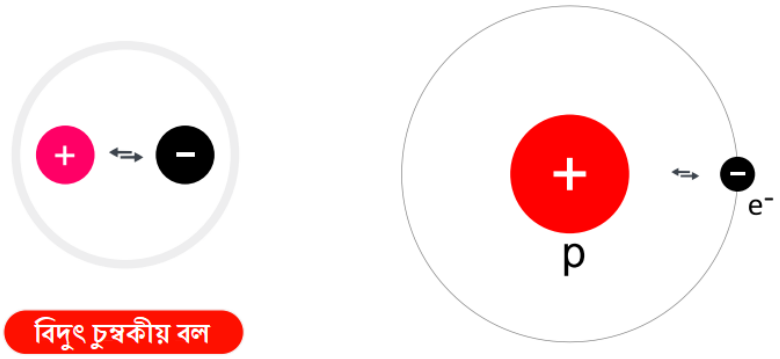

দ্বিতীয়টি হল গুরুত্বাকর্ষণ বল, যা দুটি দ্রব্যমান যুক্ত বস্তুর মধ্যে কাজ করে। এই বলের কারণেই ব্রহ্মাণ্ডে লোক-লোকান্তর একে অপরের সাথে আবদ্ধ আছে। আমাদের সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্বের জন্য এই বলের বিশেষ ভূমিকা আছে।

বাকি দুটি বল নাভিকের অভ্যন্তরে কাজ করে, যার কারণে নাভিকের অস্তিত্ব বজায় থাকে, কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান এখনও তাদের কার্যপ্রণালী জানতে পারেনি। কীভাবে মধ্যস্থ কণা তৈরি হয়? কোন বল তাদের বিনিময়ের জন্য দায়ী হয়? এই সবই আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে অজানা। অন্যদিকে বৈদিক বিজ্ঞান 9 প্রকারের বলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে, সেগুলো হল —

1. অন্তর্যামঃ — এই বল বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গের মধ্যবর্তী অংশে ক্রমাগত সঞ্চারিত সূক্ষ্ম রশ্মির রূপে থাকে। বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত মূল কণা এবং তরঙ্গাণুর মধ্যে এই বল সূক্ষ্ম রশ্মির রূপে বিদ্যমান থাকে, যা সেই কণাগুলোকে সক্রিয় করতে এবং তাদের এই রূপে বজায় থাকতে প্রেরিত করে।

2. ঐন্দ্রবায়বঃ — এটি বল, তেজ এবং গতি উভয়ে র উৎপত্তি, সক্রিয়তা এবং তীব্রতার কারণ হিসাবে দুটি আবেশিত কণার মধ্যে কাজ করে। আধুনিক বিজ্ঞানের চারটি মূল বলের মধ্যে গুরুত্ব

বিভিন্ন প্রকারের বল

বল ব্যতীত বাকি তিনটি বল এই একটি বলের অধীনে আসে।

3. মৈত্রাবরুণঃ — প্রাণ-অপান এবং প্রাণ-উদান যুগ্মের মধ্যে সংযুক্ত প্রাণগুলোকে সংযুক্ত করার জন্য এই বল উত্তরদায়ী হয়। এই বল অত্যন্ত সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে বিভিন্ন প্রকারের বলের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এটি অতি দ্রুতগামী পদার্থের বলের কারণও হয়।

প্রাণ তথা উদানের মধ্যে এবং প্রাণ ও অপানের মধ্যে মৈত্রাবরুণঃ বল কাজ করে। এই ধরণের বল সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত আছে এবং এই কারণেই সম্পূর্ণ সৃষ্টি গঠিত ও সঞ্চালিত হয়। এই বল মন তথা সূত্রাত্মা বায়ুর অতি সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতম রশ্মির সংযোগে উৎপন্ন হয়। এই রশ্মিগুলো থেকে মধ্যস্থ কণা (মিডিয়েটর পার্টিকেলস)-এর স্থানে ব্যান প্রাণ রশ্মির উৎপত্তি হয়, যা প্রাণ ও অপান অথবা প্রাণ ও উদানকে পরস্পর বেঁধে রাখার জন্য তাদের মধ্যে ক্রমাগত সঞ্চারিত হতে থাকে। সৃষ্টির উৎপত্তি থেকে প্রলয় পর্যন্ত সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে সর্বত্র এই বল কাজ করতে থাকে।

4. আশ্বিনঃ — আশ্বিন শব্দের অর্থ হল ব্যাপক। এই বল বিভিন্ন কণা এবং তরঙ্গের মধ্যে কার্যকর বল তথা বিভিন্ন সূক্ষ্ম কণার মধ্যে অতি নিকট স্তরে একটি সূক্ষ্ম বিকর্ষণ বল হিসাবেও থাকে। এর কারণে দুটি সূক্ষ্ম কণার মধ্যে একটি সীমিত অবকাশ অবশ্যই থাকে, যার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যেকোনো সূক্ষ্ম বা স্থূল পদার্থ পরস্পর সম্পূর্ণভাবে স্পর্শ করতে পারে না।

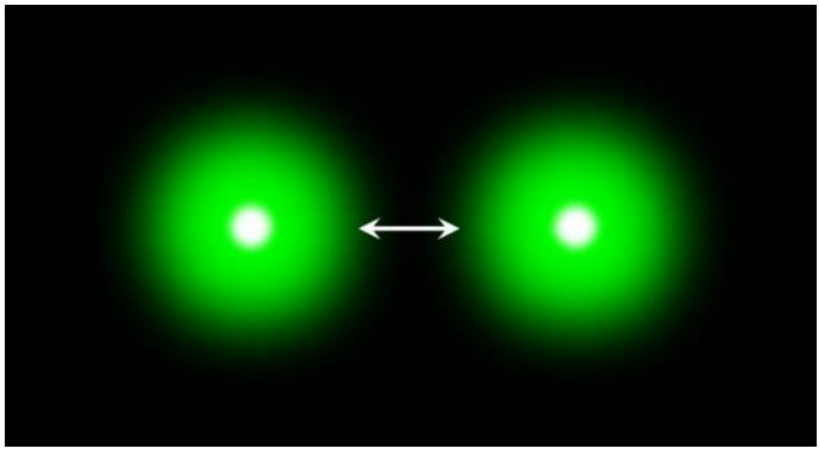

দুটি কণার মধ্যে বিকর্ষণ বল

এর সাথে গুরুত্বাকর্ষণ বলও আশ্বিন বল নামে পরিচিত। এই আশ্বিন বলের কারণেই এই ব্রহ্মাণ্ড স্থির আছে, অর্থাৎ দুটি ব্যাপক আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ বলের কারণে।

5. শুক্রঃ — এই বলের রশ্মিগুলো তীব্র ভেদন ক্ষমতাযুক্ত হয় অর্থাৎ অতি উচ্চ ঊর্জা

সম্পন্ন পদার্থে এই বল বিদ্যমান থাকে, যা বিভিন্ন পদার্থকে ছিন্নভিন্ন করে তাদের শুদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, সূর্যের কেন্দ্রে এই বল বিদ্যমান থাকে।

6. মন্থীঃ — এই বল পূর্বোক্ত শুক্র বলের আগে উৎপন্ন হয়ে পদার্থের সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে তাতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

7. আগ্রহণঃ — এই বল ব্রহ্মাণ্ডে সবচেয়ে বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্যমান থাকে। ঊর্জার শোষণ এবং নির্গমনেও এই বলই ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, ইলেকট্রন এই বলের মাধ্যমেই তরঙ্গ কণাগুলোকে নির্গত ও শোষণ করতে পারে।

8. উকথ্যঃ — এই বল প্রতিটি ছন্দ রশ্মিকে, যা স্বয়ং বল স্বরূপ হয়, তাদের সংঘাত রূপ প্রদান করতে অর্থাৎ তাদের রশ্মি রূপ প্রদান করতে সহায়ক হয়। এটি খুব সূক্ষ্ম বল হয়।

9. ধ্রুবঃ — এই বলের রশ্মিগুলো দূর পর্যন্ত গমন না করে নিকটস্থ বল রশ্মিগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করার জন্য অতি মন্থর গতিতে এবং অতি সংকুচিত ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করে।

9.3 বল সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য

এই সৃষ্টিতে বিভিন্ন কণা ও তরঙ্গ আদি, যা কিছু পদার্থ বিদ্যমান আছে, সেগুলো পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত ক্রিয়া করে, তার পেছনে এই 9 প্রকারের বলের ভূমিকা আছে, যা সৃষ্টির প্রারম্ভিক কালেই উৎপন্ন হয়ে যায়। এই বলগুলোই সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের পথ দেখায় এবং তাদের পরস্পর সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়ে স্থূলতর পদার্থ নির্মাণের পথ প্রশস্ত করে। এই 9 প্রকারের বল যেকোনো সংযোগ-বিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রধানতম ও নিকটতম অংশ হয়। বল রশ্মি এবং অন্যান্য কণা ও তরঙ্গ মূলত একই পদার্থের কার্যরূপ হয়। যখনই সৃষ্টি-উৎপত্তি শুরু হয়, সেই সময় সর্বপ্রথম বলেরই উৎপত্তি হয়। এরপরই সেই বল থেকে বিভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া, গতি আদি উৎপন্ন হতে শুরু করে। তারপর এদের কারণেই বিভিন্ন সূক্ষ্ম পদার্থকে ধরে রাখা, নিয়ন্ত্রণ করা, গতিহীনকে গতি ও গতিশীলকে স্থৈর্য প্রদান করা পৃথক-পৃথক স্তরে পৃথক-পৃথক প্রকারের বলের দ্বারাই সম্ভব হয়ে ওঠে।

এই ব্রহ্মাণ্ডে দুটি পদার্থের মধ্যে যে বল কাজ করে, তা মূলত প্রাণেরই বল হয়। এই প্রাণগুলোর ভেদ বা তাদের মধ্যে ব্যবস্থা, ক্রম আদির ভেদের কারণে বলও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের হয়। ধনঞ্জয় বা সূত্রাত্মা বায়ু রূপ রশ্মি তথা বিভিন্ন ফিল্ড পার্টিকলস-এর মধ্যে যে বল কাজ করে, তা গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি এবং প্রাণ রশ্মির মিলনে উৎপন্ন হয়। প্রাণ এবং অপান অথবা প্রাণ এবং

উদান-এর মধ্যে কার্যকর বল মন এবং সূত্রাত্মা বায়ু অথবা দৈবী ত্রিষ্টুপ্ এবং দৈবী উষ্ণীক্ ছন্দ রশ্মির মিলনে উৎপন্ন হয়। কোনো তরঙ্গাণু এবং ইলেকট্রন আদির মধ্যে কার্যকর বল পঙক্তি, বৃহতী ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মিকে আবৃত করে থাকা সূত্রাত্মা বায়ুর মিলনে উৎপন্ন হয়। গুরুত্ব বল, যা দুটি অপ্রকাশিত, দুটি প্রকাশিত বা একটি অপ্রকাশিত কণা ও একটি প্রকাশিত কণার মধ্যে কাজ করে, সেটিও আশ্বিন বলের অধীনেই আসে। ইলেকট্রন আদি ও তরঙ্গাণুর মধ্যে কার্যকর বল গুরুত্ব বলের অধীনেও মানা যেতে পারে, একই সাথে বৈদ্যুত বলও। এইভাবে এটিকে উভয় কোটিতেই মানা সম্ভব।

9.4 একীভূত (ইউনিফাইড) বল

এই সৃষ্টিতে সব প্রকারের ঊর্জা তথা দ্রব্যের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির দ্বারা হয়। এই প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির উৎপত্তি মনস্তত্ত্ব দ্বারা হয়। বস্তুতঃ মন এবং বাক্ তত্ত্বের মিলনকেই সক্রিয় মনস্তত্ত্ব বলা হয়। এই সক্রিয় মনস্তত্ত্বই এই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম প্রত্যেক কণা বা বিকিরণ এবং এদের থেকেও সূক্ষ্ম প্রাণাদি রশ্মির উপাদান কারণ এবং প্রেরক হয়। প্রলয়ের সময় সম্পূর্ণ দ্রব্য, ঊর্জা এবং আকাশ সক্রিয় মনস্তত্ত্বে বিলীন হয়ে অবশেষে প্রকৃতিরূপী অন্তিম উপাদানে লীন হয়ে যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে মনস্তত্ত্ব সর্বত্র একরসভাবে ভরা থাকে, ব্যতিক্রম ব্যতীত অর্থাৎ রশ্মি আদির ভিতরে বিদ্যমান মনস্তত্ত্ব ব্যতীত কোথাও ঘন বা কোথাও বিরল রূপে থাকে না। ঘন বা বিরল তো তার ভিতরে বাক্ তত্ত্ব হতে থাকে এবং এই কারণে এই বাক্ তত্ত্বের মনস্তত্ত্বের সাথে মিলন অবশ্যই পরিবর্তনীয় হওয়ায় ঘন-বিরল হতে থাকে। এই কারণে সক্রিয় মনস্তত্ত্ব ঘন-বিরল হতে-হতে স্থানে-স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন রচনা এবং ক্রিয়া-বল আদি উৎপন্ন করতে থাকে। যদি এমন না হতো তাহলে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রারম্ভই হতো না। এই সক্রিয় মনস্তত্ত্বের বলই সর্বাধিক সূক্ষ্ম বল হয়। অন্য সব বলও এই এক বল থেকেই ক্রমশ উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক বলের ভিতরে এই বলই সর্বদা সূক্ষ্ম রূপে বিদ্যমান থাকে এবং এই মাধ্যমেই সমস্ত বল প্রেরিত ও সঞ্চালিত হয়। এই মূল বলের পিছনেও চেতন তত্ত্বের বল কাজ করে, যা নিত্যই মনস্তত্ত্বকে স্পন্দিত করে বাক্ তত্ত্বকে উৎপন্ন করতে থাকে। এরপর বাক্ তত্ত্বের সাথে যুক্ত মনস্তত্ত্বকেই সক্রিয় মনস্তত্ত্বের রূপে উৎপন্ন করে এই মূল বলকে উৎপন্ন করে। চেতন তত্ত্ব পূর্ববর্ণিত কাল তত্ত্বের মাধ্যমেই মনস্তত্ত্ব বা বাক্ তত্ত্বের বল উৎপন্ন করে। বর্তমান বিজ্ঞান একটি ইউনিফায়েড বলের কল্পনা করছে, বস্তুতঃ এই বলই ইউনিফায়েড বল হয়, কিন্তু একে কোনো ভৌতিক টেকনিক দিয়ে জানা সম্ভব নয়। পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আমরা গুরুত্বাকর্ষণ বল এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলকে বিস্তারিতভাবে জানবো।

বিভিন্ন প্রকারের বল

স্মরণীয় তথ্য

1. সৃষ্টির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং বিশালাতিবিশাল পদার্থের নিয়ন্ত্রণ সেই পদার্থগুলোর বল নামক গুণের মাধ্যমেই হয়।

2. যে গুণ কোনো পদার্থকে ধারণ ও পোষণ করে, তা বল নামে পরিচিত।

3. যদি কোনো পদার্থের উপাদানস্বরূপ সূক্ষ্ম কণাগুলোর মধ্যে কার্যকর বল হঠাৎ সমাপ্ত হয়ে যায়, তবে সেই পদার্থের অস্তিত্ব সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে গিয়ে তা সূক্ষ্ম কণাতে ভেঙে যাবে।

4. আধুনিক বিজ্ঞান মূলতঃ চারটি বলের (গুরুত্বাকর্ষণ, বিদ্যুৎ চুম্বকীয়, নাভিকীয় প্রবল তথা নাভিকীয় দুর্বল বল) অস্তিত্ব স্বীকার করে।

5. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল বিদ্যুৎ আবেশিত পদার্থের মধ্যে কাজ করে, যার কারণে বিদ্যুৎ আবেশিত কণা একে অপরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে।

6. গুরুত্বাকর্ষণ বল দুটি দ্রব্যমান যুক্ত বস্তুর মধ্যে কাজ করে। এই বলের কারণেই ব্রহ্মাণ্ডে লোক-লোকান্তর একে অপরের সাথে বাঁধা থাকে।

7. বৈদিক বিজ্ঞান 9 প্রকারের বলের (অন্তর্য়ামঃ, ঐন্দ্রবায়বঃ, মৈত্রাবরুণঃ, আশ্বিনঃ, শুক্রঃ, মন্থীঃ, আগ্রায়ণঃ, উকথ্যঃ এবং ধ্রুবঃ) অস্তিত্ব স্বীকার করে।

8. বল রশ্মি এবং অন্যান্য কণা ও তরঙ্গ মূলতঃ একই পদার্থের কার্যরূপ হয়।

9. সৃষ্টি-উৎপত্তির শুরুতে সর্বপ্রথম বলেরই উৎপত্তি হয়।

10. প্রাণের ভেদ বা তাদের মধ্যে ব্যবস্থা, ক্রমাদির ভেদের কারণে বলও ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের হয়।

11. প্রলয়ের সময় সম্পূর্ণ দ্রব্য, ঊর্জা এবং আকাশ সক্রিয় মনস্তত্ত্বে বিলীন হয়ে অবশেষে প্রকৃতি রূপী অন্তিম উপাদানে লীন হয়ে যায়।

12. সৃষ্টিতে সক্রিয় মনস্তত্ত্বের বলই সর্বাধিক সূক্ষ্ম বল হয়। অন্যান্য সব বল এই একটি বল থেকেই ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়।

অনুশীলনী

1. বল কাকে বলে ? ব্যাখ্যা করুন।

2. আধুনিক ভৌতিকীতে বল কত প্রকারের এবং তাদের নাম কী কী ?

3. বৈদিক ভৌতিকীতে বল কত প্রকারের হয় ? উদাহরণসহ সবগুলো বোঝান।

4. বৈদিক ভৌতিকীতে বলের শ্রেণীবিভাগের প্রধান ভিত্তি কী ?

5. বৈদিক ভৌতিকীতে মূল বল কাকে বলবেন এবং কেন ?

6. আধুনিক ভৌতিকীর চারটি মূল বলকে বৈদিক ভৌতিকীর কোন বলগুলোর অধীনে অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে ?

ক্রিয়াকলাপ

এমন একটি বল কল্পনা করার চেষ্টা করুন, যা বৈদিক ভৌতিকীতে প্রদত্ত বলের সংজ্ঞার অধীনে আসে না।

* * * * *

10 অধ্যায়

গুরুত্ব বল

10.1 ভূমিকা

আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখি যে কোনো বস্তু নিচে পড়ার সময় পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয়, যার কারণ পৃথিবীর গুরুত্ববাকর্ষণ হয়। আমাদের শেখানো হয়েছে যে নিউটন গুরুত্বাকর্ষণের নিয়ম বিশ্বকে দিয়েছেন এবং এটিকে এমনভাবে দেখানো হয় যেন তার আগে কেউ গুরুত্বাকর্ষণ সম্পর্কে জানতো না, কিন্তু নিউটনের হাজার-হাজার বছর আগে **মহর্ষি কণাদ** তাঁর গ্রন্থ **বৈশেষিক দর্শনে** লিখেছেন —

সংয়োগাভাবে গুরুত্বাৎপতনম্ ॥ (5.1.7)

অর্থাৎ, সংযোগ না থাকলে বস্তু গুরুত্ব বলের কারণে নিচের দিকে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি আপেল হাতে ধরে আছি অর্থাৎ যতক্ষণ আপেলটি হাতের সাথে সংযোগ আছে, ততক্ষণ সেটি পৃথিবীতে পড়বে না এবং যেই আমরা সেটি ছেড়ে দেব, সেটি নিচে পড়তে শুরু করবে। একেই সংযোগের অভাবে বস্তুর গুরুত্বের কারণে নিচে পড়া বলেছেন। আবার বলেছেন

সংস্কারাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্ ॥ (5.1.18)

অর্থাৎ, সংস্কারের অভাবে কোনো বস্তু গুরুত্ব বলের কারণে নিচে পড়ে যায়। যেমন, ধনুষ থেকে ছাড়া বাণ গতিশক্তি শেষ হলে নিচে পড়ে যায়।

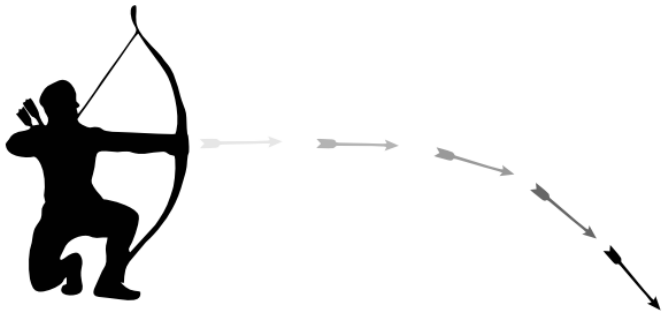

সংস্কারের অভাবে বাণের পড়ে যাওয়া

এখানে বস্তুর বেগ হল তার সংস্কার। একইভাবে আকাশে উড়ন্ত পাখি গুরুত্ব বল প্রয়োগের

কারণে নিচে পড়ে না, কিন্তু পাখিটিকে যদি কেউ মেরে ফেলে বা সে স্বয়ং উড়া বন্ধ করে দেয়, তবে গুরুত্ব বলের কারণে সঙ্গে-সঙ্গে নিচে পড়ে যাবে।

10.2 গুরুত্বাকর্ষণের সার্বজনীন নিয়ম

নিউটন অনুযায়ী,

'এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি বস্তু অন্য প্রত্যেক বস্তুকে একটি বল দ্বারা আকর্ষণ করে, যার পরিমাণ বস্তু দুটির দ্রব্যমানের গুণফলের সমানুপাতিক তথা তাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়।' (Mathematical Principles of Natural Philosophy, 1687)

গাণিতিক রূপে নিউটনের এই সূত্রটিকে এইভাবে দেখানো হয় —

$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

এখানে m_1 এবং m_2 যেকোনো দুটি বস্তুর দ্রব্যমান এবং r তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব, F তাদের দ্বারা একে অপরের উপর প্রযুক্ত বল হয়। G $(=6.673\times10^{-11}\ Nm^2Kg^{-2})$ একটি ধ্রুবক হয়, যাকে গুরুত্বাকর্ষণ ধ্রুবক বলা হয়। এটি যুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে, এর কোনো ব্যুৎপত্তির প্রক্রিয়া নেই।

এখন এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে, গুরুত্ব বল দ্রব্যমানের সমানুপাতিক তথা তাদের মধ্যকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিকই কেন হয় অর্থাৎ দুটি বস্তুর দ্রব্যমান বেশি হলে বা তাদের মধ্যকার দূরত্ব কম হলে তাদের পারস্পরিক আকর্ষণ বল বেশি কেন হয় ? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে, দুটি বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণের ক্রিয়া-বিজ্ঞান কী ? দ্রব্যমান গুরুত্বাকর্ষণ বলকে কীভাবে উৎপন্ন করে? বর্তমানে উপলব্ধ প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে, এই সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞান নীরব।

আসুন! এখন আমরা এই অমীমাংসিত প্রশ্নগুলোর উত্তর বৈদিক বিজ্ঞানের দ্বারা জানার চেষ্টা করি।

আমরা জানি যে, বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেকোনো বস্তু বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ রশ্মি (স্পন্দন) দিয়ে তৈরি হয়। এই কারণে সেই বস্তু বা কণাগুলো থেকে কিছু রশ্মি, বিশেষ করে বৃহতী ও পঙক্তি ছন্দ রশ্মিগুলোর চারপাশে ক্রমাগত শোষিত ও নির্গত হতে থাকে।

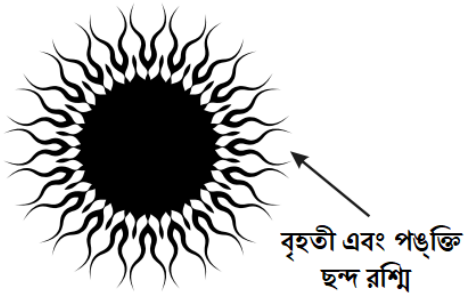

যখন এমন দুটি পিণ্ড পরস্পরের নিকট আসে, তখন তাদের থেকে নির্গত পঙ্‌ক্তি এবং বৃহতী রশ্মির সংযোগে একটি কণা, যাকে বর্তমান বিজ্ঞানের ভাষায় 'গ্র্যাভিটন' বলা যেতে পারে, তার উৎপত্তি হয়। 'গুরুত্বাণু' (গ্র্যাভিটন)-এর উৎপত্তি 'ওম্' রশ্মিযুক্ত মাস ও ঋতু রশ্মির পঙ্‌ক্তি ও বৃহতীকে সূত্রাত্মা বায়ুর সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে হয়। এই গুরুত্বাণু (গ্র্যাভিটন) পরস্পর নিকটবর্তী পিণ্ডগুলো থেকে নির্গত হওয়া অথবা অন্যত্র প্রবাহিত বৃহতী ও পঙ্‌ক্তি ছন্দ রশ্মিগুলোকে শোষণ করতে থাকে এবং এই কারণে তারা সর্বত্র প্রবাহিতও হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াটিই গুরুত্বাকর্ষণ বল সৃষ্টির কারণ।

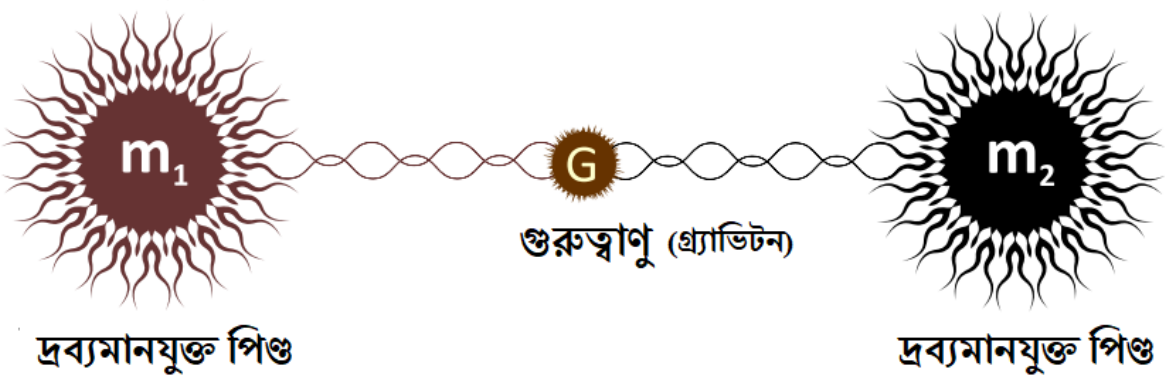

দ্রব্যমানযুক্ত পিণ্ডগুলোর মধ্যে গুরুত্বাণুর উৎপত্তি

কোনো পিণ্ডে যত বেশি দ্রব্যমান থাকবে, সেই পিণ্ড থেকে তত বেশি বৃহতী ও পঙ্‌ক্তি ছন্দ রশ্মি নির্গত হবে এবং এই কারণে সেই পিণ্ডের গুরুত্বাকর্ষণ বলও তত বেশি হবে।

ব্যস্তবর্গ নিয়ম অনুসারে দ্রব্যমান m থেকে নির্গত হওয়া রশ্মিগুলো দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতী হয়। যেহেতু দ্রব্যমান m থেকে রশ্মিগুলো সব দিকে সমানভাবে নির্গত হয়, তখন দ্রব্যমান m থেকে r দূরত্বে রশ্মিগুলোর যে তীব্রতা হবে, $2r$ দূরত্বে তার $\frac{1}{4}$ অংশ থাকবে।

আসুন, আমরা এই চিত্র দ্বারা এটি বোঝার চেষ্টা করি —

গুরুত্ব বল

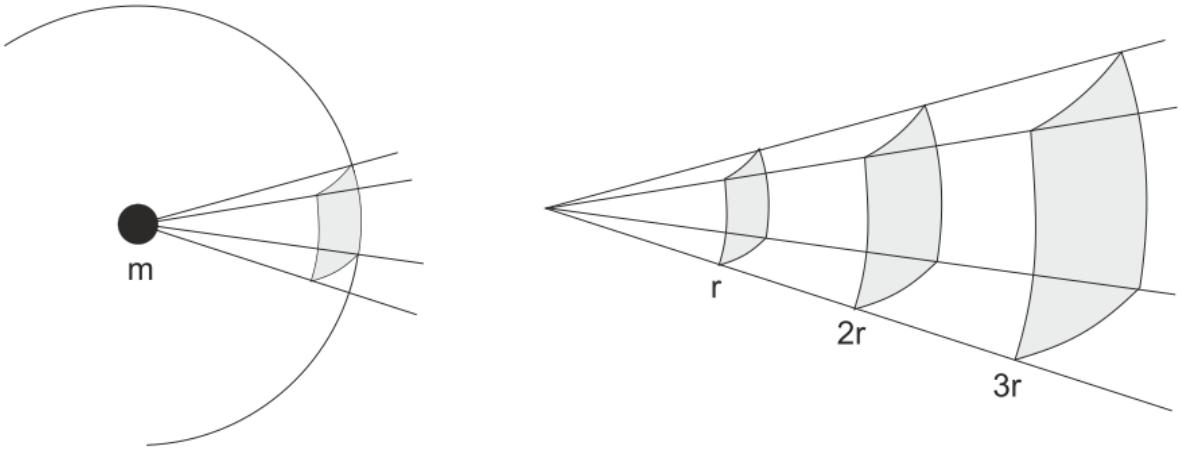

দূরত্বের সাথে গুরুত্বীয় বলের রশ্মিগুলোর দুর্বল হওয়া

আমরা জানি যে গুরুত্বাকর্ষণ বল বর্তমানে পরিচিত চারটি বলের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল, কিন্তু এমন কেন হয়? আসুন এটিও জেনে নিই —

যেমন আমরা উপরে বলেছি যে গুরুত্বাণু কণা (গ্র্যাভিটন) সবদিকে প্রবাহিত হতে থাকে, এই কারণে গুরুত্ব ঊর্জা নির্গত হতে থাকে তথা উভয় বস্তু থেকে বৃহতী ও পঙ্‌ক্তি ছন্দ রশ্মি নির্গত হয়, একই ধরণের রশ্মিগুলোর সংঘর্ষে তাদের মধ্যে বিকর্ষণও ঘটে। পঙ্‌ক্তি এবং বৃহতী ছন্দ রশ্মিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়। এই সমস্ত কারণে গুরুত্ব বল সমস্ত বলের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল, কিন্তু ব্যাপক হয়। গুরুত্বাকর্ষণ বল দুর্বল হওয়ার আরেকটি কারণ অপান প্রাণ-এর প্রকরণেও পাঠযোগ্য। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের ক্ষেত্রে তরঙ্গাণু ধনঞ্জয় আদি রশ্মিকে সামনের দিক থেকেই শোষণ করে তথা স্বয়ং সেই দিকেই প্রবাহিত হয়, এই কারণে এই বল গুরুত্ব বলের মতো নির্গত হয় না, যার ফলে এটি তার চেয়ে শক্তিশালী হয়।

গুরুত্বাকর্ষণ বল এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল উৎপন্নকারী প্রাণ রশ্মিগুলো অসীম দূরত্ব পর্যন্ত চললেও ব্যবধানপ্রাপ্ত হয় না। এই কারণে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিকল্পিত গুরুত্বাণু (গ্র্যাভিটন) এবং প্রকাশাণু (ফোটন) অসীম দূরত্ব পর্যন্ত উৎপন্ন হয়ে বল সঞ্চালনে সক্ষম হয়।

এখানে আরও একটি বিষয় জানা উচিত যে, গুরুত্বাকর্ষণ বলের সাথে কিছু-না-কিছু পরিমাণে বিকর্ষণ বলও বিদ্যমান থাকে। এই বিকর্ষণ বল দুটি বস্তু অথবা কণার মধ্যে অসুর তত্ত্ব-এর কারণে থাকে। আকর্ষণ বলগুলোর পাশাপাশি যদি বিকর্ষণ বল না থাকে, তবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সংকুচিত হয়ে একটি বস্তুতে পরিণত হবে, কিন্তু এমনটি কখনও হয় না এবং হওয়াও সম্ভব নয়।

যদি ব্রহ্মাণ্ডে আকর্ষণ বল না থাকে, কেবল বিকর্ষণ বল থাকে, তাহলেও ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হওয়া তো দূরের কথা, একটি কণা পর্যন্ত তৈরি হতে পারবে না।

10.3 গুরুত্বাণু (গ্র্যাভিটন)

বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা কল্পিত 'গুরুত্বাণু (গ্র্যাভিটন)' 'ওম্' বাণী রশ্মিযুক্ত মাস বা ঋতু রশ্মির দ্বারা পঙ্‌ক্তি ও বৃহতী-ত্রিষ্টুপ ও সূত্রাত্মার রহস্যময় সংযোগে উৎপন্ন হয় এবং এর থেকেই গুরুত্বাকর্ষণ বলের উৎপত্তি হয়।

গুরুত্বাণু ঘটক

মনে রাখা দরকার যে, বর্তমান ভৌতিকী এখনও পর্যন্ত গুরুত্বাণুর সম্পর্কে শুধু অজ্ঞই নয়, বরং বিভ্রান্তও আছে। কিছু লোক এটিকে একটি কল্পিত কণা মনে করেন। যদি আমরা এটিকে কল্পিত কণা মনে করি, তবে গুরুত্বাকর্ষণ বলও কল্পিত বলেই প্রমাণিত হবে। কণাই যখন কল্পিত, তখন তার থেকে উৎপন্ন বলকে আমরা কীভাবে বাস্তব বল বলতে পারি ? বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা এমন কথাও বলতে শুরু করেছেন যে, গুরুত্ব বল কোনো বল নয়, একটি দ্রব্যমানযুক্ত বস্তু অন্য একটি দ্রব্যমানযুক্ত বস্তুকে আকর্ষণ করে না, বরং আকাশেরই কিছু বিকৃতির কারণে এমনটি ঘটে। এখানে এই প্রশ্ন ওঠে যে, দ্রব্যমান আকাশকে কোন বল দিয়ে বিকৃত করে? যদি গুরুত্ব বল দিয়ে করে, তবে গুরুত্ব বল আগে ছিল নাকি আকাশের বক্রতা? বর্তমান ভৌতিকীর কাছে এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

গুরুত্ব বল

10.4 সৃষ্টিতে গুরুত্ব বলের উৎপত্তি প্রারম্ভ

যখন ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন ধরণের ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়, সেই ক্রমে —

আপো রেবতীঃ ক্ষয়থা হি বস্বঃ ক্রতুম্ চ ভদ্রম্ বিভৃথামৃতম্ চ।
রায়শ্চ স্থ স্বপত্যস্য পত্নীঃ সরস্বতী তদ্ গৃণতে বয়ো ধাৎ॥

(ঋগ্বেদ 10.30.12)

এই নিবৃত্ত্রিষ্টুপ ছন্দ রশ্মির আবৃত্তি 100 বার হয়ে থাকে। তখন বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ রশ্মি সেই সময় পর্যন্ত উৎপন্ন হয়ে যায়। সেই সময় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ অতি সূক্ষ্ম বায়ু রূপ হয়ে সর্বত্র প্রবাহিত হতে থাকে। মনে রাখা দরকার যে এখানে বায়ুর অর্থ বাতাস (Air) নয়, বরং ছন্দ রশ্মি হয়। সেই সময় পর্যন্ত বর্তমান প্রচলিত ঊর্জা উৎপন্ন হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত কোনো প্রকারের কণা-প্রতিকণা উৎপন্ন হয় না। যখন বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ রশ্মি, যা বায়ুর রূপ, উৎপন্ন হয়ে যায়, সেই সময় তাদের ঘনীভবন থেকে সর্বপ্রথম বর্তমান প্রচলিত ঊর্জা উৎপন্ন হয়। যার প্রত্যেক কোয়ান্টার অন্তর্গত অনেক প্রকারের সূক্ষ্ম রশ্মি এবং তাদের ততটাই সূক্ষ্ম বল বিদ্যমান থাকে। তার পরে সেই ব্রহ্মাণ্ডস্থ পদার্থে এই ছন্দ রশ্মি পুনরায় 260 বার স্পন্দিত হয় এবং এই সময়ে 360 প্রকারের অন্য ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে যায়, **তখন তাদের ঘনীভূত কণা রূপে সর্বপ্রথম গুরুত্বাকর্ষণ বল উৎপন্ন হয়,** যার কারণে সেই পদার্থ ধীরে-ধীরে ঘনীভূত হতে শুরু করে। সেই সময়েই বিদ্যুৎ আবেশিত কণাগুলোর উৎপত্তিও হয়। এর সাথে-সাথেই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলও উৎপন্ন হয়ে যায়। এই সময়ে সেই পদার্থ ঘনীভূত হয়ে নেব্যুলার নির্মাণ করতে শুরু করে। সেই সময় পদার্থের রঙ কিছুটা লাল বা তাম্র বর্ণের হয়। সেই সময়েই নক্ষত্র উৎপত্তির পূর্বেই বিভিন্ন প্রকারের ছোট নাভিকীয়ের উৎপত্তিও হতে শুরু করে।

স্মরণীয় তথ্য

1. মহর্ষি কণাদের মতে সংযোগ বা সংস্কারের অভাবে বস্তু গুরুত্ব বলের কারণে নিচের দিকে পড়ে।
2. পিণ্ড বা কণাগুলো থেকে কিছু রশ্মি, বিশেষ করে বৃহতী ও পঙক্তি ছন্দ রশ্মিগুলো চারপাশে ক্রমাগত শোষিত ও নির্গত হতে থাকে।

গুরুত্ব বল

3. পঙক্তি এবং বৃহতী রশ্মির সংযোগে 'গুরুত্বাণু' উৎপত্তি হয়।
4. কোনো বস্তুতে যত বেশি দ্রব্যমান থাকবে, সেই বস্তু থেকে তত বেশি বৃহতী ও পঙক্তি ছন্দ রশ্মি নির্গত হবে এবং তার গুরুত্বাকর্ষণ বলও তত বেশি হবে।
5. গুরুত্বাকর্ষণ বল এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল উৎপন্নকারী প্রাণ রশ্মি অনন্ত দূরত্ব পর্যন্ত চললেও ব্যবধানপ্রাপ্ত হয় না।
6. গুরুত্বাণু সবদিকে প্রবাহিত হওয়ার কারণে গুরুত্ব ঊর্জা নির্গত হতে থাকে, একই ধরণের রশ্মির সংঘর্ষে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ এবং পঙক্তি ও বৃহতী ছন্দ রশ্মির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই তুলনামূলকভাবে দুর্বল হওয়ার কারণে গুরুত্বাকর্ষণ বল সব বলের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল, কিন্তু ব্যাপক হয়।

অনুশীলনী

1. নিউটনের গুরুত্বাকর্ষণ সিদ্ধান্তকে বৈদিক বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করুন।
2. মহর্ষি কণাদ গুরুত্বাকর্ষণ বলের বিষয়ে কী লিখেছেন ? উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলুন।
3. গুরুত্বাকর্ষণ বল সবচেয়ে দুর্বল বল কেন হয় ? স্পষ্ট করুন।
4. বৈদিক ভৌতিকীতে গুরুত্বাণু (গ্র্যাভিটন) নামক কণাতে কোন-কোন প্রধান উপাদান থাকে ?
5. বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বাকর্ষণ এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের উৎপত্তির ক্রম বুঝিয়ে বলুন।

* * * * *

11 অধ্যায়

আবেশ-এর স্বরূপ

গুরুত্ব বলের পর এবার আমরা সেইসব বল সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো, যা বিদ্যুৎ আবেশিত পদার্থসমূহের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং যে বলগুলোতে দ্রব্যমানের কোনো ভূমিকা থাকে না — যদিও সেই পদার্থগুলো অনিবার্য রূপে দ্রব্যমানযুক্ত হয়ে থাকে। আসুন, আমরা এই বলগুলোর মধ্যে প্রধান বল বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

11.1 বিদ্যুৎ আবেশ

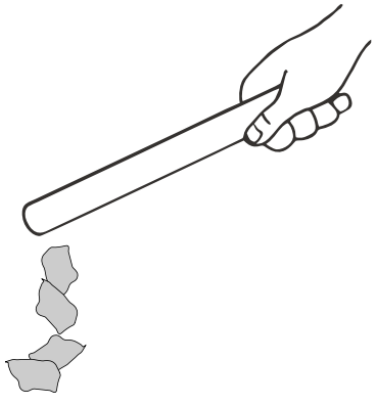

যখন একটি কাঁচের দণ্ডকে রেশমের কাপড়ের সাথে ঘর্ষণ করা হয়, তখন ঘর্ষণের পর কাঁচের দণ্ডটি ছোট-ছোট কণা বা কাগজের টুকরো আদিকে আকর্ষণ করতে শুরু করে। এই ঘর্ষণ প্রক্রিয়ার (ঘষার) পর পদার্থ সাধারণ অবস্থার তুলনায় কিছু আলাদা আচরণ প্রদর্শন করে এবং পদার্থের এই বিশেষ গুণটিকে 'বিদ্যুৎ আবেশ' বলা হয়। যখন আমরা শরীর থেকে সোয়েটার খুলি, তখন আপনি সম্ভবত চট-চট শব্দ শুনতে পান অথবা স্ফুলিঙ্গ দেখতে পান। এর কারণও বিদ্যুৎ আবেশই হয়। আবেশ সম্পর্কে বলা হয় —

''A property of some elementary particles that gives rise to an interaction between them.''

(Oxford dictionary of Physics, Pg. No. 69)

অর্থাৎ, কিছু মূল কণিকার পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ বল উৎপাদনকারী গুণকেই আবেশ বলা হয়। কিন্তু এই বিদ্যুৎ আবেশ আসলে কী ? বর্তমান ভৌতিকীতে এটি এখনও স্পষ্ট নয়।

পদার্থ দ্বারা আবেশ (বিশেষ গুণ) গ্রহণ করার পশ্চাৎ পদার্থকে আবেশিত পদার্থ বলা হয়। বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞান ধনাত্মক তথা ঋণাত্মক এই দুই ধরণের আবেশের কল্পনা করে। এইসব আবেশ দুটি বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিছু সাধারণ পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, সজাতীয় আবেশ একে-অপরকে বিকর্ষণ করে তথা বিজাতীয় আবেশ

একে-অপরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে আমাদের সামনে অনেক প্রশ্ন উপস্থিত হয়। যেমন — আবেশের গুণের কারণ কী ? ইলেকট্রনের ওপর ঋণাত্মক আবেশ এবং প্রোটনের ওপর ধনাত্মক আবেশ কেন থাকে ? সজাতীয় আবেশ কেন পরস্পরকে বিকর্ষণ এবং বিজাতীয় আবেশ কেন পরস্পরকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ আকর্ষণ তথা বিকর্ষণের ক্রিয়াবিজ্ঞান কী? আবেশিত কণাগুলোর অভ্যন্তরীণ গঠন কী ? ইত্যাদি প্রশ্ন বর্তমান বিজ্ঞানের কাছে আজও রহস্য হয়ে আছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বৈদিক বিজ্ঞানের আধারে জানার চেষ্টা করবো।

11.2 আবেশ-এর কারণ

বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে —

- আবেশ হল পদার্থের একটি গুণ।
- যার থেকে ক্রিয়াশীলতা ও উষ্মার উৎপত্তি হয়, সেই পদার্থকে বিদ্যুৎ বলা হয়।
- বিদ্যুৎ হল পদার্থের নাম এবং আবেশ হল তার গুণ।
- যার থেকে বল গুণের উদয় হয়, সেই পদার্থকে বিদ্যুৎ বলা হয়।
- বিদ্যুৎ প্রতিটি কণা আদি পদার্থকে উৎপন্ন ও প্রেরিত করে।

যেমনটা আমরা জানি, যেকোনো পদার্থ ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন আদি দিয়ে গঠিত এবং এদের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন তাদের থেকেও সূক্ষ্ম কোয়ার্ক আদি কণা তথা কোয়ার্কগুলো ছন্দ রশ্মি থেকে তৈরি হয়। তাই আবেশের কারণ জানার জন্য প্রথমে আমাদের এই রশ্মিগুলোর ব্যবহার ভালোভাবে জানা উচিত। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত রশ্মি আছে, সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় — য়োষা এবং বৃষা। এর মধ্যে কিছু রশ্মি বৃষা (পুরুষ), বাকিগুলো তাদের সাপেক্ষে য়োষা (স্ত্রী) রূপে আচরণ করে। উভয় প্রকার রশ্মির মধ্যে একে-অপরকে আকর্ষণ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকে, যা তাদের মধ্যে 'ওম্' এবং মনস্তত্ত্বের মাত্রার পার্থক্যের কারণে ঘটে। রশ্মিগুলোর এই গুণের কারণেই পদার্থ বা কণা একে অপরকে আকর্ষণ করতে পারে অথবা আবেশ উৎপন্ন করে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, কিছু কণা উদাসীন কেন হয় ? এর কারণ হল উদাসীন কণাগুলোর ভেতরে উভয় প্রকারের রশ্মিগুলো সমান মাত্রায় থাকে।

বৈদ্যুতিক আবেশ সর্বদা কোনো সূক্ষ্ম কণার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। এই বিদ্যুৎ আবেশের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা হতে পারে না। বিদ্যুৎ আবেশ ছাড়া কোনো কণার অস্তিত্বও থাকতে পারে

না। এই বিদ্যুৎ আবেশের কারণেই সেই কণায় গতি, বল, প্রকাশ আদি গুণ বিদ্যমান থাকে।

11.3 ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আবেশের মধ্যে পার্থক্য

ধনাত্মক আবেশযুক্ত কণা বিভিন্ন প্রকারের প্রাণ রশ্মি দিয়ে তৈরি হয়। প্রাণ রশ্মি সর্বদা মরুৎ (ছোট ছন্দ রশ্মি) রশ্মিকে আকর্ষণ করে। আকাশও এই ছন্দ রশ্মি দিয়েই তৈরি, এই কারণে আকাশের রশ্মি প্রাণ রশ্মির সাথে ধনাত্মক আবেশযুক্ত কণাকেও ধরে রাখে। অন্যদিকে, ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণা বিভিন্ন প্রকারের মরুৎ রশ্মি দিয়ে গঠিত হয়।

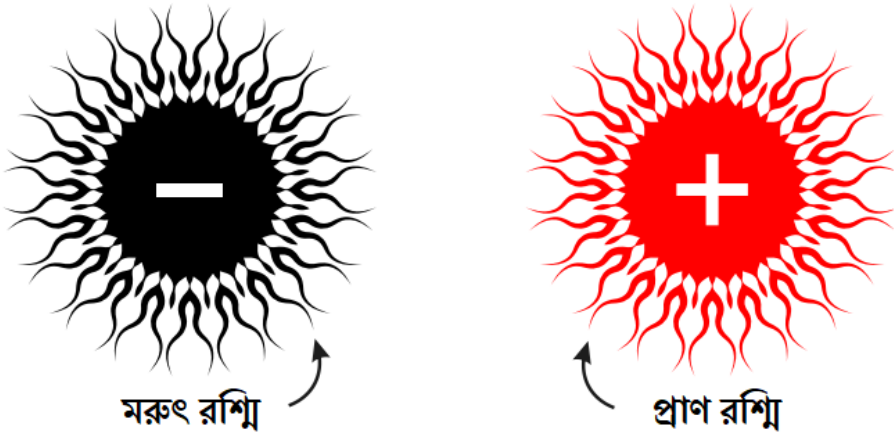

মরুৎ রশ্মি আকাশের রশ্মিকে আকর্ষণ করে। এইভাবে আকাশ সেই দুই কণার মধ্যে এমনভাবে আচরণ করে, যেন সেটি একটি চাদরের (শীট) মতো এবং সেই চাদরের উপর দুটি শিশু বসে আছে। একটি শিশু চাদরের সাথে সেঁটে আছে এবং অন্য শিশুটি চাদরটি ধরে আছে, যে চাদরটিকে টেনে-টেনে চাদরের সাথে সেঁটে থাকা শিশুটিকে নিজের দিকে নিয়ে আসছে।

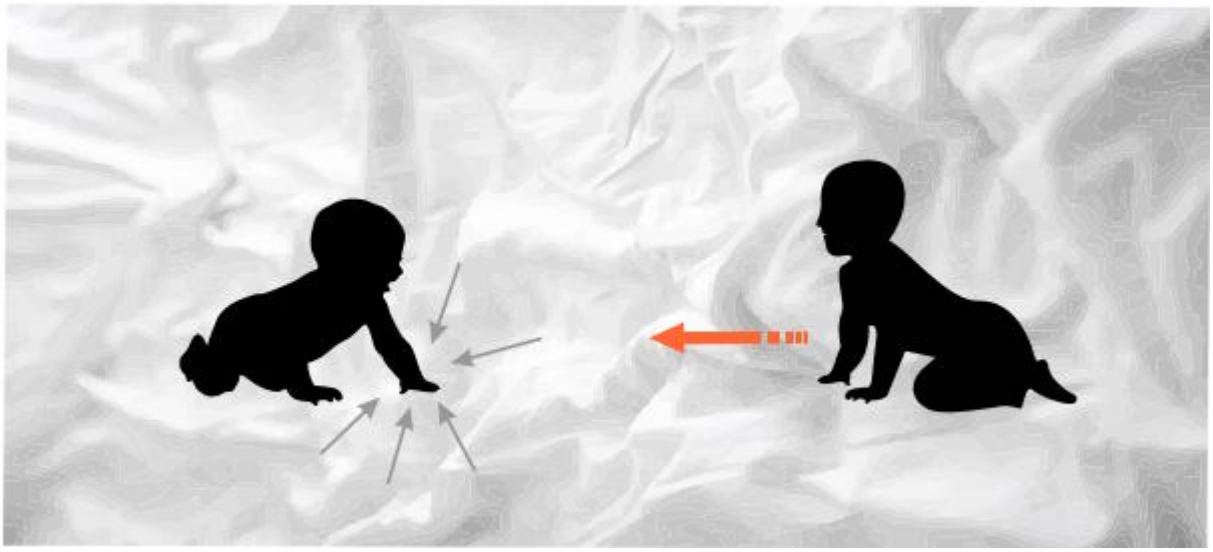

আবেশ-এর স্বরূপ

11.4 বিপরীত আবেশের মধ্যে আকর্ষণের প্রক্রিয়া

কুলম্বের সূত্রানুসারে —

'দুটি বিন্দু আবেশের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান আবেশ দুটির গুণফলের সমানুপাতিক এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়।'

অর্থাৎ, $$F = K_e \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

যেখানে q_1 এবং q_2 হল দুটি আবেশের মান তথা r হল তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং F হল তাদের দ্বারা একে-অপরের ওপর প্রযুক্ত বল। গুরুত্বাকর্ষণ বলের সূত্রের মতো এখানেও একটি ধ্রুবক আছে, যাকে এখানে K_e (যার মান $9.0\times10^9\ Nm^2\ C^{-2}$) দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এই সূত্রের সাহায্যে আমরা দুটি আবেশের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান তো নির্ণয় করতে পারি, কিন্তু এর ক্রিয়াবিজ্ঞান কী? কেন দুটি আবেশ একে-অপরকে আকর্ষণ করছে? বর্তমান বিজ্ঞানের কাছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনও নেই, কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় (বেদবিজ্ঞান-আলোকঃই) এর উত্তর দেওয়া হয়েছেএর অনুসারে, ধনাত্মক আবেশযুক্ত কণাগুলোতে বিদ্যমান প্রাণ রশ্মিতে ব্যাহৃতি রশ্মি ('ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ')-এর প্রাধান্য থাকে। যখন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণা একে-অপরের নিকটে আসে, তখন সর্বপ্রথম এই ব্যাহৃতি রশ্মিগুলো ঋণাত্মক কণার দিকে বৃষ্টি হয়। এদের আকর্ষণে ঋণাত্মক কণায় বিদ্যমান মরুৎ রশ্মি বাইরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ব্যাহৃতির সাথে-সাথে ধনঞ্জয় রশ্মির দিকে আকৃষ্ট হতে শুরু করে। যদি এমন না হতো, তবে ধনঞ্জয় রশ্মিগুলো মরুৎ রশ্মিগুলোকে আকর্ষণ করতে পারতো না।

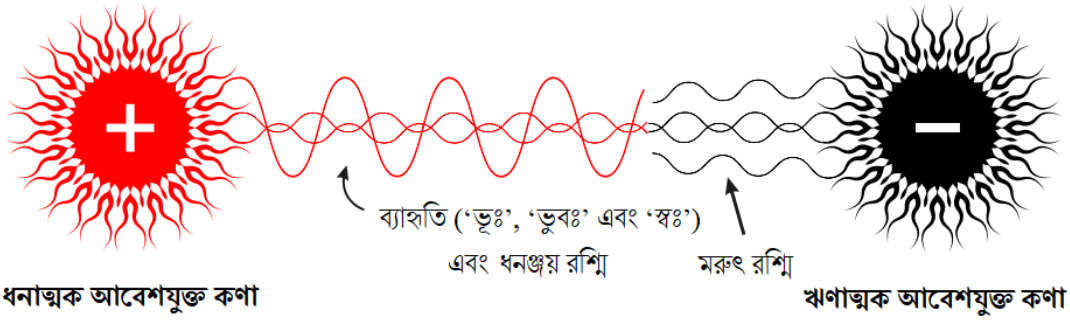

ব্যাহৃতি রশ্মি দ্বারা মরুৎ রশ্মির আকর্ষণ

যে কণায় যত বেশি প্রাণ বা মরুৎ রশ্মি থাকবে, সেই কণার বল তত বেশি হবে। কোনো আবেশ থেকে রশ্মিগুলো গুরুত্বাকর্ষণ বলের ন্যায় চারদিকে সমানভাবে নির্গত হয়, যার ফলে এই বল দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়।

আবেশ-এর স্বরূপ

বর্তমান বিজ্ঞান বলের উৎপত্তির কারণ হিসেবে আবেশের মধ্যে মধ্যস্থ (মিডিয়েটর) কণা প্রকাশাণু (ফোটন)-র বিনিময়কে গণ্য করে। এই প্রকাশাণুর প্রবাহকেই বৈজ্ঞানিকরা ফিল্ড বলেন। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, এই প্রকাশাণু কোথা থেকে আসে অথবা কীভাবে উৎপন্ন হয় এবং কেন এদের বিনিময় ঘটে ?

যেমন আমি উপরে বলেছি যে, ধনাত্মক আবেশযুক্ত কণা প্রাণ আদি পদার্থের সংকোচন থেকেই উৎপন্ন হয়। এই কারণে তাতে প্রাণ তত্ত্বের ঘনত্ব বেশি থাকে। এই কারণে ধনাত্মক আবেশযুক্ত কণা প্রাণ তত্ত্বের কিছু অংশ ধনঞ্জয় প্রাণের সাথে আকাশ তত্ত্বে নির্গত করতে থাকে; যা ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণা থেকে নির্গত মরুৎ রশ্মির সাথে মিলে মধ্যস্থ (মিডিয়েটর) কণা গঠন করে। এই কণাগুলো কাল্পনিক নয়, বরং বাস্তব হয়, কিন্তু এদের আয়ু অত্যন্ত কম হওয়ার কারণে বর্তমানের কোনো প্রযুক্তির সাহায্যে এদের শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন।

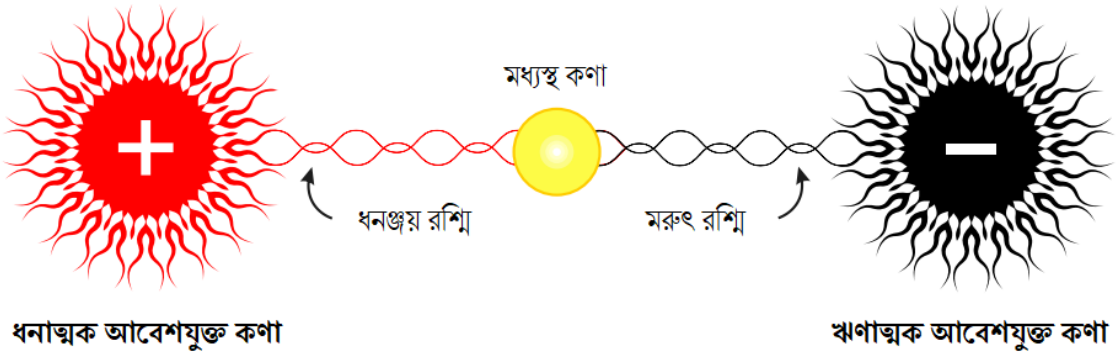

বিপরীত আবেশের মধ্যে মধ্যস্থ কণার উৎপত্তি

মধ্যস্থ কণায় প্রাণ এবং মরুৎ উভয় প্রকারের রশ্মি থাকে, এই কারণে এটি উভয় আবেশ দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং তাদের মাঝে দোদুল্যমান থাকে। এর গতিশীলতার ফলে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান আকাশও ধীরে-ধীরে সংকুচিত হতে থাকে। যখন এই আকাশ সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত সংকুচিত হয়, অর্থাৎ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণাগুলোর মধ্যে যখন ন্যূনতম দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, তখন মধ্যস্থ কণাটি তার গঠনকারী রশ্মিগুলোতে বিভক্ত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

11.5 সমান আবেশযুক্ত কণাগুলোর মধ্যে বিকর্ষণের ক্রিয়াবিজ্ঞান

বর্তমান বিজ্ঞান বিপরীত আবেশের মধ্যে আকর্ষণের কারণ বোঝানোর চেষ্টা তো করে, কিন্তু সমান আবেশের মধ্যে বিকর্ষণের কারণ জানতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যখন উভয় দিকে সমান ধরণের আবেশ বিদ্যমান থাকে, তখন উভয় কণা থেকে ধনঞ্জয় প্রাণ

অথবা মরুৎ রশ্মি নির্গত হয়। সমান প্রবৃত্তি হওয়ার কারণে এই রশ্মিগুলোর মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল কাজ করে না। অন্যদিকে, এটিও একটি তথ্য যে দুই ও ততোধিক পদার্থের মধ্যে সর্বদা অসুর ঊর্জা বিদ্যমান থাকে, যার প্রভাব সর্বদা বিকর্ষণমূলক ও প্রক্ষেপক হয়। যদি সেই পদার্থগুলো থেকে নির্গত রশ্মিগুলোর মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল না থাকে, তবে অসুর ঊর্জা সেই পদার্থগুলোকে বিকর্ষণ করতে শুরু করে। এই কারণে একই ধরনের রশ্মিগুলো একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ফিরে যায়, যার ফলে উভয় কণার মধ্যে আকর্ষণ না হয়ে বিকর্ষণ বল কাজ করে।

11.6 তার পর আরও কিছু আছে...

এখানে দুটি আবেশযুক্ত কণার মধ্যে আকর্ষণ প্রক্রিয়ার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমনটি আমরা জানি যে, অগ্নি (প্রাণ) প্রধান কণা ধনাত্মক আবেশযুক্ত এবং সোম (মরুৎ) প্রধান কণা ঋণাত্মক আবেশযুক্ত হয়। ধনাত্মক আবেশযুক্ত কণা থেকে অতি তীব্রগামী ধনঞ্জয় প্রাণ রশ্মি এবং ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণা থেকে সূক্ষ্ম মরুৎ রশ্মি নির্গত হয়ে একে-অপরের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। সুত্রাত্মা বায়ু এই উভয় প্রকার কণাকে ঢেকে রাখে, কিন্তু কণাগুলোর পরিধিতে এর ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। সুত্রাত্মা বায়ু, ধনঞ্জয় আদি প্রাণ এবং মরুৎ রশ্মির মিলনের ফলেই তরঙ্গাণু (ফিল্ড পার্টিকেলস) উৎপন্ন হয়। এদের গতি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের গতির সমান হয়। এই প্রক্রিয়ায় ধনঞ্জয় বায়ু সর্বপ্রথম ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণার কাছে পৌঁছায় এবং তার সাথে-সাথে তরঙ্গাণুগুলোও (ফিল্ড পার্টিকেলস) এর ওপর ভর করে ঋণাত্মক কণার দিকে এগিয়ে যায়। এরপর উভয় আবেশযুক্ত কণা একে-অপরের কাছে আসতে শুরু করে। সেই অবস্থায় উভয় কণার বাইরে এবং ভেতরে নিরন্তর প্রবাহিত প্রাণ এবং অপান রশ্মি একে-অপরের কাছে আসে। পরিশেষে, উভয় কণা একে-অপরের খুব কাছাকাছি এসে একে-অপরের সাথে আবদ্ধ হয়ে যায়।

এই বল তরঙ্গাণু (ফিল্ড পার্টিকেলস)-এর কারণে নয়, বরং ধনঞ্জয়, মরুৎ বা সুত্রাত্মা বায়ু আদির রশ্মির এই বলের কারণেই ফিল্ড পার্টিকেলস তৈরি হয়। এর পরে তরঙ্গাণু (ফিল্ড পার্টিকেলস) দড়ির মতো আবেশযুক্ত কণাগুলোকে বেঁধে রাখে অবশ্য। ঠিক যেমন দু'জন ব্যক্তি একটি দড়ির দুই প্রান্ত শক্ত করে ধরে থাকেন এবং এর ফলে তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন, সেই সময় তারা দুজনেই নিজের শক্তিতে দড়ির মাধ্যমে একে-অপরের সাথে আবদ্ধ থাকেন; দড়ির নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, বরং তাদের পেশীর শক্তিই তাদের ধরে রাখে। ঠিক একইভাবে,

উভয় আবেশযুক্ত কণা থেকে নির্গত পূর্বোক্ত বিভিন্ন প্রাণাদি রশ্মিই বলের মূল কারণ হয় এবং ওই রশ্মিগুলোই ফিল্ড পার্টিকেলস রূপী দড়িকে কেবল আঁকড়ে ধরে না, বরং সেগুলোকে উৎপন্নও করে, যেন মনে হয় দুই ব্যক্তিই দড়িটি তৈরি করেছেন।

এই বলের বিষয়ে একটি অত্যন্ত গভীর রহস্য এই যে, তরঙ্গাণু (ফিল্ড পার্টিকেল)-র প্রভাবশালী বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বল ধনঞ্জয় প্রাণ রশ্মির প্রভাবশালী বলের এক-চতুর্থাংশ হয়। যখন ধনঞ্জয় প্রাণ, মরুৎ রশ্মি এবং সূত্রাত্মা বায়ুর মিলনে তরঙ্গাণু (ফিল্ড পার্টিকেলস)-র উৎপত্তি হয়, তখন সূত্রাত্মা বায়ু থেকে উৎপন্ন একটি গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি সেই তরঙ্গাণুকে বল ও তেজ প্রদান করে এবং তাকে নিজের সাথে সংযুক্ত করে নেয় আর ধনঞ্জয় প্রাণ রশ্মি তাকে গতি প্রদান করে। এই গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি সেই ফিল্ড পার্টিকেলকে স্পন্দিত করে সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির সাথে এমনভাবে যুক্ত করে দেয়, যেন তারা সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মিকে নিজের সাথে নিয়ন্ত্রণ করে দুটি আবেশযুক্ত কণার মধ্যে অবস্থিত আকাশ তত্ত্বে স্পন্দিত হতে-হতে সেই কণাগুলোর মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে দুটি কণার মধ্যে আকর্ষণের এই প্রক্রিয়াই ঘটে থাকে। এইভাবে তৈরি সংযুক্ত কণাগুলো এই সৃষ্টিতে সর্বত্র বিচরণ করে।

স্মরণীয় তথ্য

1. যার থেকে ক্রিয়াশীলতা ও উষ্মার উৎপত্তি হয়, সেই পদার্থকে বিদ্যুৎ বলে।

2. বিদ্যুৎ হল এক প্রকার পদার্থের নাম এবং আবেশ হল তার গুণ।

3. যার থেকে বল গুণের উদয় হয়, তাকে বিদ্যুৎ বলে।

4. এই ব্রহ্মাণ্ডে য়োষা এবং বৃষা নামক দুই প্রকার রশ্মি আছে।

5. উভয় প্রকার রশ্মির মধ্যে একে-অপরকে আকর্ষণ করার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, যা তাদের মধ্যে 'ওম' এবং মনস্তত্ত্বের পরিমাণের পার্থক্যের কারণে ঘটে।

6. বিদ্যুৎ আবেশের কারণেই কোনো কণার মধ্যে গতি, বল এবং প্রকাশ আদি গুণ বিদ্যমান হয়।

7. ধনাত্মক আবেশযুক্ত কণা বিভিন্ন প্রকার প্রাণ রশ্মি দিয়ে তথা ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণা বিভিন্ন প্রকার মরুৎ রশ্মি দিয়ে গঠিত হয়।

8. মরুৎ রশ্মি আকাশ রশ্মিকে আকর্ষণ করে।

9. ধনাত্মক আবেশযুক্ত কণাগুলোতে বিদ্যমান প্রাণ রশ্মিতে ব্যাহৃতি রশ্মির ('ভূঃ', 'ভুবঃ' এবং 'স্বঃ') প্রাধান্য থাকে।

10. যে কণায় প্রাণ বা মরুৎ রশ্মির পরিমাণ যত বেশি হবে, সেই কণার বল তত বেশি হবে।

11. প্রাণ তত্ত্ব মরুৎ রশ্মির সাথে মিশে মধ্যস্থ (mediator) কণা তৈরি করে।

12. সমান প্রবৃত্তির রশ্মির মধ্যে কোনো আকর্ষণ বল কাজ করে না।

13. ফিল্ড পার্টিকেলের প্রভাবশালী বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বল ধনঞ্জয় প্রাণ রশ্মির প্রভাবশালী বলের এক-চতুর্থাংশ হয়।

অনুশীলনী

1. বিদ্যুৎ আবেশকে বর্তমান ভৌতিকীর পরিভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করুন। এর পাশাপাশি বৈদিক ভৌতিকীর দ্বারা এটিকে সংজ্ঞায়িত করুন।

2. বিদ্যুৎ আবেশ কেন দুই প্রকারের হয়? এদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য কী? বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিতে এটি ব্যাখ্যা করুন।

3. বিপরীত আবেশের মধ্যে আকর্ষণের ক্রিয়াবিজ্ঞান কী?

4. সমান আবেশের মধ্যে বিকর্ষণের ক্রিয়াবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করুন।

5. ফিল্ড কণা (particle) কী? আকর্ষণে এদের ভূমিকা কী এবং আকর্ষণের সময় এরা কীভাবে উৎপন্ন হয়?

* * * * *

12 অধ্যায়

তরঙ্গাণু ও মূলকণার উৎপত্তি

বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞান সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সময় থেকেই তরঙ্গাণু ও মূলকণার উৎপত্তি স্বীকার করে। এটি বিশ্বাস করে যে তরঙ্গাণু ও মূলকণার চেয়ে সূক্ষ্ম কোনো পদার্থের সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, বৈদিক ভৌতিকীর অনুযায়ী, মূলকণা ও তরঙ্গাণুর উৎপত্তি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অনেকগুলো ধাপ পার হওয়ার পর অগ্নি মহাভূতের উৎপত্তি থেকে শুরু হয়। এদের উৎপত্তির আগে সৃষ্টিতে কাল ও মহৎ থেকে বায়ু মহাভূত পর্যন্ত কত প্রকারের পদার্থ উৎপন্ন হয়, তা আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি।

18 নম্বর পৃষ্ঠায় দেওয়া চিত্রানুসারে, অগ্নি মহাভূত — যাকে বর্তমান ভাষায় তরঙ্গাণু ও মূলকণা বলা যেতে পারে — তার উৎপত্তি দশম ধাপে হয়। এর থেকে পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন যে সৃষ্টির মূল উপাদান জানার ক্ষেত্রে বর্তমান ভৌতিকী কতখানি পিছিয়ে আছে ?

12.1 তরঙ্গাণু ও মূলকণার সংক্ষিপ্ত স্বরূপ

মন, বাক্, প্রাণ ও ছন্দ আদি রশ্মিগুলো সৃষ্টি কালে নষ্ট হয় না। এই পদার্থগুলো নিরন্তর গতিশীল এবং বল ও হালকা অদৃশ্য দীপ্তিযুক্ত হয়। এগুলো সমগ্র সৃষ্টিতে ছড়িয়ে থাকে। এই পদার্থগুলো অন্যান্য স্থূল পদার্থের উপর নিজের অত্যন্ত সূক্ষ্ম রশ্মি ছড়াতে থাকে। এই রশ্মিগুলোর কারণেই সৃষ্টির সব পদার্থে আকর্ষণাদি বল উৎপন্ন হয়। এই রশ্মিগুলোর অনুপাতের ভেদ, দিশার ক্রম ভেদ এবং মাত্রা ভেদের কারণেই সৃষ্টির বিভিন্ন কণা ও তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন কণা সূত্র বা সুতোর মতো কম্পনরত সূক্ষ্ম অবয়বের ঘন রূপ হয়। কোনো কণাই পূর্ণতঃ দৃঢ় তথা নির্দিষ্ট আকৃতির হয় না। এই সমস্ত কণা স্বতন্ত্র থাকা সত্ত্বেও সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মি দ্বারা বাঁধা থাকে। এই বন্ধনের কারণেই তারা পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণ আদি আচরণ করে এবং বিভিন্ন তত্ত্ব গঠন করতে পারে। মূলকণার মধ্যে বিদ্যমান প্রাণাদি রশ্মিগুলো পরস্পরের সাথে অত্যন্ত দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, যার ফলে সেই কণাগুলো তাদের কণা-অবস্থা প্রাপ্ত করে। যদি প্রাণ-রশ্মিগুলোর এই ধরণের দৃঢ় বন্ধন না থাকতো, তবে মূলকণা বা অন্য কোনো কণার উৎপত্তিই সম্ভব হতো না।

এই উভয় প্রকার পদার্থই অগ্নি মহাভূতের রূপ হয়। এই দুই প্রকারের পদার্থের নির্মাণ প্রক্রিয়া মৌলিক রূপে সমান হয়। বায়ু মহাভূতের পশ্চাৎ, সেই সময় পর্যন্ত উৎপন্ন পদার্থসমূহের বিশেষ মিলন ও ঘনীভবনের মাধ্যমে অগ্নি মহাভূতের উৎপত্তি হয়। মূলকণা ও বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তির পূর্বে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বহু প্রকার প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মিরূপে বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত রশ্মি মনস্তত্ত্ব বা অহংকারের সূক্ষ্মতম ছন্দ-রশ্মি 'ওম'-এর কারণে উৎপন্ন হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের জানা কোনো তরঙ্গের সাথেই এই রশ্মিগুলোর তুলনা করা যায় না; বরং এগুলোই হল সেই সবকিছুর উৎপত্তির মূল কারণ।

12.2 বায়ুতত্ত্ব (ভ্যাকিউম ঊর্জা) থেকে মূলকণা ও তরঙ্গাণুর নির্মাণ

বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির মিশ্রণ বায়ু নামে সর্বত্র প্রায় একরস ভরা থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় একে ভ্যাকিউম ঊর্জা বলা যেতে পারে। এখানে একরসতার মানে এই নয় যে সেখানে কোনো গতি বা হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, বরং এগুলোর উপস্থিতিতেও পদার্থ কোথাও না তো ঘন রূপ ধারণ করে আর না কোনো তরঙ্গের মতো আচরণ করতে সক্ষম হয়। 'ওম্' ছন্দ রশ্মিগুলো সূত্রাত্মা বায়ু, নিবিদ্ (মাস) এবং বৃহতী ছন্দ প্রভৃতি রশ্মিকে প্রেরিত করে বায়ু তত্ত্বে অসংখ্য স্থানে ঘূর্ণন সৃষ্টি করতে শুরু করে, ঠিক যেভাবে প্রবাহিত নদীর জলে ঘূর্ণি (ভোঁয়র) তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ার তিনটি ধাপ আছে, যেখানে যথাক্রমে গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ-বৃহতী এবং জগতী ছন্দের বিশেষ ভূমিকা থাকে। কণার তুলনায় তরঙ্গাণুতে রশ্মির ঘনত্ব ও পরিমাণ কম থাকে, কিন্তু উভয়ের নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রায় একই হয়। ঘূর্ণন শুরু হওয়ার আগে একটি নিচৃৎ ত্রিষ্টুপ ছন্দ রশ্মি সম্পূর্ণ বায়ু তত্ত্বে একশোবার সর্বত্র স্পন্দিত হয়; এরপরই ঘূর্ণন শুরু হয়ে অনেক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর সর্বপ্রথম তরঙ্গাণু উৎপন্ন হয়। এরপর লেপটন ও কোয়ার্ক সহ অন্যান্য সকল মূলকণা নামে পরিচিত কণাগুলোর উৎপত্তি ঘটে। ছন্দ রশ্মিকে সংকুচিত করার জন্য কেবল সূত্রাত্মা বায়ু, নিবিদ্ আদি রশ্মিই থাকে না, বরং প্রাণ, অপান, ব্যান আদি প্রাণ রশ্মিও এতে নিজস্ব ভূমিকা পালন করে। যখন এই সংকুচিতকারী প্রাণ রশ্মিগুলো সংকোচনযোগ্য রশ্মির তুলনায় দুর্বল হয়, তখন সংকোচন প্রক্রিয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন সেগুলো অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন সংকোচন তীব্র হয়ে মূলকণাকে উৎপন্ন করে। যখন সংকুচিতকারী রশ্মিগুলো সংকোচনযোগ্য রশ্মির তুলনায় শক্তিশালী তো হয় কিন্তু খুব বেশি শক্তিশালী নয়, তখন তরঙ্গাণু তৈরি হয়। বিভিন্ন মূলকণা, আকাশ তত্ত্ব তথা তরঙ্গাণুর মধ্যে অর্থাৎ সর্বত্রই বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিগুলো যুগ্ম রূপে বিদ্যমান থাকে। এগুলোর মধ্যে তরঙ্গাণুর ভেতরে বিদ্যমান যুগ্মের মধ্যে দুটি ছন্দ রশ্মি

সমানভাবে তীক্ষ্ণ, সক্রিয় ও প্রকাশিত হয়। এর বিপরীত, আকাশ তত্ত্ব এবং মূলকণার মধ্যে বিদ্যমান যুগ্মের মধ্যে উভয় ছন্দ রশ্মির প্রকাশশীলতা ও সক্রিয়তার মাত্রায় কিছুটা পার্থক্য থাকে অর্থাৎ, এই দৃষ্টিতে, আকাশ ও মূলকণার মধ্যে কিছু সমতা আছে। **এই কারণেই মূলকণা তার দ্রব্যমান বা বিদ্যুৎ আবেশের দ্বারা আকাশ তত্ত্বকে তরঙ্গাণুর তুলনায় বেশি প্রভাবিত করতে পারে। এই কারণেই কণা ও তরঙ্গাণু তথা তরঙ্গাণু ও আকাশ তত্ত্বের পারস্পরিক আকর্ষণ আদি ক্রিয়াগুলো তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়।**

বিভিন্ন মূল কণিকা সম্পর্কে বৈদিক বিজ্ঞানের একটি মহান রহস্যোদ্ঘাটন হল — এই কণা এবং নক্ষত্রগুলোর গঠনের মধ্যে কিছু মিল আছে। **উভয়ের ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় অংশ বাকি বিশাল অংশ থেকে পৃথক থেকে পরস্পর পৃথক গতিতে ঘূর্ণন করে।** উভয়ের বিভিন্ন অংশে প্রাণাদি রশ্মির উপস্থিতি সর্বদা সমান হয় না, বরং কিছু পার্থক্য থাকে।

বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে যেকোনো কণা নিম্নরূপ হয় —

1. প্রাণাদি সূক্ষ্ম রশ্মিরূপ পদার্থের অপেক্ষাকৃত ঘন ও সংকুচিত রূপ হল কণা, যা সব দিক থেকে একটি সীমা দ্বারা ঘেরা থাকে। সেই ঘেরাটি সূত্রাত্মা বায়ু আদি রশ্মি দিয়ে গঠিত।
2. সূত্রাত্মা বায়ুর এই ঘেরা শুধুমাত্র উপরেই থাকে, ভেতরে নয়।
3. সেই সূত্রাত্মা বায়ু তার ভেতরে অবরুদ্ধ প্রাণাদি পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ সেই কণাকে ছড়িয়ে যেতে দেয় না।
4. সেই ঘেরা ওই কণাকে বাইরের সর্বব্যাপী প্রাণাদি পদার্থ থেকে পৃথক রাখে। কণাটি সেই আবরণকে এমনভাবে ধারণ করে থাকে, যেন কোনো মানুষ পোশাক পরিধান করে আছে।
5. এই ঘেরাটি কোনো কঠিন বস্তু বা দৃশ্যমান কিছু নয়, বরং এটি রশ্মিরূপ সূত্রাত্মা বায়ু আদির সমষ্টি, যা সাধারণত অনুভব করা যায় না।
6. সেই পরমাণু তার এই অদৃশ্য পরিমাপকে কখনো লঙ্ঘন করে না; আর যদি করে থাকে, তবে তা অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য।

এখানে যেকোনো কণার স্বরূপ সম্পর্কে এমন গভীর অথচ সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছে, যা বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞান আজও বুঝে উঠতে পারেনি।

12.3 প্রকাশাণু নির্মাণ

ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান প্রাণ এবং বাক্ রশ্মির মিশ্রিত রূপ বায়ু তত্ত্ব আকাশ তত্ত্ব দ্বারা আবৃত হয়ে

সংকুচিত হতে শুরু করে। তারপর সেই সংকুচিত বায়ু ঘনীভূত হয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই সংকুচিত ও উজ্জ্বল কণাকেই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের প্রকাশাণু (ফটোন) বলা হয়। এই প্রকাশাণু প্রাণ, অপান আদি সূক্ষ্ম রশ্মি দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এরপর একটি দৈবী ত্রিষ্টুপ এবং একটি নিচৃদ্ দৈবী ত্রিষ্টুপ অথবা দৈবী পঙ্‌ক্তি ছন্দ রশ্মির প্রভাবে সূত্রাত্মা বায়ু বিভিন্ন প্রকাশাণুগুলোকে পরিধির মতো ঘিরে ধরে একটি সুশৃঙ্খল রূপ প্রদান করে। যখন প্রাণ, অপান আদি পদার্থ বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচরণ করতে শুরু করে, অর্থাৎ যখন তাদের গতি একটি সীমিত ক্ষেত্রের কম্পনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ঠিক তখনই তারা পরস্পর মিলিত ও সংকুচিত হয়ে প্রকাশাণুর (ফটোন) রূপ ধারণ করে। তারপর সেই প্রকাশাণুগুলো সূত্রাত্মা বায়ু দ্বারা আবৃত হয়ে ধনঞ্জয় প্রাণ রশ্মির মাধ্যমে অত্যন্ত তীব্র গতি প্রাপ্ত করে সম্পূর্ণ মহাকাশে ভ্রমণ করতে শুরু করে, যার ফলে সমগ্র মহাকাশ আলোকিত হয়ে ওঠে। এই প্রাণ ও ঊর্জার গতি অত্যন্ত তীব্র হলেও তা আলোর বেগের সমান হয় না; কিন্তু যখন ঊর্জা ধনঞ্জয় প্রাণের সাথে যুক্ত হয়ে তরঙ্গাণু হিসেবে প্রবাহিত হয়, তখন তার গতি ধনঞ্জয় প্রাণকে বাদ দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্তরের পদার্থের চেয়ে বেশি এবং একই মাধ্যমে সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে। এখানে আলোর গতি এবং প্রাণ রশ্মির গতির স্থায়িত্বও প্রমাণিত হয়।

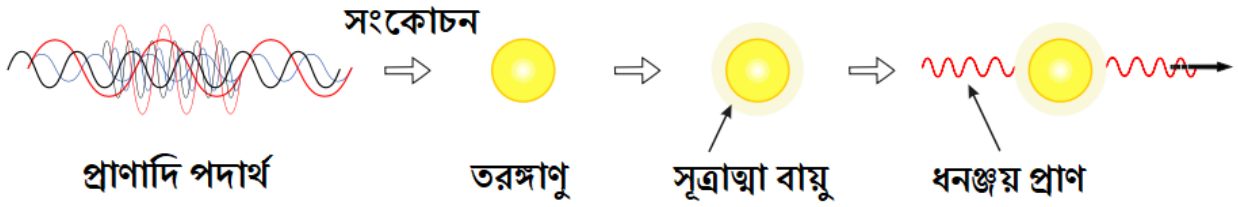

প্রকাশাণুর উৎপত্তি

প্রশ্ন — যখন প্রকাশাণুর গতির কারণ ধনঞ্জয় রশ্মি হয়, তখন প্রকাশাণুর গতি কেন ধনঞ্জয়ের সমান হয় না ?

উত্তর — প্রকাশাণু হল অনেকগুলো রশ্মির একটি ঘনীভূত রূপ, যার ফলে এতে কিছুটা দ্রব্যমান অবশ্যই থাকে এবং মহাকাশে গমনের সময় এর সাথে অত্যন্ত সামান্য ঘর্ষণও হয়, কারণ মহাকাশও এই রশ্মিগুলো দিয়ে তৈরি একটি পদার্থ। অন্যদিকে, ধনঞ্জয় রশ্মি হল মনস তত্ত্বের একটি এমন কম্পন, যার গতি অত্যন্ত তীব্র এবং মনস তত্ত্বের সাথে এর ঘর্ষণও নগণ্য হয়।

12.4 মূলকণা তৈরির প্রক্রিয়া

আসুন, এবার আমরা মূলকণা নামে পরিচিত কণাগুলোর গঠনের প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করি।

তরঙ্গাণু ও মূলকণার উৎপত্তি

যখন নিবিদ্ রশ্মিগুলো গায়ত্রী আদি রশ্মির সাথে মিলিত হয়, সেই সময় মূলকণা তৈরির জন্য নিবিদ্ রশ্মিগুলোর বাইরের ও সামনের অংশে মূলকণার কেন্দ্র তৈরি হতে শুরু করে। এরপর সেই গায়ত্রী রশ্মিগুলো ত্রিষ্টুপ্ ও বৃহতীতে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেই সময় মূলকণা তৈরির কেন্দ্র তাদের মাঝখানে অবস্থান করে। এরপর জগতী ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়। এই রশ্মি আগে তৈরি হওয়া ত্রিষ্টুপ ও বৃহতী থেকেই নির্মিত হয়। এর নির্মাণের সময় মূলকণা তৈরির কেন্দ্র জগতী রশ্মির পেছনের অংশে চলে আসে এবং সেখানে এসে মূলকণা তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। উৎপন্ন হওয়ার সাথে-সাথেই সেই মূলকণা জগতী ছন্দ রশ্মির গতির বিপরীত দিকে গতিশীল হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রকাশাণু, নিউট্রিনো, ইলেকট্রন, কোয়ার্ক আদি সকলের নির্মাণ হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের কাছে মূলকণা তৈরির এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান নেই। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি আকাশের মাধ্যমে বায়ু তত্ত্বের সংকোচনের ফলেই সম্পন্ন হয়।

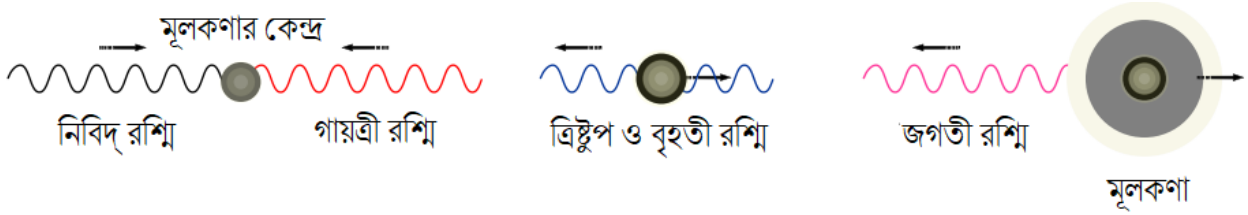

মূলকণা উৎপত্তির প্রক্রিয়া

মূলকণা তৈরির তিনটি পর্যায়ে নিবিদ্ রশ্মিগুলো একই থাকে, যা সূর্যের উদয়-অস্তের মতো যাত্রা করতে থাকে। যেমন সূর্যের কোনো পরিবর্তন হয় না, তেমনি এই রশ্মিগুলোরও কোনো পরিবর্তন হয় না। এগুলো বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির সাথে মিলে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে নতুন-নতুন কণা তৈরি করে।

1. সর্বপ্রথম এক-একটি ঋক্ ও সামের সূক্ষ্মতম রশ্মি উৎপন্ন হয়ে একে-অপরের সাথে যুক্ত হয়।
2. এরপর প্রাণ-অপান আদি প্রাণ ও গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে একে-অপরের সাথে সঙ্গত হতে থাকে। এই সময়েই অনুষ্টুপ রশ্মিও উৎপন্ন হয়।
3. এরপর তৃতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রশ্মিকে যুক্তকারী মাস অর্থাৎ নিবিদ্ রশ্মি উৎপন্ন হয় এবং তাদের সাথে প্রাণ ও বাক্ রশ্মি যুক্ত হতে শুরু করে এবং উষ্ণিক্ ও পঙ্‌ক্তি রশ্মি উৎপন্ন হয়ে মাস আদি রশ্মির সাথে সঙ্গত হতে থাকে।
4. এরপর ডার্ক উর্জাকে দূরকারী রশ্মি তথা ত্রিষ্টুপ্, বৃহতী ও জগতী উৎপন্ন হয়ে সঙ্গত হতে শুরু করে। এই সময়ে আকাশ তত্ত্ব বিস্তৃত হতে থাকে।

তরঙ্গাণু ও মূলকণার উৎপত্তি

5. এর পরে বিভিন্ন মূলকণা, ফোটন, কোয়ার্ক, ইলেকট্রন, নিউট্রিনো আদি তৈরি হতে শুরু করে। এই সময়ে ডার্ক ঊর্জাকে নিয়ন্ত্রণকারী তীব্র শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়।

এইভাবে পাঁচ ধাপের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলকণাগুলোর উৎপত্তি হয়।

12.5 আসুন, এই প্রক্রিয়াকে আরও গভীরভাবে জেনেনিই

উপরোক্ত পাঁচ ধাপের প্রক্রিয়ার শুরুর দিকে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে আরও একটি প্রক্রিয়া চলছিল, যা মূল কণা ও তরঙ্গাণু তৈরির জন্য আবশ্যক ছন্দ রশ্মিসমূহের নির্মাণ করে এবং এই রশ্মিসমূহ ঘনীভূত হয়ে উপরোক্ত কণা আদি রূপে উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াটি হল এইরূপ —

দুটি অনুষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মি, যা বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে, সেই দুটি যুক্ত থাকা তৃতীয় ছন্দ রশ্মির সাথে স্বয়ংও পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এই প্রকারের সংযোগে তিনটি ছন্দ রশ্মির একটি **ত্রিক** নির্মিত হয়। এই ধরণের অসংখ্য ত্রিক রশ্মিসমূহ ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতে-করতে বিভিন্ন পদার্থের নির্মাণের প্রক্রিয়াকে শুরু করে। এই দুটি অনুষ্টুপ্ রশ্মি তৃতীয় যেকোনো ছন্দ রশ্মির সাথে দুই প্রান্তে এক-এক আলাদা আলাদাভাবে সংযুক্ত হয়ে যায়।

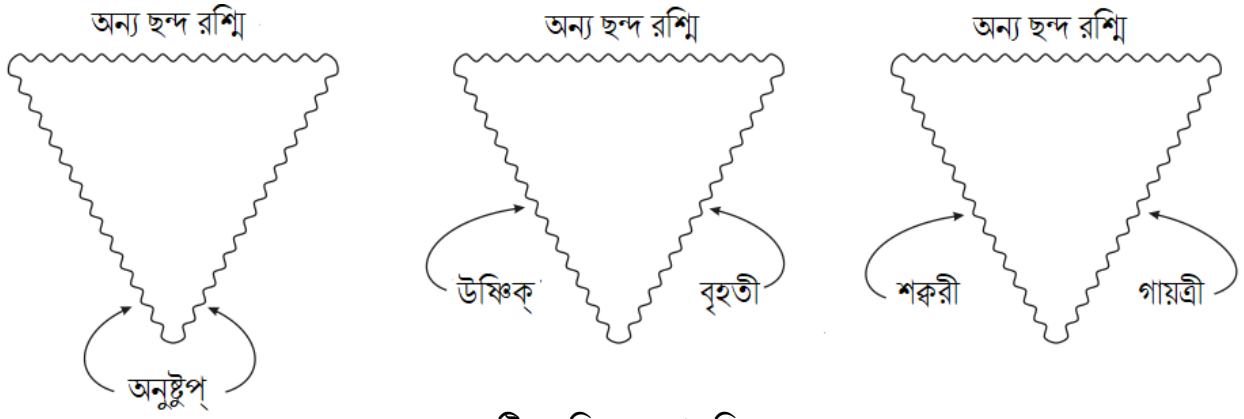

সৃষ্টিতে তিন ধরণের ত্রিক

এই ত্রিক উৎপন্ন হওয়ার পর আরও দুই ধরণের ত্রিক উৎপন্ন হয়। যার মধ্যে প্রথম প্রকারের ত্রিক উষ্ণিক্ এবং বৃহতী ছন্দ রশ্মির অন্য কোনো ছন্দ রশ্মির দুই প্রান্তে পৃথকভাবে সংযুক্ত হয়ে তৈরি হয়। **এই ত্রিকের জন্মের ফলে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গাণু এবং মূলকণার নির্মাণ শুরু হয়। বিদ্যুৎ আবেশের উৎপত্তি হয়ে এই মূলকণা আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল যুক্ত হয়ে ওঠে।** প্রকাশ এবং উষ্মা আরও সমৃদ্ধ ও তীব্র হতে শুরু করে। এই পর্যায়ের পশ্চাৎ রশ্মির তৃতীয় ত্রিক উৎপন্ন হয়, যা কোনো ছন্দ রশ্মির দুই প্রান্তে একটি শক্করী এবং একটি গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির পৃথক-পৃথক সংযোগের ফলে তৈরি হয়। **এর কারণে বিভিন্ন মূলকণা এবং**

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ঊর্জা অত্যন্ত উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়, যার ফলে সেই সমস্ত মূলকণা এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সেগুলো ডার্ক ঊর্জা আদির সম্পর্কে এসে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। এই বিক্ষোভের অবস্থাকে এই ত্রিকের এক ভাগ রূপ গায়ত্রী ছন্দ রশ্মিগুলো নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষা করে। এই সময়ে ব্রহ্মাণ্ডে তীব্র ধ্বনি [5] তরঙ্গও উৎপন্ন হতে শুরু করে। এই ধরণের প্রক্রিয়া বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ও মূলকণার নির্মাণের পূর্ব থেকে শুরু করে নক্ষত্র নির্মাণের সময় পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকে। দ্বিতীয় ত্রিক উৎপন্ন হওয়াতেই রশ্মি আদি পদার্থ ঘন হতে শুরু করে। নক্ষত্র তৈরির সময় যদি এই প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে চলতে থাকে অর্থাৎ এই ধরণের আরও ত্রিক নিরন্তর উৎপন্ন হতে থাকে, তাহলে নেব্যুলা এবং নক্ষত্র তৈরির জন্য ঘনীভূত পদার্থ অত্যধিক দ্রব্যমান এবং গুরুত্বাকর্ষণ বল প্রাপ্ত করে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে বিস্ফোরণের মাধ্যমে সমাপ্ত হতে পারে।

এই কারণে দ্রব্যমান এবং গুরুত্বাকর্ষণ বলের একটি নির্দিষ্ট সীমা তার আকারের সাথে ভারসাম্য বজায় রেখে, যখন তৈরি হয়ে যায়, সেই সময় পূর্বোক্ত ত্রিক রশ্মি তৈরির প্রক্রিয়াটি বিপরীত হয়ে যায়, এর ফলে পদার্থের আরও ঘনীভবন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে নক্ষত্রের সঠিক আকার হয়ে যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত নক্ষত্র এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে। এই ত্রিকগুলোর নির্মাণ ও স্বরূপের মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে চেতন তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ভূমিকা আছে, কারণ অচেতন রশ্মিগুলো স্বয়ং এই সব করতে পারে না।

12.6 মূল কণাগুলোর গঠন

বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞান এপর্যন্ত মূল কণাগুলোর (যেমন ইলেকট্রন, কোয়ার্ক, ফোটন আদি) গঠন কোনো প্রযুক্তির মাধ্যমেই জানতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে হয়তো খুব কমই জানতে পারবে। অন্যদিকে, বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে মূল কণাগুলোর গঠন নিম্নরূপ হয় —

1. তেজস্বী কণা (লেপটনস) -এর অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম মন এবং বাক্ তত্ত্বের স্তর থাকে, পুনরায় প্রাণাদি দশ প্রাণের, পুনরায় ছন্দ রশ্মির ঘনীভূত রূপের, পুনরায় ছন্দ রশ্মির তেজস্বী আবরণের এবং পরিশেষে সেগুলোর উপর মন, বাক্, সূত্রাত্মা বায়ু এবং প্রাণাদি দশ প্রাণের নিরন্তর বর্ষণ হতে থাকে। ছন্দ রশ্মির আবরণের জন্য সেই কণা তেজস্বী হয়।
2. প্রকাশাণু (ফোটন)-এর কাঠামোতে বাইরের ছন্দ রশ্মির আবরণ বেশি থাকে এবং ঘন ছন্দ

---

[5] যদি এগুলোর ওপর গবেষণা করা হয়, তবে ভবিষ্যতে এই শব্দ তরঙ্গগুলো খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

রশ্মির আবরণ খুব পাতলা হয়, এই কারণে এদের দ্রব্যমান খুব কম এবং প্রকাশ অধিক হয়।

3. এর পাশাপাশি কিছু কণা এমন হয় যা কম আলোকিত হয়। এদের কাঠামোতে বাইরের ছন্দ রশ্মির আবরণ থাকে না। এই কণাগুলো অল্প আলোকিত হলেও ডার্ক ম্যাটার বা ডার্ক এনার্জির কণা নয়।

বর্তমান বিজ্ঞানের লেপটন (তেজস্বী কণা), ফোটন (প্রকাশাণু) এবং কোয়ার্ক (অল্প আলোকিত কণা)-এর গঠন নিচের চিত্র অনুযায়ী হতে পারে —

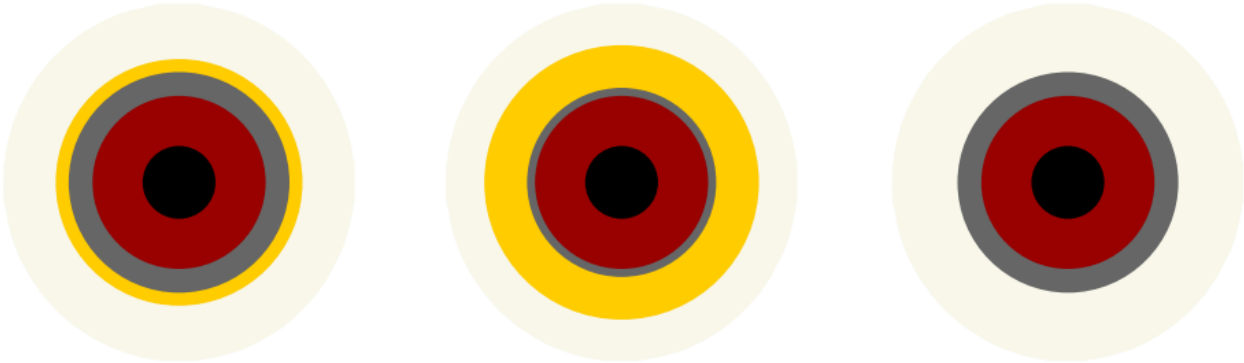

তেজস্বী কণা প্রকাশাণু অল্প প্রকাশিত কণা

12.7 কণাসমূহের নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণন

বিভিন্ন দৃশ্যমান কণা এবং জগৎ তিন প্রকারের গায়ত্রী রশ্মি দ্বারা আবৃত থাকে এবং সেই রশ্মিগুলোর সাথে সেই কণা বা জগতের চারপাশে বিদ্যমান আকাশ তত্ত্বও কিছুটা সংকুচিত হয়ে সেই জগৎ বা তরঙ্গগুলোকে বিশেষভাবে আবৃত করে নেয়। এই তিনটি ছন্দ রশ্মিরই উৎপত্তি প্রাণ নামক প্রাণতত্ত্ব থেকে হয়। এই রশ্মিগুলোর সাথে আরও কিছু রশ্মি এবং আকাশ তত্ত্বের প্রভাবে সেই কণা ও জগৎসমূহ নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণন করার জন্য প্রেরিত হয়। এর পাশাপাশি সেই রশ্মিগুলোর আবরণও সেই জগৎ বা কণাগুলোর চারপাশে পরিধি রূপে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রক্রিয়ার প্রভাবে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলও আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

12.8 কণাসমূহের সংযোগ প্রক্রিয়া

এই সৃষ্টিতে প্রত্যেক মূলকণা, অণু, আয়ন বিভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম রশ্মি দ্বারা ছয়টি স্তরে আচ্ছাদিত থাকে। এদের মধ্যে কিছু পদার্থ এই কণাগুলোর ভেতরে এবং বাইরে উভয় স্থানেই বিদ্যমান থাকে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সব পদার্থই কণাগুলোর ভেতরে ও বাইরে উভয় স্থানেই প্রভাবশালী থাকে। যখন এই কণাগুলো অন্য কোনো কণার সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে

ডার্ক এনার্জির সূক্ষ্ম রূপ উৎপন্ন হয়ে বিকর্ষণ বল তৈরি করার চেষ্টা করে। সেই সময় উভয় কণার মধ্যবর্তী ছয় স্তরের পদার্থ অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথমে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র বিক্ষুব্ধ হয়ে অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মিতে প্রবেশ করে এবং সেই সময় বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের লক্ষণগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। এই কারণেই যখন ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আবেশযুক্ত দুটি কণা একে-অপরের সাথে যুক্ত হয়, তখন তাদের উভয় প্রকার আবেশ লুপ্ত হয়ে বিদ্যুৎ-আবেশ বিহীন নতুন কণার জন্ম দেয়। এর পরবর্তী ধাপে বিদ্যুৎকে নিজের মধ্যে শুষে নেওয়া অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মিগুলো সূক্ষ্ম মরুৎ রশ্মিতে বিলীন হয়ে যায়। এই মরুৎ রশ্মিগুলোর মধ্যে 'হিম্' রশ্মিও বিদ্যমান থাকে। এই সময়ে অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মির লক্ষণগুলোও সমাপ্ত হয়ে যায়। এরপর 'হিম্' রশ্মিযুক্ত সোম রশ্মিগুলো কণার মধ্যে বিদ্যমান বৃহতী, ত্রিষ্টুপ এবং জগতী, যা 'স্বঃ' রশ্মিযুক্ত থাকে, তাতে বিলীন হয়ে নিজের লক্ষণ ত্যাগ করে। এর পশ্চাৎ সেই বৃহতী আদি রশ্মিগুলো 'ভূঃ' রশ্মি দ্বারা সম্পন্ন গায়ত্রী ছন্দ রশ্মিতে বিলীন হয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এই গায়ত্রী ছন্দ রশ্মিগুলোই ডার্ক এনার্জির সূক্ষ্ম প্রভাবকে নষ্ট করে। এইভাবে ডার্ক এনার্জির বিকর্ষণ প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। সবশেষে এই গায়ত্রী রশ্মিগুলোও 'ভুবঃ' রশ্মিযুক্ত বিভিন্ন প্রাথমিক প্রাণ রশ্মিতে বিলীন হয়ে যায়, যেখানে ডার্ক এনার্জির আর কোনো প্রভাব থাকে না। এইভাবে দুটি কণা অথবা তরঙ্গাণুর মধ্যে অথবা এদের স্বয়ংয়ের পারস্পরিক (যেমন একটি কণার সাথে অন্য একটি কণার এবং তরঙ্গাণুর সাথে তরঙ্গাণুর) সংযোগ কোনো বাধা ছাড়াই সম্পন্ন হয়। সংযোগ প্রক্রিয়ার এমন গভীর ও সূক্ষ্ম রহস্যকে বর্তমান বিজ্ঞান একেবারেই জানে না।

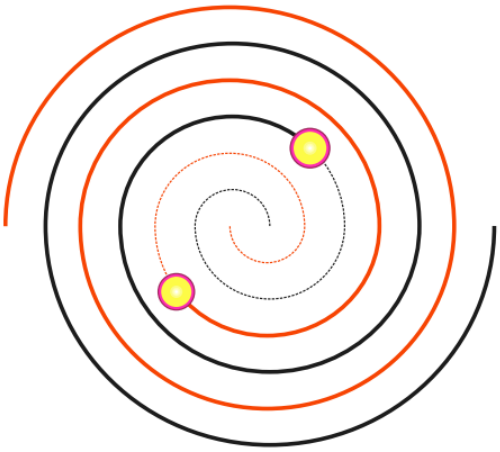

দুটি কণার ঘূর্ণন করতে থাকা সংযোগ

যখন দুটি কণা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে যায়, তখন তারা সরাসরি সংযুক্ত না হয়ে একে অপরের চারদিকে ঘোরে এবং কম্পিত হতে-হতে সংযুক্ত হয়। যখন এই কণাগুলো একে-

অপরের খুব কাছে আসে, তখন তাদের মাঝখানে অপ্রকাশিত ঊর্জা বাধক রূপে উপস্থিত হয়, যার ফলে ওই কণাগুলোর গতি হঠাৎ থেমে যায়।

মনে রাখবেন যে, প্রাণ এবং অপান আদির গতিকে অপ্রকাশিত ঊর্জা, যা সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকে, তাকে বাধিত করতে পারে না। প্রাণ ও অপান থেকে উৎপন্ন সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ সেই ডার্ক ঊর্জাকে নষ্ট বা নিয়ন্ত্রণ করে ওই কণাগুলোর সামনে এগিয়ে চলে এবং তাদের একটি নিরাপদ পথও প্রদান করে। সেই নিরাপদ পথে ওই কণাগুলো পরস্পরের দিকে গতিশীল হয়। প্রত্যেক সংযোগকারী কণার সাথে বিদ্যুৎ ধনাত্মক, ঋণাত্মক অথবা উদাসীন আবেশ অবশ্যই থাকে। এই আবেশই উভয় কণাকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন এই দুটি কণা কাছাকাছি আসে, তখন তাদের মধ্যে উপস্থিত আকাশ তত্ত্ব এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্র কিছুটা বিস্তৃত হয়। এর ফলে উভয় কণা একে-অপরের থেকে প্রসারিত বিদ্যুৎ তরঙ্গ গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অপ্রকাশিত ঊর্জা তরঙ্গ থেকে মুক্ত হতে থাকে।

সংযুক্ত হতে যাওয়া দুটি কণার পরস্পর বিপরীত মেরুই সংযুক্ত হয়। যখন দুটি কণা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে একটি কণা অতি সক্রিয় এবং গতিশীল হয়। সেটি নিজের উত্তর মেরুর দিকে তীব্রভাবে ছুটতে থাকা অবস্থায় তার সামনে বিদ্যমান অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় কণার দক্ষিণ মেরুর সাথে সংযুক্ত হয়। এই সময় উভয় কণার ছন্দ রশ্মিগুলো সংযুক্ত হতে থাকে। যখন দুটি কণা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়, তখন তারা নিজেদের চারপাশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরণের সূক্ষ্ম রশ্মিকেও নিজেদের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। এভাবে উভয় কণার সংযোগ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলে।

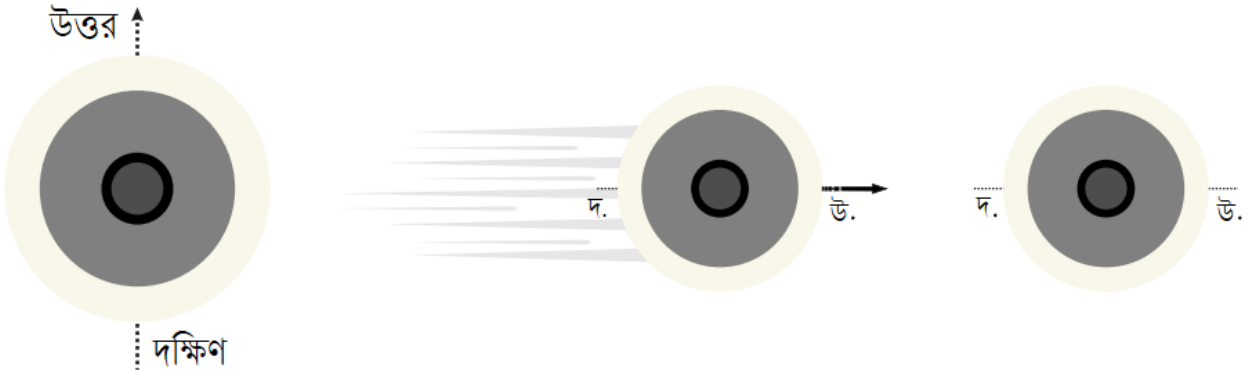

কণাগুলোর বিপরীত মেরুর দিক থেকে সংযুক্ত হওয়া

যখন কোনো তরঙ্গাণু কোনো ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াস আদি থেকে নির্গত বা সংযুক্ত হয়, তখন আরও তিনটি গায়ত্রী রশ্মিও তার সাথে সংযুক্ত হয়। সেই সময় তরঙ্গাণু এবং ইলেকট্রন

আদির মধ্যে এই রশ্মিগুলো ঘাড়ের মতো আকৃতি তৈরি করে অর্থাৎ আকাশ তত্ত্ব সংকুচিত হয়ে চিত্রানুসারে আকৃতি ধারণ করে। সেই আকৃতির মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম রশ্মি উপস্থিত থাকে, যা ডার্ক এনার্জির প্রতিরোধী বা বিকর্ষণমূলক প্রভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই গায়ত্রী রশ্মিগুলো ইলেকট্রনাদি এবং তরঙ্গাণুকে এমন বল প্রদান করে, যাতে তারা একে-অপরের সাথে যুক্ত বা বিযুক্ত হওয়ার সামর্থ্য লাভ করে। এরপর ঘাড়ের মতো আকৃতি মুছে যায় এবং সংযোগ বা বিয়োগ সম্পন্ন হয়।

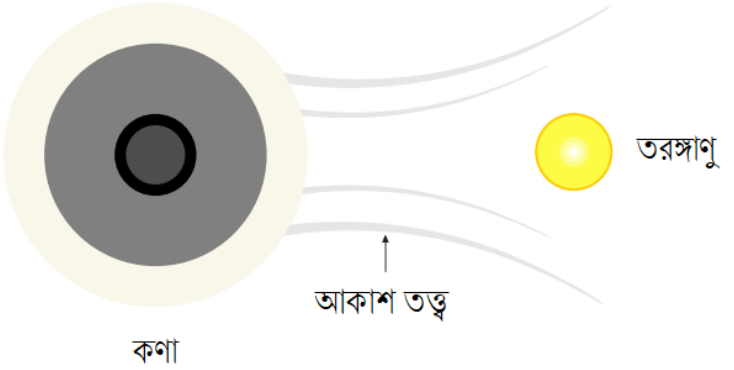

কণা ও তরঙ্গাণুর সংযোগ প্রক্রিয়া

যখন কোনো বড় অণু তৈরি হয়, তখন তার প্রক্রিয়া হল — সর্বপ্রথম কেবল দুটি আয়নের সংযোগ ঘটে এবং সেই সংযোগেও অনেক সূক্ষ্ম রশ্মির অংশগ্রহণ থাকে। এরপরও সেই দুটি সংযুক্ত আয়ন অতৃপ্ত থেকে নিজের কাছে বিদ্যমান অন্য আয়ন ও রশ্মিকেও ধীরে-ধীরে এবং ক্রমশঃ আকর্ষণ করতে থাকে আর এইভাবে বড়-বড় অণু তৈরি হয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, যেকোনো বড় অণু হঠাৎ করে অনেকগুলো আয়নের সাথে একসাথে যুক্ত হয়ে কখনোই তৈরি হতে পারে না, বরং এটি তৈরির একটি ক্রমবদ্ধ প্রক্রিয়া থাকে।

12.9 সৃষ্টির সর্বাধিক গতিশীল তত্ত্ব

সমগ্র সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি গতি ধনঞ্জয় নামক সূক্ষ্ম প্রাণের হয়। এদের গতি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের গতির তুলনায় চার গুণ বেশি হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমান ভৌতিকী সকল তরঙ্গের গতি আলোর গতির সমান বলে মনে করে। এই ধনঞ্জয় রশ্মিগুলোই সকল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গকে বহন করে নিয়ে যায়। এর পর কম গতি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গেরই হয়। বর্তমান বিজ্ঞান এদের গতিকে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বলে মনে করে, যা শূন্যস্থানে প্রায় 3 লক্ষ কি.মি. প্রতি সেকেন্ড ধরা হয়।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা সিদ্ধান্ত অনুসারে, এর চেয়ে বেশি গতি কোনো পদার্থের পক্ষেই সম্ভব নয়। কোনো কণা হয়তো এর চেয়ে বেশি গতি অর্জন করতে পারে না,

কিন্তু এই উভয় থেকে সূক্ষ্ম ধনঞ্জয় প্রাণ তত্ত্ব এর চেয়ে বেশি গতিযুক্ত হয়।

যখন এই ধনঞ্জয় প্রাণ ইলেকট্রন আদি সূক্ষ্ম কণা বা তরঙ্গাণুসমূহকে নিজের সাথে গতিশীল হয়, তখন সেগুলো সেই কণা বা তরঙ্গাণুসমূহের তুলনায় ঠিক সেভাবেই অধিক গতিশীল থাকে, যেভাবে ধূলিকণা বা খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বাতাস সেই ধূলিকণা বা খড়কুটোর চেয়ে বেশি গতিশীল হয়। বর্তমান বিজ্ঞান কোনো প্রযুক্তির মাধ্যমেই ধনঞ্জয় আদি প্রাণসমূহকে দেখতে পাবে না। এই কারণে বর্তমান বিজ্ঞানের পক্ষে এর গতি সম্পর্কে কোনো ধারণা থাকা সম্ভব নয়।

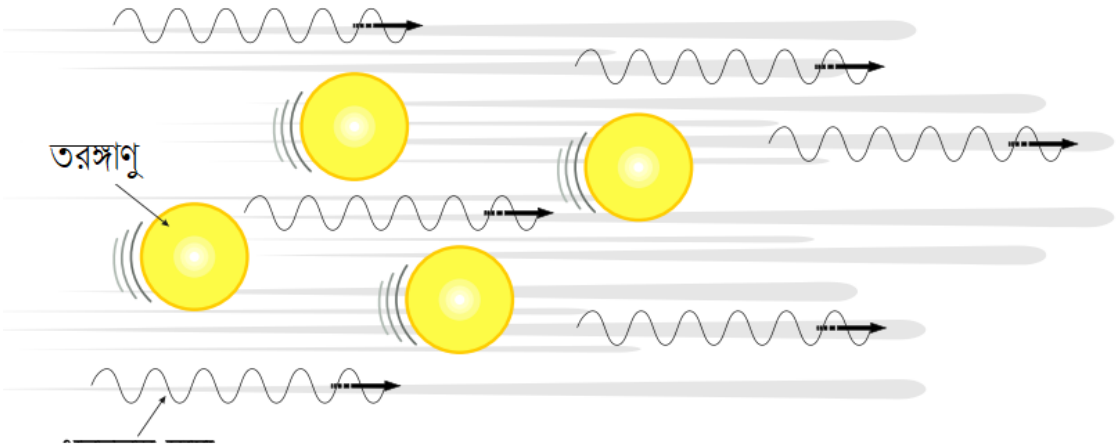

ধনঞ্জয় প্রাণ দ্বারা তরঙ্গাণুসমূহকে টেনে নিয়ে যাওয়া

বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল এবং প্রবল নাভিকীয় (পারমাণবিক) বলের মধ্যে, ধনাত্মক আবেশযুক্ত কণাগুলো থেকে যে ধনঞ্জয় প্রাণ রশ্মি নির্গত হয়, তাদের গতি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বা বর্তমান বিজ্ঞান কল্পিত মধ্যস্থ কণার (মিডিয়েটর পার্টিকল) তুলনায় বেশি হয়। তৃতীয় দ্রুত গতি, যা উপরোক্ত দুই গতির চেয়ে কিছুটা কম, তা হল প্রাণ-অপান বা প্রাণোদানের গতি। এই সূক্ষ্ম প্রাণ যুগ্ম বিভিন্ন কণা বা তরঙ্গাণুর সাথে যুক্ত থেকে তাদের ভেতরে ও বাইরে ক্রমাগত চক্রাকারে প্রবাহিত হতে থাকে। এদের গতি ঐ কণা বা তরঙ্গাণুর গতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে না, বরং তারা সেই কণা বা তরঙ্গাণুসমূহকে বল ও তেজ প্রদান করতে থাকে। এদের গতি সব ধরণের কণার তুলনায় কিছুটা বেশি হয়। এরপর সমস্ত প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত পদার্থের কণাগুলোর গতি হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিকল্পিত ডার্ক ম্যাটার এবং ইলেকট্রন আদি প্রকাশিত কণাগুলোর গতি এদের মধ্যে সবচেয়ে কম হয়।

12.10 জ্ঞাত সৃষ্টির সর্বাধিক ভেদন-ক্ষমতাসম্পন্ন কণা

এই সৃষ্টিতে নিউট্রিনোর মতো এমন কিছু কণা আছে, যাদের ভেদন ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল

হয়। এই কণাগুলো পৃথিবী আদি গ্রহকে অনায়াসেই ভেদ করে চলে যায়। এই কণাগুলো গ্রহ আদি লোকের কেন্দ্রতেও উৎপন্ন হয়। সেগুলো সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে সূর্যাদি নক্ষত্রের কেন্দ্র পর্যন্ত নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে, তথা সূর্য আদির কেন্দ্রে উৎপন্ন হতে চলা নিউট্রিনো পৃথিবী আদি লোককে কোনো বাধা ছাড়াই ভেদ করে চলে যায়। এই কণাগুলো অন্য কণার প্রতি পারস্পরিক ক্রিয়া সাধারণত করে না, এই কারণেই এদের ভেদন ক্ষমতা অত্যন্ত তীব্র এবং এদের যাত্রা অত্যন্ত সহজ হয়। এই বিস্ময়কর শক্তির মূল কারণ হল, এইরূপ কণা দুটি অনুষ্টুপ্ ছন্দরূপ তরঙ্গের সাথে যুক্ত বা আবৃত হয়ে যাত্রা করে। এই অনুষ্টুপ্ ছন্দ তরঙ্গের মধ্যে মোট ৬৪টি মনস্ বা অহংকার রশ্মি যাত্রার সময় নিরন্তর বিভিন্ন অন্য ছন্দরূপ তরঙ্গকে উৎপন্ন করে এবং বাক্ তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করতে থাকে, যার ফলে এদের যাত্রাপথে আসা প্রতিটি বাধা ও আকর্ষণকে নিষ্ক্রিয় করতে থাকে অথবা সেই অবরোধ ও আকর্ষণকে সেগুলো নতুন উৎপন্ন ছন্দরূপ প্রাণ-রশ্মিগুলো নিজেদের দিব্য কবচ দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখে এবং সেই কণা অর্থাৎ নিউট্রিনো আদি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সবাইকে ছাড়িয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলে।

12.11 কণার চারদিকে সূক্ষ্ম রশ্মির আবরণ

এই সৃষ্টিতে বিদ্যমান বিভিন্ন কণা ও তরঙ্গাণু সর্বদা সূক্ষ্ম রশ্মি দ্বারা আবৃত থাকে। বিভিন্ন অণু, পরমাণু, আয়নও বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ আদি দ্বারা আবৃত থাকে। এর পাশাপাশি সেগুলো সেই তরঙ্গগুলোর মাধ্যমেই গতিশীল ও ক্রিয়াশীলও হয়। এই তরঙ্গগুলোতে অনেক স্তর থাকে। সূক্ষ্ম তরঙ্গগুলো সর্বদা স্থূল তরঙ্গকে আবৃত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এই তরঙ্গগুলোতে ক্রমশঃ ছন্দ রশ্মি, প্রাণ রশ্মি এবং শেষে 'ওম্' ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে। যখন দুই বা ততোধিক কণার সংযোগ ঘটে, তখন সেই সংযোগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম আচ্ছাদনকারী রশ্মি থেকে শুরু করে অপেক্ষাকৃত স্থূল রশ্মির মধ্য দিয়ে কণা পর্যন্ত পৌঁছায়। যখন এদের বিয়োগ ঘটে, তখনও এই একই ক্রম বজায় থাকে। যদি এই আচ্ছাদনকারী রশ্মিগুলো কোনোভাবে সরে যায়, তবে সেই কণাগুলোকে ডার্ক ঊর্জা আবৃত করে ফেলে, যার ফলে সেই কণাগুলোর মধ্যে সংযোগ, সংলয়ন আদি প্রক্রিয়া আর হতে পারে না। এর পাশাপাশি এটাও কখনও সম্ভব নয় যে, কোনো দুটি কণা এই আবরণকারী রশ্মি ছাড়াই পরস্পর সংযোগ বা সংলয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে।

এইভাবে আমি এই অধ্যায়ে মূলকণা এবং তরঙ্গাণুর স্বরূপ ও উৎপত্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি, যা বর্তমান ভৌতিকীর তুলনায় অধিক গম্ভীর ও সূক্ষ্ম তথ্যকে উপস্থাপন করে।

স্মরণীয় তথ্য

1. ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন কণা সুতোর (সূত্রের) মতো কম্পনশীল সূক্ষ্ম অবয়বের ঘন রূপ হয়ে থাকে।
2. বিভিন্ন প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির মিশ্রণকে বায়ু বলা হয়, যা সর্বত্র প্রায়একরস হয়ে বিরাজমান থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় একে ভ্যাকুয়াম উর্জা বলা যেতে পারে।
3. 'ওম্' ছন্দ-রশ্মিগুলো সূত্রাত্মা বায়ু, নিবিদ্ (মাস) এবং বৃহতী ছন্দ আদি রশ্মিকে প্রেরিত করে বায়ু তত্ত্বে অসংখ্য স্থানে ঘূর্ণন সৃষ্টি করে।
4. কণার তুলনায় তরঙ্গাণুর মধ্যে রশ্মির ঘনত্ব ও পরিমাণ কম থাকে।
5. যখন সংকোচনকারী প্রাণ-রশ্মিগুলো সংকোচনযোগ্য রশ্মির তুলনায় দুর্বল হয়, তখন সংকোচন প্রক্রিয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন সেগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, তখন তীব্র সংকোচনের মাধ্যমে মূল কণাকে উৎপন্ন করে।
6. যখন সংকোচনকারী রশ্মিগুলো সংকোচনযোগ্য রশ্মির চেয়ে শক্তিশালী হয় কিন্তু খুব বেশি শক্তিশালী নয়, তখন তরঙ্গাণুর সৃষ্টি হয়।
7. যেকোনো কণা হল প্রাণাদি সূক্ষ্ম রশ্মিযুক্ত পদার্থের অপেক্ষাকৃত ঘন ও সংকুচিত রূপ, যা চারপাশ থেকে একটি সীমানা দ্বারা ঘেরা থাকে। এই আবরণ সূত্রাত্মা বায়ু আদি রশ্মি দিয়ে গঠিত হয়।
8. ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান প্রাণ ও বাক্ রশ্মির মিশ্রিতরূপ বায়ু তত্ত্ব যখন আকাশ তত্ত্ব দ্বারা আবৃত হয়ে সংকুচিত ও ঘনীভূত হয়ে জ্বলতে শুরু করে, তখন তাকে বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের প্রকাশাণু (ফোটন) বলা হয়।
9. প্রকাশাণু সূত্রাত্মা বায়ু দ্বারা আবৃত অবস্থায় ধনঞ্জয় প্রাণ-রশ্মির মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলাচল করে।
10. দুটি অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি, যা বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে, সেগুলো অন্য একটি তৃতীয় ছন্দ রশ্মির সাথে যুক্ত হয়ে একটি ত্রিক গঠন করে।
11. একটি ত্রিক উষ্ণিক্ এবং বৃহতী ছন্দ-রশ্মির অন্য কোনো ছন্দ-রশ্মির দুই প্রান্তে পৃথকভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে গঠিত হয়। এই ত্রিক জন্ম নিলে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মধ্যে তরঙ্গাণু ও মূলকণা সৃষ্টি হতে শুরু করে।

12. বিভিন্ন দৃশ্যমান কণা ও লোক তিন প্রকারের গায়ত্রী রশ্মি দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই রশ্মির প্রভাবেই কণা ও লোক নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণন করার জন্য প্রেরিত হয়।

13. এই সৃষ্টিতে প্রতিটি মূলকণা, অণু ও আয়ন বিভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম রশ্মি দ্বারা ছয়টি স্তরে আচ্ছাদিত থাকে।

14. যখন দুটি কণা পরস্পর সংযুক্ত হওয়ার মতো হয়, তখন তারা সরাসরি সংযুক্ত না হয়ে একে অপরের চারদিকে ঘোরে এবং কম্পন সৃষ্টি করে সংযুক্ত হয়।

15. সংযুক্ত হতে যাওয়া দুটি কণার পরস্পর বিপরীত মেরুই কেবল সংযুক্ত হয়।

16. যখন দুটি কণা পরস্পর মিলিত হয়, তখন তাদের মধ্যে একটি কণা অতি সক্রিয় ও গতিশীল হয়।

17. যখন কোনো তরঙ্গাণু কোনো ইলেকট্রন ও নাভিক (নিউক্লিয়াস) আদি থেকে নির্গত বা সংযুক্ত হয়, তখন সেই সময় তরঙ্গাণু ও ইলেকট্রনাদির মধ্যবর্তী আকাশ তত্ত্ব সংকুচিত হয়ে ঘাড়ের মতো আকৃতি ধারণ করে।

18. যেকোনো বড় অণু হঠাত্ করেই অনেক আয়নের একসাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলে কখনও নির্মিত হতে পারে না, বরং তার নির্মাণের একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া থাকে।

19. সমস্ত সৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি গতি ধনঞ্জয় নামক সূক্ষ্ম প্রাণের হয়। এদের গতি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বলের তরঙ্গের গতির তুলনায় চার গুণ বেশি হয়।

20. সূক্ষ্ম তরঙ্গ সবসময় নিজের থেকে স্থূল তরঙ্গগুলোকে আচ্ছাদিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

অনুশীলনী

1. বর্তমান এবং বৈদিক ভৈতিকীর দৃষ্টিতে ভ্যাকিউম এনার্জির ব্যাখ্যা করুন।

2. বর্তমান বিজ্ঞানে মূলকণা হিসেবে বিবেচিত কণাগুলো তৈরির প্রক্রিয়া কী ?

3. প্রকাশাণু (ফোটন) তৈরির প্রক্রিয়া কী ?

4. বৈদিক ভৈতিকীর দৃষ্টিতে তিন প্রকার মূলকণার কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য কী ?

5. সূক্ষ্ম কণা কেন নিজের অক্ষের ওপর ঘোরে ?

6. দুটি কণার সংযোগের ছয়টি স্তরের প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে বলুন।

7. সকল মূলকণার নির্মাণ বেদ মন্ত্র থেকে হয়েছে — এই উক্তিটি প্রমাণ করুন।

8. আলোর অতি তীব্র গতির কারণ কোন পদার্থ এবং সেই পদার্থের গতি কত ?

9. ত্রিক কী? মূলকণা ও প্রকাশাণু তৈরির ক্ষেত্রে ছন্দের ত্রিক কীভাবে গঠিত হয় ?

10. প্রলয়কালে কিসের কিসের অস্তিত্ব বজায় থাকে ?

11. ফোটন (প্রকাশাণু) ও তেজস্বী (লেপ্টন) কণার কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য কী ?

12. সূক্ষ্ম কণাগুলোর কেন নির্দিষ্ট আকার থাকে না ?

13. কণা (পার্টিকল) এবং তরঙ্গাণু (কোয়ান্টা)-র মধ্যে পার্থক্য কী ?

* * * * *

13 অধ্যায়

ঊর্জা

বর্তমানে সংসার প্রচুর পরিমাণে ঊর্জার ব্যবহার করছে, কিন্তু আমরা এখনও এর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ আছি। বিজ্ঞান ঊর্জার অনেক রূপকে স্বীকার করে, যেমন — স্থিতিজ ঊর্জা, গতিজ ঊর্জা, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ঊর্জা, ডার্ক এনার্জি, ভ্যাকিউম এনার্জি, ধ্বনি, উষ্মা আদি। এই ঊর্জাগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একে-অপরের মধ্যে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই রূপান্তরের ক্রিয়াবিজ্ঞান কী, তা বর্তমান বিজ্ঞানে স্পষ্ট নয়। এই পরিবর্তনের কারণ কী, তাও বিজ্ঞান জানে না। বস্তুত, যতক্ষণ ঊর্জার স্বরূপ ও গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে না, ততক্ষণ এর ক্রিয়াবিজ্ঞান জানাও অসম্ভব।

13.1 ঊর্জার স্বরূপ

আসুন, এবার আমরা 'ঊর্জা' সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টিতে বিচার করি। বৈদিক বিজ্ঞানে বল ও প্রাণ যুক্ত পদার্থকেই ঊর্জা বলা হয়।

1. বল হল সেই গুণ, যা কোনো পদার্থের ধারণ ও পোষণ করে।
2. বল কোনো পদার্থের ভেতরে আত্মারূপে বিচরণ করে।
3. সকল প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি বলরূপ হয়।
4. বলের কারণে পদার্থ একে-অপরের দিকে গতিশীল হয়, বিশেষ করে আকর্ষণ বলের কারণে এবং বিকর্ষণ বলের কারণে একে-অপরের থেকে দূরে সরে যায়।

এইভাবে ঊর্জা হল সেই পদার্থ, যার কারণে বিভিন্ন পদার্থ ধারণ করা হয় বা গতিশীল হয়। এর পাশাপাশি ঊর্জার কারণেই পদার্থের অস্তিত্ব বজায় থাকে বা সার্থক হয়। এই ঊর্জা মূলত চেতন তত্ত্বের দ্বারা প্রকৃতিরূপী জড় পদার্থে উৎপন্ন হয়। জড় জগতে এটি 'ওম্' রশ্মি ও মনস্তত্ত্বের রূপে উৎপন্ন হয়। এরপর প্রাণ ও ছন্দ বা মরুৎ আদি রশ্মির রূপে বৈদিক স্বরূপযুক্ত ঊর্জা উৎপন্ন হয়। বর্তমান ভৌতিকী দ্বারা জ্ঞাত বা ব্যবহৃত ঊর্জার সাথে এই ঊর্জার তুলনা করা সম্ভব নয়। প্রাণ এবং মরুৎ বা ছন্দ রশ্মির যুগ্মই হল বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিচিত ঊর্জার উৎপত্তির মূল কারণ।

এখন আমরা বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা পরিচিত কিছু ঊর্জার বিষয়ে ক্রমশঃ বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করবো —

1. স্থিতিজ ঊর্জা — প্রতিটি কণা বা পিণ্ড বিভিন্ন ছন্দ, মরুৎ ও প্রাণ রশ্মির মিলনে উৎপন্ন হয় তথা সেই রূপেই বিদ্যমান থাকে, তা সে গতিশীল হোক বা স্থির। সেগুলোতে এই রশ্মিগুলো ঘনীভূত রূপে বিদ্যমান থাকে। এগুলোর অভাবে সেই কণা, তরঙ্গাণু বা পিণ্ডের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। সেই কণা বা পিণ্ডকে সূত্রাত্মা বায়ু ও বৃহতী ছন্দ রশ্মি সব দিক থেকে আবৃত করে রাখে অথবা এই রশ্মিগুলোই প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মিকে ঘনীভূত করে সেই কণা বা পিণ্ডকে উৎপন্ন করার জন্য উত্তরদায়ী হয়। যেকোনো কণা বা পিণ্ড সর্বদা সেই অবস্থায় থাকতে চায়, যার মধ্যে রশ্মিগুলোর মাঝে ন্যূনতম পারস্পরিক ক্রিয়া বা টান থাকবে।

বিরাম অবস্থায় কোনো কণা বা পিণ্ডের সব দিকে প্রাণ ও অপান রশ্মিও বিদ্যমান থাকে, যার মধ্যে অপান রশ্মি তার ভেতরের দিকে এবং প্রাণ রশ্মি বাইরের দিকে স্পন্দিত হতে থাকে। যখন সেই কণা বা পিণ্ডের উপর কোনো বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই বল প্রয়োগকারী কারক ওই পিণ্ডতে ঊর্জার সঞ্চার করে। এই ঊর্জা সেই কণা বা পিণ্ডতে সঞ্চিত হয়ে তাতে বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির বিন্যাসকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে। এটিকে এই চিত্রের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করুন।

স্থির পিণ্ড **গতিশীল পিণ্ড**

যখন আমরা কোনো স্প্রিংকে টানি বা চাপ দিই অথবা কোনো পাথরকে হাত দিয়ে উপরে তুলি, তখন সেই স্প্রিং বা পাথরের ভেতরে বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দ রশ্মির বিন্যাস প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয়। যখন আমরা স্প্রিংটিকে ছেড়ে দিই, তখন তার ভেতরে বিদ্যমান প্রাণ বা ছন্দাদি রশ্মির বিন্যাস পুনরায় নিজের পূর্বের রূপ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে স্প্রিংয়ের

মধ্যে কম্পন তৈরি হয়। অন্যদিকে যখন আমরা পাথরকে হাত থেকে নিচে ফেলে দিই, তখন পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণ বল তাকে নিচের দিকে আকর্ষণ করতে শুরু করে অর্থাৎ সেই পিণ্ডের উপর বল প্রযুক্ত হয়। এর ফলে ওই পিণ্ডের ভেতরে ও বাইরের রশ্মি-বিন্যাস পুনঃ প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হতে থাকে। এতে তার স্থিতিজ ঊর্জা গতিজ ঊর্জাতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে।

2. গতিজ ঊর্জা — যখন আমরা কোনো পাথরকে নিচে ফেলি অথবা কোনো পাথর ছুঁড়ে মারি, সেই সময় ওই পাথরের উপর পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণ বল বা পৃথিবীর গুরুত্ব বলের সাথে-সাথে আমাদের প্রক্ষেপক বলও কাজ করে। এর ফলে সেই পাথরের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন ছন্দ ও প্রাণাদি রশ্মির বিন্যাস পরিবর্তিত হতে শুরু করে। আমার দৃষ্টিতে এই উভয় পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত প্রভাবগুলো দেখা যায় —

(অ) যখন পাথরটি নিচের দিকে পড়ে, তখন পৃথিবীর দ্রব্যমান ও গুরুত্বাকর্ষণ বল রূপে বিদ্যমান প্রাণ রশ্মি ও ত্রিষ্টুপ ছন্দাদি রশ্মি পাথরের মধ্যে থাকা অপান রশ্মিগুলোকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে শুরু করে। এর ফলে যে অপান রশ্মিগুলো পাথরের ভেতরের দিকে স্পন্দিত হচ্ছিল, সেগুলো গুরুত্ব বলের দিকে উন্মুখ হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে। অপান রশ্মিগুলো ক্রিয়া প্রধান হওয়ার কারণে সেই পাথর পৃথিবীর দিকে গতিশীল হয়। পাথরটি যত পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে থাকে, পাথরের অপান রশ্মিগুলোর প্রতি পৃথিবীর প্রাণ ও ত্রিষ্টুপ রশ্মির আকর্ষণের গুণ তত বাড়তে থাকে। এই কারণেই পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণ বল ওই পাথরের মধ্যে ত্বরণ সৃষ্টি করে, যার ফলে পাথরটি সমান গতিতে না পড়ে ক্রমবর্ধমান গতিতে নিচে পড়ে। বর্তমান বিজ্ঞান এই ক্রিয়াবিজ্ঞান বুঝতে পারেনি।

(ব) যখন আমরা সেই পাথরটিকে কোনো নির্দিষ্ট দিকে ছুঁড়ি, তখন আমাদের হাতের প্রক্ষেপক বল পাথরের বাইরে ও ভেতরে বিদ্যমান রশ্মি-বিন্যাসকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করতে শুরু করে। আমাদের প্রক্ষেপক বলের মধ্যে অপান রশ্মির প্রধান্য থাকে। এর ফলে পাথরের রশ্মি-বিন্যাস এমন হয়ে যায় যে, পাথরের ভেতরের দিকে স্পন্দিত অপান রশ্মিগুলো প্রক্ষেপক বলের অভিমুখে স্পন্দিত হতে শুরু করে। এই কারণে পাথরটি সেই দিকে গতিশীল হয়। এটি গতিশীল থাকাকালীন পৃথিবীর দ্রব্যমান ও গুরুত্বাকর্ষণ বলের প্রাণ ও ত্রিষ্টুপ্ আদি রশ্মিগুলো আগের মতোই প্রভাব দেখাতে শুরু করে, যার ফলে সেই পাথরটি একটি বর্তুলাকার (parabolic) পথ অনুসরণ করে অবশেষে নিচে পড়ে যায়।

এর জন্য নিচে দেওয়া চিত্রটি বোঝার চেষ্টা করুন —

ঊর্জার স্বরূপ

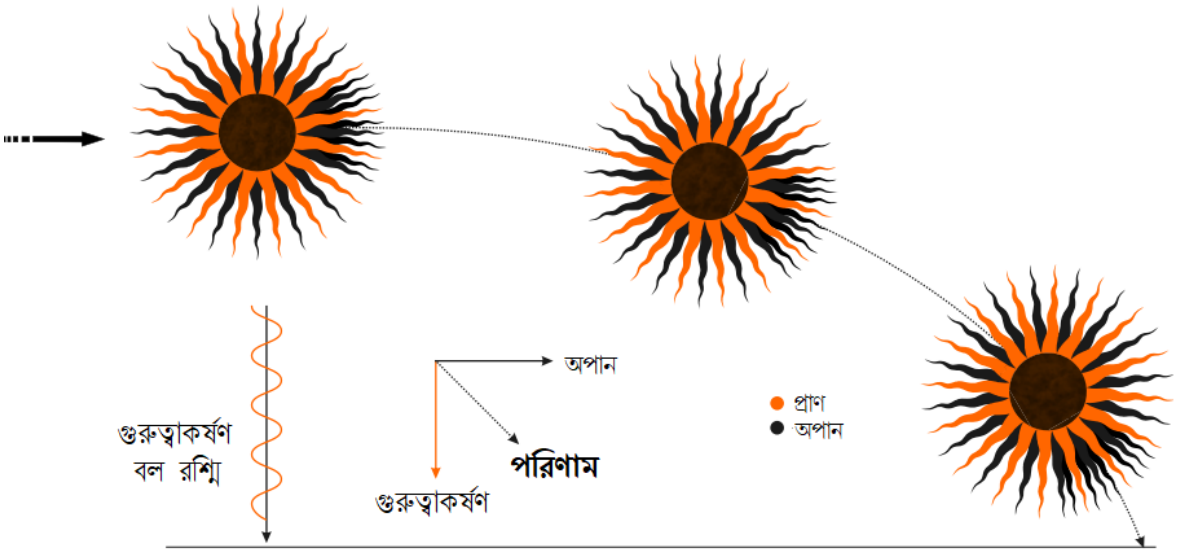

প্রক্ষিপ্ত পিণ্ডের নিচের দিকে পড়ার প্রক্রিয়া

প্রশ্ন — যখন পাথর নিচে পড়ে, তখন পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষে অথবা কোনো দেওয়ালে পাথর মারলে তাপ, আলো ও ধ্বনিও উৎপত্তি হয়। এভাবে পাথরের গতিজ ঊর্জা কীভাবে তাপ, আলো ও ধ্বনি ঊর্জাতে রূপান্তরিত হয় ?

উত্তর — আসুন, এটি এভাবে বোঝা যাক। যখন পাথর কোনো বস্তুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন ওই বস্তুর চারদিকে বিদ্যমান রশ্মিগুলোর সাথে পাথরের চারদিকে বিদ্যমান রশ্মিগুলোর সংঘর্ষ ঘটে। বিশেষ করে ওই পাথরের বাইরের অংশে স্থিত ক্রিয়াশীল অপান রশ্মিগুলো ওই বস্তুর রশ্মিগুলোর সাথে বেশি জড়িয়ে গিয়ে উভয় বস্তুরই সমস্ত রশ্মিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই বিক্ষোভ ও সংঘর্ষে কিছু রশ্মি ঘনীভূত হয়ে প্রকাশাণু রূপ ধারণ করে আলোর আকারে দেখা দেয়। কিছু রশ্মি উভয় বস্তুর অণুগুলোকে কম্পিত করে তাদের তাপ প্রদান করে, আবার কিছু ছন্দ রশ্মি একে-অপরের সাথে জড়িয়ে গিয়ে এমন বৈখরী ধ্বনির রূপ ধারণ করে, যা তীব্র ধ্বনি রূপে শোনা যায়। এই সংঘর্ষে উভয় বস্তুর ভেতরে রশ্মিগুলোর বিন্যাস এবং সূত্রাত্মা প্রাণ ও বৃহতী রশ্মিগুলোর আবরণ বিকৃত হয়ে যায়, যার ফলে ওই বস্তুগুলো ভেঙে যায় বা বিকৃত অবস্থায় দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন — আমরা কোনো পাথরের তুলনায় কম ঘনত্বের কোনো বস্তুকে সমপরিমাণ বল প্রয়োগ করা সত্ত্বেও কেন কম বেগে ছুঁড়তে পারি ?

উত্তর — আমি যেমনটি স্পষ্ট করেছি যে, কোনো পিণ্ডকে নিক্ষেপ করলে সেই পিণ্ডের ভেতরে ও বাইরে বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মিগুলোর বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তনে

অপান রশ্মিগুলোর অভিমুখ প্রক্ষেপক বলের দিকে হওয়ার কারণে তার গতি সেই দিকেই হয়। যখন পিণ্ড অধিক ঘন হয়, তখন তাতে অপান রশ্মির মাত্রা অধিক হওয়ার কারণে এবং তাদের দ্বারা প্রাণ নামক প্রাণ রশ্মিগুলোও তাদের দিকে উন্মুখ হওয়ার কারণে অধিক ঘনত্বযুক্ত পিণ্ড অধিক বেগে গতি করে। এর বিপরীতে যখন পিণ্ড হালকা হয়, তাতে প্রাণ এবং ছন্দাদি রশ্মির মাত্রা ও ঘনত্ব কম হয়, কিন্তু উভয় পিণ্ডের সমান আয়তন হওয়ার কারণে আকাশে বিদ্যমান অবরোধক রশ্মিগুলো ঠিক ততটাই থাকে, যতটা পূর্বে উল্লিখিত অধিক ঘন পিণ্ডের সামনে বিদ্যমান ছিল। এই কারণে অবরোধক বল তো উভয় পিণ্ডের ওপর সমানভাবে কাজ করে, কিন্তু আমাদের হাত দিয়ে নিক্ষেপ করার বল থেকে স্থানান্তরিত শক্তির মাত্রা কম হয়ে যায়। বস্তুতঃ কম মাত্রায় বিদ্যমান রশ্মিগুলো প্রক্ষেপক অপান রশ্মিগুলোকে কম মাত্রায় সঞ্চিত করতে পারে এবং অপান রশ্মিগুলো সেই পিণ্ডের মধ্যেও কম মাত্রায় থাকার কারণে বেগের মাত্রা ঘন পিণ্ডের তুলনায় কম হয়। একইভাবে এই হালকা পিণ্ডের সংঘর্ষে উষ্মা, ধ্বনি ও প্রভাবের মাত্রাও অপেক্ষাকৃত কম হয়।

3. ধ্বনি ঊর্জা— বর্তমান বিজ্ঞান বাণীর বৈখরী রূপকেই ধ্বনি ঊর্জা নাম দেয়। বৈদিক বিজ্ঞানের অনুসারে যেকোনো ধ্বনি পরা, পশ্যন্তী এবং মধ্যমা স্তর অতিক্রম করে বৈখরী অবস্থায় পৌঁছায়। আমি এখানে বৈখরী নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। বর্তমান বিজ্ঞান ধ্বনিকে কোনো পদার্থের চাপের রূপ হিসেবেই গণ্য করে। পদার্থ যত ঘন হয়, তাতে ধ্বনি ততটাই অধিক গতিতে প্রবাহিত হয়, কিন্তু কোনো পদার্থে চাপ উৎপন্নকারী পদার্থটি কী? যখন আমরা কথা বলি, তখন বায়ুমণ্ডলে চাপ কীভাবে সৃষ্টি হয়? বর্তমান ভৌতিকীতে এটি অজ্ঞাত আছে।

বৈদিক বিজ্ঞানের ধারণা হল, আমাদের স্বরযন্ত্র মধ্যমা ছন্দ রশ্মিগুলোকে বৈখরী-তে পরিবর্তিত করে বাইরে নির্গত করে। সেই ছন্দ রশ্মিগুলো বায়ুমণ্ডল বা অন্য কোনো পদার্থরূপী মাধ্যমে বিদ্যমান বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির সাথে যুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের গতিকেই বর্তমান বিজ্ঞান ধ্বনি তরঙ্গ বলে। যখন পদার্থ ঘন হবে, তখন তাতে ছন্দ রশ্মির ঘনত্বের কারণে চাপ ক্ষেত্র অধিক তৈরি হবে, যার ফলে তাদের গতি অধিক হবে অর্থাৎ ধ্বনি তরঙ্গের গতি অধিক হবে। যখন শূন্যস্থান হবে, তখন তাতে ছন্দ রশ্মিগুলো শূন্যে স্থিত বিরাম অবস্থায় বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মিতে সেই চাপ উৎপন্ন করতে পারে না, যা আমরা কান দ্বারা শুনতে পাই। এর কারণ হল, আমাদের কান রশ্মিগুলোর কম্পন গ্রহণ করতে পারে না, অথচ অণুগুলোর কম্পন অনুভব করতে সক্ষম হয়। এর থেকে আমাদের এই ভ্রম হয় যে, ধ্বনির জন্য কোনো

পদার্থের মাধ্যম হওয়া অনিবার্য। বস্তুতঃ এটি আমাদের কানের শোনার ক্ষমতার একটি সীমার কারণে হয়, বাস্তবে এমনটি নয়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, ধ্বনি ঊর্জা অর্থাৎ বৈখরী বাণী কোনো মাধ্যম ছাড়া চলাচল করতে পারে না। এর জন্য কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় কোনো-না-কোনো পদার্থের উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু শব্দকে আকাশের গুণ মানা হয়েছে, তাই বাণী-র জন্য এই স্থূল মাধ্যমগুলোর প্রয়োজন নেই, বরং এর স্থানই হল আকাশ। এই কারণে পশ্যন্তী ও মধ্যমা বাণীর গমন আকাশের মধ্যেও হয়, এটাই মানা উচিত। তবে হ্যাঁ, বৈখরী বাণীর গমন হয় না।

4. ভ্যাকিউম ঊর্জা — বর্তমান বিজ্ঞান এরমধ্যেই বিভিন্ন ফিল্ড কণা (Particles)-র উৎপত্তির কথা স্বীকার করে। এই কণাগুলো এখান থেকেই উৎপন্ন হয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই ঊর্জা স্বয়ং কী রূপে এবং কিসের দ্বারা নির্মিত তথা এর থেকে ফিল্ড কণাগুলো কীভাবে তৈরি হয় ? বর্তমান বিজ্ঞানের কাছে এর কোনো উত্তর নেই। আমার দৃষ্টিতে সমগ্র আকাশ সূত্রাত্মা বায়ু এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাণ, মরুৎ ও ছন্দ রশ্মির মিশ্রণে পরিপূর্ণ। রশ্মির এই মিশ্রণই হল ভ্যাকিউম ঊর্জা। দুটি সংযোগযোগ্য পদার্থ নিকটে আসলে তাদের মাঝে স্থিত ভ্যাকিউম ঊর্জা থেকে ফিল্ড কণা উৎপন্ন হয়। দুটি পদার্থ থেকে নির্গত প্রাণ, বিশেষত ধনঞ্জয় ও মরুৎ রশ্মিগুলো ভ্যাকিউম ঊর্জা রূপে বিদ্যমান প্রাণ ও মরুৎ এবং গায়ত্রী আদি ছন্দ রশ্মির মিলনে মধ্যস্থ কণা উৎপন্ন করে। বর্তমান বিজ্ঞান সেগুলোকে কাল্পনিক মনে করলেও সেগুলো কাল্পনিক নয়, তবে সেগুলোর আয়ু খুব কম হয়, এটাই সত্য।

ধ্যাতব্য হল, প্রাণ ও মরুৎ এবং প্রাণ ও ছন্দের মিলনই হল বল ও ঊর্জার রূপ। একক কোনো রশ্মি ভ্যাকিউম ঊর্জার রূপ হতে পারে না। এই ঊর্জা সমগ্র আকাশে একরস রূপে ভরা থাকে। একে ভ্যাকিউম ঊর্জা বলা হয় কারণ এটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সমগ্র শূন্যস্থানকে পরিপূর্ণ করে রাখে। সাধারণভাবে এতে কোনো উত্থান-পতন হয় না, কিন্তু যখনই দুটি কণা বা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল তৈরি করতে হয় অর্থাৎ তারা যখন একে-অপরের নিকটে আসে, তখনই তাদের মাঝে বিদ্যমান ভ্যাকিউম ঊর্জাতে উত্থান-পতন হওয়া শুরু করে। যদি এই পরিবর্তন না হতো, তাহলে আকর্ষণ-বিকর্ষণ বল বা মধ্যস্থ কণা উৎপন্নই হতো না।

5. ডার্ক ঊর্জা — এর বিষয়ে পরবর্তী অংশে অসুর ঊর্জা-র বর্ণনায় বিস্তারিত লেখা আছে। তবে হ্যাঁ, এটা নিশ্চিত যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ ও মহাবিস্ফোট থেকে সৃষ্টির শুরু করার মতো কোনো ডার্ক ঊর্জা এই ব্রহ্মাণ্ডে না তো কখনও বিদ্যমান ছিল আর না আজ আছে। বৈদিক ডার্ক এনার্জির গঠন, স্বরূপ ও এর গুণাবলি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

স্মরণীয় তথ্য

1. এই ভাবে ঊর্জা হল সেই পদার্থ, যার কারণে বিভিন্ন পদার্থ ধারণ করা হয় বা গতিশীল হয়।
2. জড় পদার্থে ঊর্জা 'ওম' রশ্মি ও মনস্তত্ত্বের রূপে উৎপন্ন হয়। এরপর প্রাণ ও ছন্দ বা মরুত্ আদি রশ্মির রূপে ঊর্জা উৎপন্ন হয়।
3. প্রত্যেক কণা বা পিণ্ড বিভিন্ন ছন্দ, মরুত্ ও প্রাণ রশ্মির মিলনে উৎপন্ন হয় এবং সেই রূপেই বিদ্যমান থাকে, তা গতিশীল হোক বা স্থির।
4. কোনো কণা বা পিণ্ডকে সূত্রাত্মা বায়ু ও বৃহতী ছন্দ রশ্মি সব দিক থেকে আবৃত করে রাখে।
5. বিশ্রাম অবস্থায় কোনো কণা বা পিণ্ডর চারপাশে প্রাণ ও অপান রশ্মিও বিদ্যমান থাকে, যার মধ্যে অপান রশ্মি তার ভেতরের দিকে এবং প্রাণ রশ্মি বাইরের দিকে স্পন্দিত হতে থাকে।
6. যখন সেই কণা বা পিণ্ডের ওপর কোনো বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই পিণ্ডে ঊর্জার সঞ্চারণ হয়। এই ঊর্জা সেই কণা বা পিণ্ডে সঞ্চিত হয়ে তাতে বিদ্যমান প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মির বিন্যাসকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে।
7. সম্পূর্ণ আকাশ সূত্রাত্মা বায়ু এবং বিভিন্ন প্রকারের প্রাণ, মরুত্ ও ছন্দ রশ্মির মিশ্রণে পরিপূর্ণ। রশ্মির এই মিশ্রণই হল ভ্যাকিউম ঊর্জার রূপ।
8. প্রাণ ও মরুত্ এবং প্রাণ ও ছন্দের জোড়াই হল বল ও ঊর্জার রূপ, একাকী কোনো রশ্মি ভ্যাকিউম ঊর্জার রূপ হতে পারে না।

অনুশীলনী

1. ঊর্জা কাকে বলে ? বৈদিক ও আধুনিক ভৌতিকীর দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করুন।
2. স্থিতিজ ঊর্জাতে থাকা একটি পিণ্ড গতিজ ঊর্জার সাথে কীভাবে যুক্ত হয় ? এর ক্রিয়া-বিজ্ঞান বুঝিয়ে বলুন।
3. কোনো পাথরের সঙ্গে কোনো তলের সংঘর্ষে ধ্বনি, প্রকাশ, উষ্মা আদির উৎপত্তি কীভাবে এবং কেন হয় ?

4. শব্দের চারটি প্রকার বর্ণনা করার সাথে-সাথে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমগুলো ব্যাখ্যা করুন।

* * * * *

14 অধ্যায়

অসুর পদার্থ এবং অসুর ঊর্জা

আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে এমন এক পদার্থের বিষয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি, যা বিভিন্ন সংযোগ প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই পদার্থের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

14.1 অসুর পদার্থের স্বরূপ

এই সৃষ্টিতে পঞ্চমহাভূত পদার্থের পাশাপাশি এমন কিছু পদার্থও বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়, যা সাধারণত অপ্রকাশিতই থাকে তথা যারমধ্যে বিকর্ষণ, প্রক্ষেপণ আদি বলের প্রাধান্য থাকে। এই পদার্থকে সামগ্রিকভাবে অসুর নামে অভিহিত করা হয়। এই পদার্থ প্রক্ষেপক ও বিকর্ষণ বল যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অতি সামান্য মাত্রায় আকর্ষণের ভাবও রাখে। এই আকর্ষণের ভাব নিজের প্রতি অর্থাৎ অসুর পরমাণুগুলোর একে-অপরের প্রতি অবশ্যই থাকে, অন্যথায় এই পদার্থ কখনোই বিদ্যমান থাকতো না, বরং সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাপ্ত হয়ে যেত। দুইটি সূক্ষ্ম কণা থেকে শুরু করে বিশাল লোকসমূহের মধ্যবর্তী সংযোগের সময় এই ঊর্জা বাধা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু দৃশ্যমান ঊর্জার আঘাতে এর চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়, তবুও কণা বা লোকসমূহের পারস্পরিক সংঘর্ষের সময়ও এই সূক্ষ্ম ঊর্জা তাদের মধ্যে একটি ব্যবধান বজায় রাখতে সহায়ক হয়। যদি এমনটি না হতো, তবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি অতি ঘন পিণ্ডে পরিণত হয়ে সর্বনিম্ন আয়তন ধারণ করতো। এই পদার্থের অন্যান্য গুণাবলী নিম্নরূপ —

1. দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য উভয় প্রকার পদার্থই একই উপাদান পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়।
2. মনস্ তত্ত্ব ও বাক্ তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন অসুর পদার্থ অন্ধকারযুক্ত হয়।
3. অসুর পদার্থে মনস্তত্ত্বের আধিক্য থাকে, কিন্তু সেই মনস্তত্ত্বের ভেতরে 'ওম' রশ্মির দেব পদার্থের তুলনায় স্বল্পতা থাকে, এই কারণে এই পদার্থ দেব পদার্থের তুলনায় প্রকাশহীন হয়।
4. সৃষ্টির প্রতিটি কর্মে আকর্ষণ ও ধারণ বলের সাথে-সাথে বিকর্ষণ ও প্রক্ষেপণ বলও অনিবার্য-ভাবে সক্রিয় থাকে। কোথাও-কোথাও এই দুই পদার্থের সংঘর্ষ হয়, আবার কোথাও-কোথাও এই দুই পদার্থ মিলে সৃষ্টির রচনায় নিজেদের ভূমিকা একসাথে পালন করে। কেবল আকর্ষণ ও ধারণ বলের ভিত্তিতে সৃষ্টির রচনা কখনোই সম্ভব নয়। এই সৃষ্টিতে কখনো দুটি বা দুইয়ের

অধিক প দার্থ (লোক, কণা বা রশ্মি আদি) কোনো প্রবলতম আকর্ষণ বলের প্রভাবেও সম্পূর্ণভাবে মিলেমিশে এক হতে পারে না। এমনকি তারা একে-অপরকে সর্বদাই স্পর্শও করতে পারে না, বরং তাদের মধ্যে কিছু-না-কিছু ফাঁকা স্থান অবশ্যই থেকে যায়। এর সাথে-সাথে এই সৃষ্টিতে ছেদন, ভেদন, সংযোজন এবং বিয়োজনের ক্রমও সর্বত্র চলতে থাকে। এই কাজগুলোতে দেব ও অসুর উভয় প্রকার পদার্থেরই অবদান থাকে। অসুর পদার্থ নিজের বিকর্ষণ বলের প্রভাবে বিভিন্ন লোকের মধ্যে যথাযথ অবকাশ বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং তাদের ধারণ করতে বা স্থায়িত্ব প্রদান করতেও সহায়ক হয়। দেব ও অসুর পদার্থের মধ্যে প্রথমে দেব পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং তারপরে অসুর পদার্থের উৎপত্তি হয়।

5. এই পদার্থ অপ্রকাশিত বায়ুরূপ হয়, যা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি ছাড়া কখনো প্রকাশিত অবস্থা লাভ করতে পারে না।

6. 'ওম' রশ্মিবিহীন মনস্তত্ত্বও অসুর তত্ত্বের রূপ হয়।

7. এই পদার্থে আসুরী ছন্দ রশ্মি ছাড়া অন্য কোনো প্রকারের ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে না, বরং কেবল প্রাণরশ্মিই বিদ্যমান থাকে।

8. যে ছন্দ রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্ব দ্বারা প্রেরিত এবং সংযুক্ত থাকে, সেগুলো দৃশ্যমান পদার্থের অংশ হয়ে সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এর বিপরীতে যে ছন্দ রশ্মিগুলো মন দ্বারা প্রেরিত হয় না, সেগুলো অপ্রকাশিত ঊর্জা বা পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

9. সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় কিছু ছন্দ রশ্মির কিছু সার ভাগ আকাশে মিশে যায়। তারপর সেই সার ভাগ রহিত রশ্মিগুলো আসুর তত্ত্ব রূপে উৎপন্ন হয় অথবা সেই অসুর তত্ত্বকে উৎপন্ন করে।

10. যখন ব্যান রশ্মিগুলো মনস্তত্ত্ব দ্বারা পূর্ণরূপে সংগত ও প্রেরিত হয় না, তখন প্রাণ-অপান এবং প্রাণোদান রশ্মিগুলো অসুর রশ্মির রূপ ধারণ করে।

11. প্রলয়কালের প্রক্রিয়া শুরু হলে অসুর পদার্থ ক্রমাগত শক্তিশালী হতে শুরু করে তথা তাকে নষ্ট ও নিয়ন্ত্রিতকারী রশ্মিগুলো ক্রমাগত দুর্বল বা নষ্ট হয়ে যায়। এতে বিভিন্ন লোক আদি পদার্থের বিনাশ হতে শুরু করে। সুপারনোভা আদির বিস্ফোরণেও অসুর পদার্থের অনিবার্য অবদান থাকে।

12. যে সব ছন্দ রশ্মির সাথে অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মিগুলো সংযুক্ত হয় না, সেই রশ্মিগুলো অসুর রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়।

13. যে সব ছন্দ রশ্মির সাথে প্রাণরশ্মিগুলো পরস্পর ছড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, সেই

ছন্দ রশ্মিগুলো দেব পদার্থ উৎপন্ন করে তথা যেসব ছন্দ রশ্মিতে প্রাণগুলো পরস্পরের অতি নিকটে সংযুক্ত থাকে, সেগুলো আসুরী ছন্দ রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়ে অসুর পদার্থ তৈরি করে।

14. যখন প্রাণ ও অপান তত্ত্বের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য হতে পারে না, তখন বিভিন্ন প্রাণ রশ্মি ছন্দ রশ্মির সাথে সঠিক সংযোগ স্থাপন করতে পারে না এবং এর ফলে সেই প্রাণ রশ্মিগুলো সূক্ষ্ম অসুর রশ্মিতে রূপান্তরিত হয়।

15. অসুর তত্ত্বের মধ্যেও বিশেষ প্রকারের ধ্বংসাত্মক ও বিকর্ষণকারী বিদ্যুৎ বিদ্যমান থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডে এই পদার্থের ধারাও সর্বত্র নিরন্তর প্রবাহিত হতে থাকে।

16. যে ছন্দ রশ্মিগুলো নিজেদের ধারক ধ্যায়্যা নামক ছন্দ রশ্মির সাথে যুক্ত হতে পারে না তথা যে প্রাণ রশ্মিগুলো মরুৎ রশ্মির সাথে যুগ্ম তৈরি করতে পারে না, সেগুলো আসুরী পদার্থকে জন্ম দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই সম্পূর্ণ প্রকরণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, এই সৃষ্টিতে সেই পদার্থ, যার দ্বারা এই সৃষ্টি গঠিত হয়েছে, এর অতিরিক্ত এমন এক পদার্থ বিদ্যমান আছে, যা অদৃশ্য ও অপ্রকাশিত হয়। দৃশ্য পদার্থ সৃষ্টিতে বিভিন্ন লোক তৈরির প্রধান কারণ হয়, অথচ অদৃশ্য পদার্থ কোনো লোক নির্মাণ করতে পারে না। তা সত্ত্বেও দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড তৈরিতে অদৃশ্য পদার্থের অনিবার্য ভূমিকা আছে। বৈদিক ভৌতিকীতে দৃশ্য পদার্থকে দেব এবং অদৃশ্য পদার্থকে অসুর বলা হয়। বর্তমান বিজ্ঞানও এই দুই প্রকারের পদার্থকে স্বীকার করে। তারা অপ্রকাশিত পদার্থকে ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি নাম দেয়। বর্তমান ভৌতিকী এই ডার্ক পদার্থগুলোকে এখনও ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারেনি এবং এদের কাজ ও অস্তিত্বও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রমাণ বা স্পষ্ট করতে পারেনি।

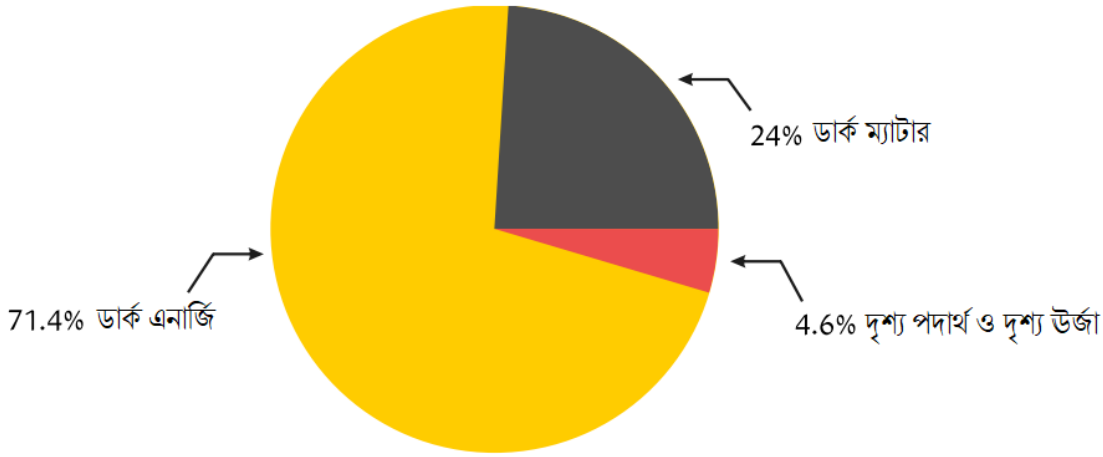

সৃষ্টিতে পদার্থের অনুপাত

অসুর পদার্থ এবং অসুর উর্জা

বর্তমান বিজ্ঞান অনুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডে 4.6% দৃশ্য পদার্থ ও দৃশ্য ঊর্জা, 24% ডার্ক ম্যাটার এবং 71.4% ডার্ক এনার্জি মানে।[6] ডার্ক এনার্জির স্বরূপ এবং উৎপত্তি সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞান স্বয়ং অন্ধকারে আছে।

14.2 ডার্ক ম্যাটারের সমরূপ পদার্থ

এখানে মনে হয় যে, পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রথম চার প্রকারের অসুর পদার্থ কণা অবস্থাকে প্রাপ্ত করে। এই কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল অত্যন্ত সামান্য থাকে। এটি হল বর্তমান বিজ্ঞানের ডার্ক ম্যাটারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ পদার্থ। এগুলোতে ছন্দ রশ্মি স্বয়ং দুর্বল বন্ধনযুক্ত হওয়ার কারণে সবল বন্ধনযুক্ত দৃশ্যমান পদার্থ (দেব পদার্থ)-এর কণাগুলোর প্রতি আকর্ষণের নগণ্য ভাব প্রকাশ করে, তবুও এগুলো প্রাণ রশ্মির সঙ্গে মিলিত হওয়াতে এগুলো ঘন রূপ প্রাপ্ত করে কণার রূপে অবশ্যই উৎপন্ন হয়। এই কণাগুলো দৃশ্যমান পদার্থের (দেব পদার্থ) কণার মতো অতটা ঘন হয় না। এই কারণে এই কণাগুলো সৃষ্টির প্রত্যক্ষ অংশ হতে পারে না। এই পদার্থ দৃশ্যমান পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট না হলেও বা নগণ্য হলেও, এদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ অবশ্যই থাকে, অন্যথায় সম্পূর্ণ অসুর পদার্থ ছড়িয়ে পড়তো এবং কোনো কাজই সম্পন্ন করতে পারতো না। আজ ডার্ক ম্যাটার দ্বারা গ্যালাক্সিগুলোর ধারণে সহযোগিতার কথা বলা হয়, সেই ধারণ গুণও সেই সময় বিদ্যমান থাকতে পারে না, যদি সেই কণাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ শূন্য হতো। এই কণাগুলোকে চেনা কঠিন, কারণ এগুলো দুর্বল বন্ধনযুক্ত রশ্মি দ্বারা গঠিত হওয়ায় তুলনামূলকভাবে অনেক কম ঘন হয়।

বর্তমান বিজ্ঞান ডার্ক ম্যাটার নিয়ে এখনও গবেষণা করছে। তারা আমাদের এই অসুর পদার্থের স্বরূপকে বুঝতে পারলে অবশ্যই গবেষণায় সাহায্য পাবে। সৃষ্টির সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হোক — এমনটা আবশ্যক নয়। বিজ্ঞানকে সর্বদা প্রায়োগিক করার চেষ্টা করা এবং সেই সীমার মধ্যেই থাকা প্রকৃত বিজ্ঞানকে সংকুচিত করা হয়। তর্ক, যুক্তি আদির ভিত্তিতেও সৈদ্ধান্তিক ভৌতিকীকে পর্যাপ্ত বিস্তার দেওয়া যেতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকে বাদ দেওয়া উচিত; বরং এই সীমার বাইরেও চিন্তা করা আবশ্যক।

14.3 অসুর পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

অসুর পদার্থকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। এমন ছন্দ রশ্মি —

[6] https://wmap.gsfc.nasa.gov/universe/uni_matter.html এর অনুসারে

1. যা মনস্তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে না, যখন সেগুলো প্রাণ রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন তাদের থেকে অসুর তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।
2. যেগুলোর কিছু সার ভাগ আকাশে মিশে যায়, সেগুলো প্রাণ রশ্মির সাথে যুক্ত হয়ে অসুর তত্ত্বকে উৎপন্ন করে।
3. যেগুলো ধায়্যা সংজ্ঞক ছন্দ রশ্মি অথবা অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মি রহিত হয়, সেগুলো প্রাণ রশ্মির সাথে মিলে অসুর তত্ত্বকে জন্ম দেয়।
4. যেগুলো অব্যবস্থিত রূপে বিভিন্ন প্রাণ রশ্মির সাথে সংযুক্ত হয়, সেগুলোও অসুর তত্ত্বকে উৎপন্ন করে।

বৈদিক বিজ্ঞানে উপরে বর্ণিত অসুর তত্ত্বের প্রথম চার প্রকারের পদার্থ আমি বর্তমান বিজ্ঞানের ডার্ক ম্যাটারের প্রায় সমতুল্য মনে করি। বৈদিক অসুর তত্ত্বের চারটি শ্রেণী দেখানো হয়েছে, যেখানে বর্তমান বিজ্ঞানের মাধ্যমে কল্পিত ডার্ক ম্যাটারের স্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে এখনও আমার জানামতে কোনো তথ্য নেই। তবে হ্যাঁ, তারা অবশ্যই গরম ও ঠান্ডা — এই দুই প্রকারের ডার্ক ম্যাটারকে অবশ্য মানে। প্রথম শ্রেণীর রূপে বর্ণিত অসুর তত্ত্ব সবচেয়ে দুর্বল হয়, কারণ এটি মন ও বাক্ তত্ত্ব দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণও প্রেরিত হয় না। আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর অসুর তত্ত্ব, যারমধ্যে ছন্দ রশ্মি অব্যবস্থিত প্রাণ রশ্মির সাথে মিলিত হয়, তা সর্বাধিক তীক্ষ্ণ হয়; কারণ এতে ছন্দ রশ্মি অব্যবস্থিত প্রাণ রশ্মি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। বাকি দুই প্রকারের অসুর পদার্থ (ক্রমিক 2 ও 3) দুর্বল হয়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে থাকে। এটা সম্ভব যে এগুলো নিজেদের দ্রব্যমানের কারণে বিভিন্ন লোকসমূহকে প্রভাবিত করে সেগুলোকে ধরে রাখতে নিজেদের ভূমিকা পালন করে।

সৃষ্টিতে এই অপ্রকাশিত হিংসক অসুর পদার্থ নিম্নরূপেও পাওয়া যায় —

1. অত্রিণঃ হল এমন পদার্থ যা সংযোগযোগ্য কণাগুলোকে ভক্ষণ করে নেয়।

2. রক্ষাংসি — এই পদার্থ এমন আক্রামক হয়, যা থেকে সংযোগযোগ্য কণাগুলোকে রক্ষা করা আবশ্যক হয়, অন্যথায় সৃষ্টির প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

3. পাপ্মা হল এমন এক পদার্থ যা কোনো সংগমনীয় পদার্থের উপর আঘাত করে তার কণাগুলোকে সংযোগ প্রক্রিয়া থেকে ব্যাহত করে দেয়, এরফলে সেগুলো বারবার বিপরীত দিকে পতিত হয়। এমন তত্ত্ব সোম তত্ত্ব, ইলেকট্রন বা ফোটনের উপর বারবার আঘাত করে তাকে নষ্ট বা বিচলিত করতে চায়।

4. ময়ু (কিম্পুরুষ) নামক এই পদার্থ অত্যন্ত প্রক্ষেপক ক্ষমতা সম্পন্ন এবং অত্যন্ত ব্যাপনশীল হয়, সাথে এটি সূক্ষ্ম ধ্বনিও উৎপন্ন করতে থাকে। আমার দৃষ্টিতে এই পদার্থটিই সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও প্রারম্ভিক অসুর তত্ত্ব (অপ্রকাশিত হিংসক বাধক পদার্থ) নামে পরিচিত।

5. কিল্বিষ হল সেই বাধক তত্ত্ব, যাদের এখানে-সেখানে অসুর নামে জানা যায়। এই অসুর তত্ত্ব যেকোনো কণার সংগতিকরণ বা সংমিশ্রণে বাধার সৃষ্টি করে।

6. দ্বিষন্তম্ অর্থাৎ এমন তত্ত্ব, যা সোম তত্ত্বকে বিকর্ষণ করে নিজের থেকে দূরে রাখতে চায়।

7. ভ্রাতৃব্য — অগ্নি এবং বায়ু তত্ত্বের এমন এক বিকার, যা অন্য কণাদের হরণ করার অর্থাৎ তাদের আকর্ষণ করে ধ্বংস করার প্রবণতা রাখে।

8. বৃত্র নামক অসুর পদার্থ মেঘরূপী হয়, যা অপ্রকাশিত বায়ুর রূপ হয়। যখন বিভিন্ন কণার মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ হতে থাকে, তখন তাদের মধ্যে বৃত্র নামক অপ্রকাশিত সূক্ষ্ম বায়ুর মেঘ তুল্য ঘেরাও করে বাধা দিতে শুরু করে। বিশাল স্তরে এটি সমস্ত লোকসমূহকে ঘেরাও করার ক্ষমতা রাখে।

9. অমিত্র হল সেই রশ্মিগুলো, যা নিজস্ব সংযোজক গুণহীন বা অল্প গুণসম্পন্ন হয়। এদের প্রভাবে আসা অন্যান্য রশ্মিও সংযোজক গুণের মন্থরতায় আক্রান্ত হয়।

10. দস্যু হল সেই রশ্মিগুলো, যা শক্তিশালী হওয়ার কারণে সংযোগোন্মুখ অন্য কোনো পদার্থকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে সেই সংযোগকে হতে দেয় না।

11. সপত্ন হল অসুর তত্ত্বের মধ্যম রূপ, যা বিভিন্ন সংযোগযোগ্য কণার সংযোগে বাধা সৃষ্টি করে।

14.4 আসুরী ঊর্জা (কথিত ডার্ক এনার্জি)

বৈদিক অসুর তত্ত্বের পর এবার আসুরী ঊর্জা নিয়ে আলোচনা করবো।

1. এমন প্রাণ-অপান অথবা প্রাণোদান রশ্মি, যা মনস্তত্ত্বের সাথে ভালোভাবে সংগত না হয়ে ব্যান প্রাণের সাথে সংগত হয়, তখন সেই প্রাণ-অপান অথবা প্রাণোদান রশ্মিগুলো সূক্ষ্ম অসুর রশ্মিকে উৎপন্ন করে।
2. এমন প্রাণ রশ্মি, যা ছন্দ অথবা মরুত্ব রশ্মির সাথে সংগত হতে পারে না, সেগুলোও সূক্ষ্ম অসুর রশ্মির জন্ম দেয়।

উপরোক্ত অসুর পদার্থ হল আসুরী ঊর্জার রূপ। এদের মধ্যে প্রথম ঊর্জাটি মন দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ব্যানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত প্রাণ-অপান ও প্রাণোদান দিয়ে নির্মিত হয় এবং দ্বিতীয় ঊর্জাটি বিনা ছন্দ রশ্মিতে কেবল প্রাণ রশ্মির রূপে থাকে। এই উভয় প্রকার ঊর্জা অপ্রকাশিত

ঊর্জার রূপ হয়। বর্তমান বিজ্ঞান যাকে ডার্ক এনার্জি বলে, তার সাথে এর এতটাই সাদৃশ্য আছে যে বৈদিক ডার্ক এনার্জিও বিকর্ষণমূলক প্রভাব প্রদর্শন করে। এর কারণ হল এতে কেবল প্রাণ রশ্মি থাকে, ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে না। বর্তমান বিজ্ঞান ডার্ক এনার্জির স্বরূপ সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিচিত এবং তারা এই বিষয়ও জানে না যে ডার্ক এনার্জির প্রভাব কেন বিকর্ষণমূলক হয়। আমাদের বৈদিক বিজ্ঞান এই বিষয়ে পর্যাপ্ত এবং স্পষ্ট প্রকাশ ফেলে।

14.5 দুটি কণার মধ্যে বিকর্ষণের কারণ

যখন একটি এটম বা মূল কণা বা অণু একে-অপরের অত্যন্ত কাছে আসে, তখন তারা একে-অপরকে আকর্ষণ করা সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট সীমায় এসে থেমে যায় এবং একে-অপরকে বিকর্ষণ করতে শুরু করে।

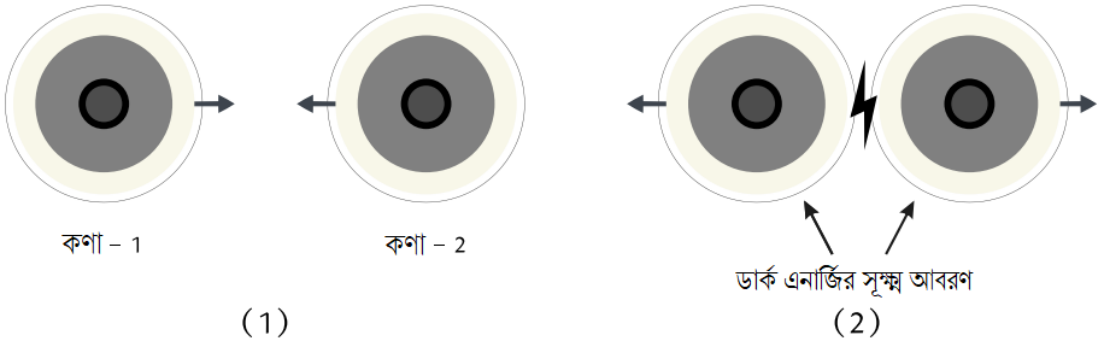

অসুর উর্জা (ডার্ক এনার্জি) দ্বারা দুটি কণার মধ্যে বিকর্ষণ হওয়া

কখনোই দুটি কণা একে-অপরকে পূর্ণভাবে স্পর্শ করতে পারে না। এর কারণ হল প্রতিটি কণা সর্বদা ডার্ক এনার্জি-র একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ (আবরন) দ্বারা আবৃত থাকে। সেই আস্তরণই কোনো কণাকে অন্য কণার সাথে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত হতে দেয় না। দূরত্ব যত কম হয়, সেই আস্তরণ কম হওয়ার জন্যই হয়। সংযুক্ত কণাগুলোর মধ্যেও কিছু-না-কিছু অবকাশ অবশ্যই থাকে। বর্তমান বিজ্ঞানও এই বিষয়টি স্বীকার করে যে, একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব (R_0) থেকে কম হওয়ার পর দুটি পরমাণুর মধ্যে বিকর্ষণ বল প্রভাবশালী হয়ে ওঠে, কিন্তু বিজ্ঞান এর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এখনো অনভিজ্ঞ আছে।

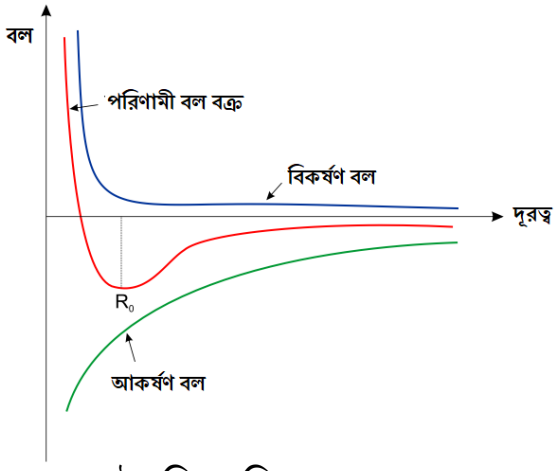

14.6 অত্যল্প সময়ের জন্য আপেক্ষিকতার লঙ্ঘন

যে সময় তীব্র ঊর্জা সম্পন্ন বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগুলো ডার্ক এনার্জির ওপর আঘাত করে, সেই সময় তাদের বেগ হঠাৎ বেড়ে যায়, এরথেকে অধিক বেগ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের অন্যত্র কোথাও হয় না। এখানে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা সিদ্ধান্ত লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে হয়, কারণ এই পরিস্থিতিতে স্বয়ং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ তাদের সর্বমান্য অবকাশে গতি 3 লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডের অতিক্রম করে সর্বোচ্চ গতি প্রাপ্ত করে নেয়। এই গতিকে অন্য কোথাও দেখা যায় না। উল্লেখ্য যে, এই সর্বোচ্চ গতি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের জন্য হয়, প্রাণাদি রশ্মির জন্য নয়। যেমনটি আমি আগেই লিখেছি যে, এই সৃষ্টিতে ধনঞ্জয় প্রাণের গতিই সর্বাধিক হয়, যা কেউ অতিক্রম করতে পারে না। ডার্ক এনার্জির ওপর আঘাত করার সময় বিভিন্ন তরঙ্গাণু তাদের পেছনের অংশ থেকে শক্তিশালী মরুৎ রশ্মি প্রক্ষেপণ করে। এই প্রক্ষেপণের কারণে ডার্ক এনার্জিকে নষ্ট বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই মরুৎ রশ্মির তীব্র প্রক্ষেপণের কারণে তরঙ্গাণুর গতি বিপরীত দিকে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এখানে আপেক্ষিকতার লঙ্ঘন স্থায়ীভাবে নয়, বরং অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য ঘটে।

স্মরণীয় তথ্য

1. এমন পদার্থ যা সাধারণত অপ্রকাশিতই থাকে তথা যারমধ্যে বিকর্ষণ ও প্রক্ষেপণ আদি বলের প্রাধান্য থাকে, তা অসুর নামে পরিচিত।
2. অসুর পরমাণুগুলোর একে-অপরের প্রতি আকর্ষণের ভাব অবশ্যই থাকে।
3. দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য — উভয় প্রকার পদার্থ একই মূল উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়।
4. অসুর পদার্থের মধ্যে মনস্তত্ত্ব-এর আধিক্য থাকে, কিন্তু সেই মনস্তত্ত্বের অভ্যন্তরে 'ওম্' রশ্মি দেব পদার্থের তুলনায় কম থাকে; এই কারণেই এই পদার্থ দেব পদার্থের তুলনায় কম আলোকোজ্জ্বল হয়।
5. এই সৃষ্টিতে ছেদন, ভেদন, সংযোজন ও বিয়োজন — এইসব কাজে দেব ও অসুর উভয় প্রকার পদার্থেরই অবদান থাকে।
6. অসুর পদার্থ তার বিকর্ষণ বলের প্রভাবে বিভিন্ন জগতের মধ্যে যথাযথ অবকাশ বজায় রাখতে এবং তাদের স্থায়িত্ব প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অসুর পদার্থ এবং অসুর ঊর্জা

7. দেব ও অসুর পদার্থের মধ্যে দেব পদার্থের উৎপত্তি আগে এবং অসুর পদার্থের উৎপত্তি তার পরে হয়।
8. 'ওম্' রশ্মিহীন মনস্তত্ত্বও অসুর তত্ত্বের রূপ হয়।
9. অসুর পদার্থ আসুরী ছন্দ রশ্মি দিয়ে গঠিত হয়।
10. যে ছন্দ রশ্মিগুলো মন দ্বারা প্রেরিত হয় না, সেগুলো অপ্রকাশিত ঊর্জা বা পদার্থে রূপান্তরিত হয়।
11. সুপারনোভা আদির বিস্ফোরণে অসুর পদার্থের অনিবার্য অবদান থাকে।
12. বৈদিক ভৌতিকীতে দৃশ্যমান পদার্থকে দেব এবং অদৃশ্য পদার্থকে অসুর বলা হয়।
13. মনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত ব্যানের সাথে সম্বন্ধ প্রাণ-অপান ও প্রাণোদান থেকে তৈরি ঊর্জা তথা বিনা ছন্দ রশ্মির কেবল প্রাণ রশ্মি হিসেবে উৎপন্ন ঊর্জা অপ্রকাশিত ঊর্জার রূপ হয়।
14. যখন তীব্র ঊর্জা সম্পন্ন বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ ডার্ক এনার্জির ওপর আঘাত করে, তখন তার বেগ হঠাৎ বেড়ে যায়, যার থেকে অধিক বেগ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের কোথাও দেখা যায় না।
15. এই সর্বোচ্চ গতি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের জন্য হয়, প্রাণাদি রশ্মির জন্য নয়। এখানে আপেক্ষিকতার লঙ্ঘন স্থায়ীভাবে নয়, বরং খুব অল্প সময়ের জন্য ঘটে।

অনুশীলনী

1. এই ব্রহ্মাণ্ডে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য — উভয় প্রকারের পদার্থ কী থেকে উৎপন্ন হয় ?
2. বৈদিক অপ্রকাশিত ঊর্জা বা দৃশ্যমান ঊর্জা এবং বর্তমানের ডার্ক এনার্জি — উভয়ের উৎপত্তি কীভাবে হয় ? আর উভয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য কী ?
3. প্রলয়কাল শুরু হলে কোন ধরণের ঊর্জা বেশি সক্রিয় হয় এবং কেন ?
4. ডার্ক ম্যাটারের সমতুল্য বৈদিক ভৌতিকীর অসুর পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন।
5. অসুর পদার্থ, ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি দুটোর উৎপত্তির বৈদিক প্রক্রিয়া বুঝিয়ে বলুন।
6. দুটি কণার মধ্যে অসুর পদার্থ কীভাবে বিকর্ষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ?
7. এই সৃষ্টিতে আলোর গতি কোন পরিস্থিতিতে আলোর বেগের চেয়ে বেশি হয় ?

* * * * *

15 অধ্যায়

দ্রব্যমান এবং তার কারণ

আমরা সংসারের সমস্ত বস্তুর মধ্যে কিছু-না-কিছু ভার অনুভব করি। এর পাশাপাশি আমরা এটাও অনুভব করি যে, সব বস্তুই তাদের অবস্থার পরিবর্তনের বিরোধিতা করে। বস্তুর মধ্যে এই উভয় প্রকার প্রবণতার কারণ হল তাদের দ্রব্যমান নামক গুণ। আসুন, এই দ্রব্যমানের গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করি।

15.1 আধুনিক বিজ্ঞানের মতে দ্রব্যমান

দ্রব্যমান হল কোনো পদার্থের সেই মূল গুণ, যা ওই পদার্থের ত্বরণের বিরোধিতা করে। বর্তমানে দ্রব্যমানের সংজ্ঞা এবং এর উৎপত্তির কারণ পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। কণার দ্রব্যমান বা ভারের জন্য হিগস বোসন-কে দায়ী মনে করা হয়। 1961 সালে আমেরিকান ভৌতিক শাস্ত্রী পিটার হিগস (মূলত স্কটল্যান্ডের পিটার ওয়্যার হিগস) বিচার করেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে অনেক ধরণের কণা বা তরঙ্গাণু বিদ্যমান আছে; তাদের মধ্যে কয়েকটির দ্রব্যমান আছে, আবার কয়েকটির নেই আর যাদের মধ্যে দ্রব্যমান আছে, তাদের মধ্যেও দ্রব্যমানের পরিমাণ সমান নয়। এই কারণে তিনি বিচার করেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে অবশ্যই এমন কোনো সর্বজনীন ক্ষেত্র (ফিল্ড) হওয়া উচিত, যার কারণে কোনো কণার মধ্যে দ্রব্যমানের অস্তিত্ব তৈরি হয়। পিটার হিগস সেই কাল্পনিক ক্ষেত্রের তরঙ্গাণুর নাম হিগস বোসন রাখেন। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা সংসারের বৃহত্তম ভৌতিকীর গবেষণাগার CERN-এ (European Council for Nuclear Research) LHC (Large Hadron Collider) মেশিন তৈরি করে 2012 সালে হিগস বোসন খুঁজে পাওয়ার দাবি করেন। বিজ্ঞানীরা এর দ্রব্যমান প্রোটনের দ্রব্যমানের তুলনায় 133 গুণ বেশি বলে মনে করেন। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, যদি সৃষ্টির সমস্ত কণার দ্রব্যমানের কারণ হিগস বোসন হয়, তবে হিগস বোসনের দ্রব্যমানের কারণ কী ? বর্তমান বিজ্ঞানীরা হিগস বোসনকে নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কল্পনা বা তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তাদের মতে, সব কণার মধ্যে দ্রব্যমানের কারণ হিগস ফিল্ড এবং হিগস বোসন হয়; কিন্তু হিগস বোসনের দ্রব্যমানের কারণ স্বয়ং হিগস ফিল্ডই হয়। যদি আমরা এর উপর প্রশ্ন করি যে, হিগস বোসন থেকে পৃথক হিগস ফিল্ড আসলে কী পদার্থ ? যদি কোনো কণাতে হিগস ফিল্ড থেকেই দ্রব্যমান আসতে পারে, তাহলে অন্য কণাগুলোর

দ্রব্যমানের জন্য হিগস বোসনের প্রয়োজনীয়তা কী ? এবং হিগস ফিল্ডের উৎস কী ? আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানীদের কাছে এসবের কোনো উত্তর নেই। বর্তমান বিজ্ঞানের হিগস বোসন বিষয়ে মত হল — Higgs filed must exist everywhere in space. The Higgs field has an additional significance with it, particles acquire their charactheristics masses. The stronger the interaction, greater the mass. We can think of the Higgs field an exerting a kind of viscous drag on particles that move through it; this drag appears as inertia, the defining property of mass.

(Pg.496, Arthur Beiser, Concept of Modern Physics)

অর্থাৎ, হিগস ফিল্ড কোনো কণার ওপর ঠিক সেভাবেই বল প্রয়োগ করে, যেভাবে কোনো তরলের মধ্য দিয়ে কঠিন পদার্থ যাওয়ার সময় সান্দ্রতা বল কাজ করে। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, যখন তরলের মধ্যদিয়ে কোনো কঠিন পদার্থ যায়, তখন সান্দ্রতা বল তৈরি হয় কারণ তরল ও কঠিন উভয় পদার্থের মধ্যেই দ্রব্যমান আছে। যদি এদের মধ্যে কোনোটিতে দ্রব্যমান না থাকে, তাহলে সান্দ্রতা বল তৈরি হবে না। যখন ইলেকট্রন আদি কণা উৎপত্তির সময় তাদের মধ্যে কোনো দ্রব্যমান ছিল না, তখন হিগস ফিল্ড কীভাবে তাদের মধ্যে সান্দ্রতা বল (জড়ত্ব - দ্রব্যমান) উৎপন্ন করতে পারে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল — যদি প্রোটনের চেয়ে 133 গুণ বেশি দ্রব্যমানযুক্ত হিগস বোসনে কোনো মধ্যস্থতাকারী কণা ছাড়াই হিগস ফিল্ড থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যমান আসতে পারে, তাহলে সেই দ্রব্যমানের 133 ভাগের সমান প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে দ্রব্যমানের উৎপত্তি হিগস বোসনের সহায়তা ছাড়া সরাসরি কেন হতে পারে না ? তথা হিগস বোসনের দ্রব্যমানের 2,45,421 ভাগের সমান নিউট্রনের মধ্যে দ্রব্যমান কেবল হিগস ফিল্ড থেকে কেন আসতে পারে না ? বোসন সর্বদা দুটি কণার মধ্যে মধ্যস্থ কণা রূপে থাকে এবং তাদের মধ্যে বল সৃষ্টি করে, যেমন আবেশিত কণার মধ্যে প্রকাশাণু, দুটি কোয়ার্কের মধ্যে গ্লুয়ন, দুটি দ্রব্যমানযুক্ত পিণ্ডের মধ্যে গুরুত্বাণু আদি, তাহলে হিগস বোসন কোন দুটি পদার্থের মধ্যে কাজ করে ?

তৃতীয় প্রশ্ন আমাদের সামনে এই উপস্থিত হয় যে, যেভাবে দ্রব্যমান, যা কোনো পদার্থের একটি মূলভূত গুণ হয়, তার বিষয়ে এই ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে এর পেছনে কোনো ফিল্ডই কারণ এবং সেই ফিল্ডকে হিগস ফিল্ড বলা হয়েছে, তাহলে পদার্থের অন্য এমনই গুণ বিদ্যুৎ আবেশের বিষয়ে যদি আমরা এই যুক্তি উপস্থাপন করি যে এর পেছনেও কোনো বিশেষ ফিল্ড

থাকা উচিত। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ফিল্ড তো স্বয়ং বিদ্যুৎ আবেশের কারণে উৎপন্ন হয়, তাহলে বিদ্যুৎ আবেশের কারণ কী? যখন দ্রব্যমান উৎপন্ন করার জন্য ফিল্ড থাকে, তখন কেন বিদ্যুৎ আবেশের উৎপন্ন করার জন্য কোনো ফিল্ড মানা উচিত নয়?

15.2 দ্রব্যমানের (Mass) বৈদিক স্বরূপ

বস্তুতঃ দ্রব্যমানের উৎপত্তির কারণ হিগস ফিল্ড নয়, বরং সবার দ্রব্যমানের কারণ হল এই রকম —

বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র নামক সর্বাধিক সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ, যা প্রাণ ও অপান রশ্মির বিশেষ সংযোগে উৎপন্ন হয়, তার সাথে প্রাণ, ব্যান ও ধনঞ্জয় রশ্মির মিশ্রণ ঘটে। এতে ত্রিষ্টুপ ছন্দের বিদ্যমানতাও থাকে, আর তখনই দ্রব্যমান গুণ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ বিশেষভাবে মন্দ প্রকৃতির হয়। এই মিশ্রণে অপানের তুলনায় প্রাণের প্রধান্য থাকে। ধনঞ্জয় মিশ্রিত ব্যান রশ্মির মিলনে প্রাণ তত্ত্বের আকর্ষণ বল প্রধান হয়ে অপানের প্রতিকর্ষণকে গৌণ করে দেয়। এই রশ্মিগুলোর বন্ধন এমন হয় যে এর কারণে যেকোনো পদার্থ কেবল আকর্ষণের ভাবই রাখে এবং কোনো গতি বা স্থিতির পরিবর্তনের প্রতিরোধ করে। এই প্রতিরোধী গুণকেই বর্তমান বিজ্ঞান জড়ত্ব রূপী দ্রব্যমান নাম দেয়। এর স্বরূপ ও ক্রিয়াবিজ্ঞান হল এই রকম —

অপান এবং তার তুলনায় প্রাণের আধিক্যের সাথে-সাথে ব্যান, এই সকল রশ্মিকে ত্রিষ্টুপ ছন্দ রশ্মিগুলো তিন দিক থেকে ধরে রাখে। এরপর সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির জাল সবাইকে চারদিক থেকে ঘিরে বেঁধে ফেলে। এইভাবে এটি একটি সংঘাত রূপ ধারণ করে। এই সংঘাত কণা বা তরঙ্গাণু উভয়ের মধ্যে যেকোনো হতে পারে। যখন এই সংঘাত গতি করে, তখন আকাশে বিদ্যমান সূক্ষ্ম প্রাণাদি রশ্মির সঙ্গে সেই সংঘাতের প্রতিরোধ হয়। **যদিও আকাশ তত্ত্বের রশ্মিগুলো প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি সমূহের মধ্যে দিয়ে সহজেই যাতায়াত করতে সক্ষম হয়, তবুও সূত্রাত্মা ও ত্রিষ্টুপের বিশেষ জালের কারণে এতে তাদের প্রতি অবরোধ বা বাধার সৃষ্টি হয় এবং এই অবরোধই দ্রব্যমান নামে পরিচিত।** যে সংঘাতে যত বেশি রশ্মি এবং যে পরিমাণে সেই জালের দ্বারা আবদ্ধ ও ঘনীভূত থাকে, সেই কণার দ্রব্যমান ততই বেশি হয়। বর্তমান বিজ্ঞান এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানকে বিন্দুমাত্রও বোঝে না।

বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র নামক ব্যাপক বিদ্যুৎ এবং প্রাণ তত্ত্ব উভয়ের মিশ্রণ এবং সেই সাথে ধনঞ্জয় ও ব্যানের সংযোগে পদার্থের মধ্যে দ্রব্যমান ও জড়ত্বের গুণ উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ তত্ত্বের কারণে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ পরস্পর একে-অপরের সাথে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু বিদ্যুতে

অপানের উপস্থিতির কারণে একটি নির্দিষ্ট ব্যবধানের সাথে তারা একে-অপর থেকে পৃথকও থাকে। এই ধরণের বিদ্যুৎ তত্ত্ব এবং অপান-প্রাণ পরস্পর সমন্বিত হয়ে কাজ করে। এই বিদ্যুৎ তত্ত্ব ডার্ক এনার্জির প্রক্ষেপক প্রভাবকে নষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত করে। এটি পদার্থের মধ্যে কর্মরত অনিষ্টকর বলকে আটকে দিয়ে বিকৃত পদার্থের উৎপত্তি রোধ করে। এটি ডার্ক এনার্জি দ্বারা আক্রান্ত বিভিন্ন কণা বা রশ্মিকে আকর্ষণ করে নিজের সাথে সংগত করে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করে।

15.3 দ্রব্যমান ও ঊর্জার সংরক্ষণ সিদ্ধান্ত

এই সৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরণের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সাথে বিভিন্ন প্রকার বায়ু তত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণাদি পদার্থের নিকট সম্পর্ক থাকে। বায়ু বা প্রাণাদি পদার্থই সংকুচিত হয়ে বিদ্যু-চুম্বকীয় তরঙ্গ অর্থাৎ ঊর্জাকে উৎপন্ন করে। বর্তমান বিজ্ঞান বায়ু বা প্রাণাদি পদার্থের স্বরূপকে নিজের প্রযুক্তির মাধ্যমে অনুভব করতে পারে না। **দ্রব্যমান ও ঊর্জার সংরক্ষণ যেখানে ভঙ্গ হতে দেখা যায়, সেখানে উভয়ের প্রাণ তত্ত্বে পরিবর্তিত হওয়ার ফলাফল হিসেবে মানা উচিত। ভ্যাকিউম ঊর্জা বায়ু তত্ত্বেরই রূপ হয়।** যখন এর সংকোচনের ফলে তরঙ্গাণু বা কণা সৃষ্টি হয়, তখন দ্রব্যমান ও ঊর্জার সংরক্ষণ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হচ্ছে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ বায়ু তত্ত্ব ও ঊর্জা একে-অপরের পরিপূরক হওয়ায় মূলগতভাবে একই হয় তথা একই উৎস থেকে উৎপন্ন ও তাতেই বিলীন হয়। সাধারণত যেখানে বায়ু আছে, সেখানে ঊর্জাও বিদ্যমান আছে। এছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক প্রকারের কণা ও তরঙ্গ আদির মধ্যে কোনো-না-কোনো মাত্রায় ঊর্জা অবশ্যই বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ ঊর্জাহীন কোনো পদার্থের এই সৃষ্টিতে থাকা সম্ভব নয়। কিছু পদার্থ ঊর্জার রূপান্তর থেকে দ্রব্যাদিতে পরিবর্তিত হয়েছে, আবার কিছু পদার্থ (বায়ু আদি) ঊর্জার রূপে রূপান্তরিত হয়েছে।

স্মরণীয় তথ্য

1. ভর হল কোনো পদার্থের সেই মূল গুণ, যা ওই পদার্থের ত্বরণকে বিরোধ করে।
2. বৈকুণ্ঠ নামক ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ প্রাণ ও অপান রশ্মির বিশেষ সংযোগে উৎপন্ন হয়।
3. আকাশ তত্ত্বের রশ্মিগুলো প্রাণ ও ছন্দাদি রশ্মি সমূহের মধ্যে দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে সক্ষম হয়, কিন্তু সূত্রাত্মা ও ত্রিষ্টুপের বিশেষ জালের কারণে এতে অবরোধ সৃষ্টি হয় এবং এই

অবরোধই দ্রব্যমান নামে পরিচিত।

4. অপান, প্রাণ এবং ব্যান — এই সব রশ্মিকে ত্রিষ্টুপ ছন্দ এবং সূত্রাত্মা বায়ু রশ্মির বন্ধনে তৈরি সঙ্ঘাত রূপ (কণা বা তরঙ্গাণু) যখন গতি করে, তখন আকাশে বিদ্যমান সূক্ষ্ম প্রাণাদি রশ্মির দ্বারা সেই সংঘাতের প্রতিরোধ হয়।
5. যে সংঘাতে যত বেশি রশ্মি এবং যে পরিমাণে সেই জালের দ্বারা আবদ্ধ ও ঘনীভূত হয়, সেই কণার দ্রব্যমান ততই বেশি হয়।
6. বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র নামক ব্যাপক বিদ্যুৎ এবং প্রাণ তত্ত্ব — উভয়ের মিশ্রণে এবং সেই সঙ্গে ধনঞ্জয় ও ব্যান-এর সংযোগে পদার্থের দ্রব্যমান ও জড়ত্বের গুণ উৎপন্ন হয়।
7. বিদ্যুৎ তত্ত্বের কারণে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ একে-অপরের সাথে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু বিদ্যুতে অপান বিদ্যমান থাকায় একটি নির্দিষ্ট অবকাশের সাথে তারা একে-অপরের থেকে পৃথকও থাকে।
8. বায়ু বা প্রাণাদি পদার্থই সংকুচিত হয়ে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ অর্থাৎ ঊর্জাকে উৎপন্ন করে।
9. ঊর্জা ও দ্রব্যমানের সংরক্ষণ যেখানে ভঙ্গ হতে দেখা যায়, সেখানে উভয়ের প্রাণ তত্ত্বে রূপান্তরিত হওয়ার পরিণাম মানা উচিত।
10. বায়ু তত্ত্ব ও ঊর্জা একে-অপরের মধ্যে পরিবর্তনীয় হওয়ায় তারা মূলত একই হয় এবং একই মূল উপাদান থেকে উৎপন্ন হয় ও তাতেই লীন হয়।

অনুশীলনী

1. দ্রব্যমান কী ? আধুনিক এবং বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিতে এটি বোঝানোর চেষ্টা করুন।
2. ঊর্জা বিষয়ক হিগস বোসন ধারণার যুক্তি সহিত পর্যালোচনা করুন।
3. বৈদিক ভৌতিকী অনুসারে দ্রব্যমানের উৎপত্তি কীভাবে হয় ?
4. এই ব্রহ্মাণ্ডে যেখানেই দ্রব্যমান ও ঊর্জার সংরক্ষণ সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হচ্ছে বলে মনে হয়, তার ব্যাখ্যা করুন।

* * * * *

16 অধ্যায়

তরঙ্গাণু

আমরা জানি যে, কোনো কণা দ্বারা ঊর্জার নিঃসরণ এবং শোষণের প্রক্রিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ব্রহ্মাণ্ডে উদ্দীপিত নিঃসরণ, স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণ, স্ফূরদীপ্তি আদি এমন কিছু ঘটনা, যার পেছনে এই প্রক্রিয়ারই ভূমিকা আছে। সূর্যের কেন্দ্র থেকে বিকিরণ পৃষ্ঠতলে আসার জন্যও এই একই প্রক্রিয়া উত্তরদায়ী হয়। আমরা জানি যে এই প্রক্রিয়া কীভাবে ঘটে, কিন্তু কেন ঘটে? এর ক্রিয়াবিজ্ঞান কী? আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে এর উত্তর নেই। আমরা বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই প্রক্রিয়াগুলোকে বোঝার চেষ্টা করবো। এই ক্রমানুসারে, সর্বপ্রথম আলোর দ্বৈত রূপ প্রবৃত্তি বোঝা প্রয়োজন।

16.1 আলোর দ্বৈত (তরঙ্গ-কণা) প্রবৃত্তি

আসুন, এখন আমরা আলোর প্রকৃতিকে বোঝার চেষ্টা করি। কিছু পরীক্ষা আলোর তরঙ্গ প্রকৃতি প্রদর্শন করে, আবার কিছু পরীক্ষা এর কণীয় প্রকৃতি প্রদর্শন করে। আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞান আলোর দ্বৈত প্রকৃতিকে স্বীকার করে; অর্থাৎ আলো গমন করার সময় তরঙ্গের অবস্থায় থাকে এবং শোষণ ও নির্গমনের সময় কণার রূপ ধারণ করে, যাকে তরঙ্গাণু বলা হয়। বৈদিক বিজ্ঞানের মধ্যেও আলোর দ্বৈত প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এমনটা কেন হয়? এই বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান মৌন আছে।

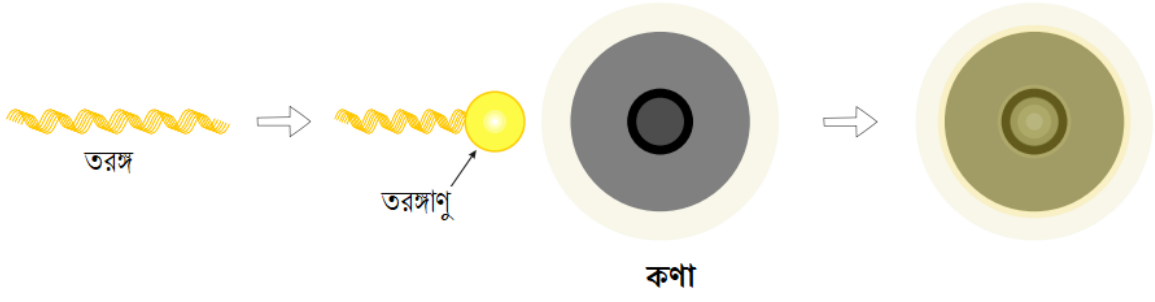

বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, তরঙ্গাণু তরঙ্গরূপে ভ্রমণ করে; সেই সময় তারা ছড়িয়ে থাকে, তাদের আকার অস্পষ্ট হলেও তা অনেকটা বেলনাকার হয়। যখনই তারা কোনো কণা দ্বারা শোষিত হয়, অমনি তারা তাৎক্ষণিকভাবে ঘনীভূত হয়ে যায় আর শোষিত হয়ে সেই

কণার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে তরঙ্গাণু কেবল শোষণ এবং নিঃসরণের সময়ই কণার রূপ ধারণ করে। বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ধরণের ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সময়ে-সময়ে বিভিন্ন ধরণের বৈদিক ছন্দ রশ্মি মনস্তত্ত্বের মধ্যে উৎপন্ন হতে থাকে। বৈদিক ছন্দ রশ্মি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম ক্রিয়াতেও নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখানে তরঙ্গাণুকে ঘনীভূত করার কাজ

অগ্নিষোমা হবিষঃ প্রস্থিতস্য বীতম্ হর্যতম্ বৃষণা জুষেথাম্।
সুশর্মাণা স্ববসা হি ভূতমথা ধত্তম্ য়জমানায় শম্ য়োঃ॥ (ঋগ্বেদ 1.93.7)

এই রশ্মির কারণে হয়। সাধারণত অগ্নির বিকিরণ অর্থাৎ কোনো কণা থেকে তরঙ্গাণুর নিঃসরণ ও শোষণে তেরোটি ছন্দ রশ্মি প্রেরকের কাজ করে, কিন্তু ঊর্জাকে কণার রূপ দেওয়ার জন্য এই ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির বিশেষ ভূমিকা থাকে। মনে করুন, যদি এই রশ্মি ব্রহ্মাণ্ডে হঠাৎ শেষ হয়ে যায়, তাহলে কী হবে? যেমন আলোর সুইচ বন্ধ করলে চারপাশ অন্ধকার হয়ে যায়, তেমনই সবদিকে অন্ধকার নেমে আসবে। এক সেকেন্ডেরও অনেক কম সময়ে এই সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে।

16.2 কণার চারপাশে দুটি আবরণ

তরঙ্গাণু এবং ইলেকট্রনের সংযোগ-বিয়োগের প্রক্রিয়ায় তাদের বাহ্যিক আবরণ কখনো সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না, বরং এটি জীবনভর তাদের সাথেই থাকে। তবুও এই আবরণ অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে।

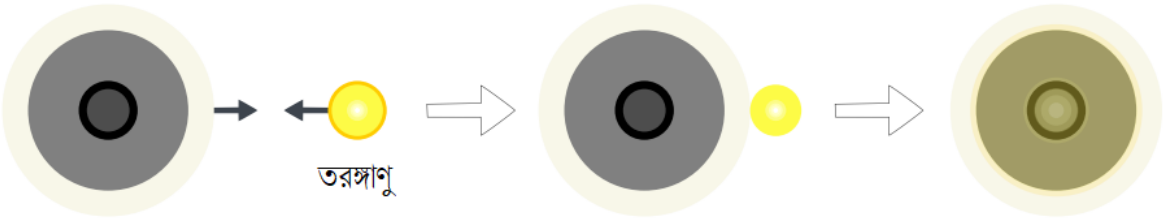

এই কণাগুলোর চারপাশে দুটি আবরণ বিদ্যমান থাকে, যারমধ্যে একটি আবরণ তাদের গতি, তেজ আদির তীব্রতা সুনিশ্চিত করে এবং দ্বিতীয় অতিসূক্ষ্ম আবরণটি উপরিভাগের আবরণকে গ্রহণ বা বর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই আবরণই যেকোনো কণার বিশেষত্বকে সংরক্ষিত রাখে। যদি এই আবরণটিও সংযোগের সময় শেষ হয়ে যায়, তবে বিভিন্ন কণার বিয়োগের সময় পূর্বের কণা কখনও উৎপন্ন হতে পারবে না। এটি লক্ষণীয় যে, তরঙ্গাণু ইলেকট্রন থেকে বের হওয়ার সময় দুর্বল হয়ে পড়া সূক্ষ্ম আবরণটিকে পুনরায় উৎপন্ন করে বেরিয়ে আসে,

যার ফলে সেই তরঙ্গাণু পুনরায় তেজ, বল ও গতি প্রাপ্ত করে।

যখন বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বিভিন্ন সৌম্য কণা (ইলেকট্রন)-এর সাথে সংযুক্ত হয়, সেই সময় ইলেকট্রনের ওপর থাকা বিভিন্ন প্রাণের আবরণ থাকে, ঊর্জার নিঃসরণ ও শোষণের পেছনে সোম্য কণার সেই আবরণগুলোর ভেদন একটি অনিবার্য কারণ হয়। যদি এই ভেদন না হয়, তবে ঊর্জার শোষণ ও নিঃসরণই হবে না। এই নিঃসরণ ও শোষণের অভাবে ঊর্জার সঞ্চালন ও উৎপাদন কিছুই সম্ভব হবে না এবং ঊর্জার পরিবর্তন, প্রতিসরণ ও বিচ্ছুরণও ঘটবে না। এমন অবস্থায় সবকিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। এই আবরণগুলোকে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ একটি জগতী ছন্দ রশ্মির কারণেই ভেদ করতে পারে। এই ভেদের পরেই ঊর্জা সেই সৌম্য কণার মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পারে। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের ভেতরে ব্যাপ্ত থাকা সূক্ষ্ম বিদ্যুৎই এই ধরণের ভেদ সম্পন্ন করে এবং সেই বিদ্যুৎ এই রশ্মির কারণে আরও সক্রিয় হয়।

16.3 তরঙ্গাণু এবং ইলেকট্রনের সংযোগ-বিয়োগের ক্রিয়াবিজ্ঞান

যখন একটি ফোটন কোনো পরমাণুর সাথে ধাক্কা খায় এবং সেই তরঙ্গাণুর ঊর্জা যদি ইলেকট্রনের দুটি স্তরের ঊর্জার পার্থক্যের সমান হয়, তাহলে কম ঊর্জা স্তরের ইলেকট্রনটি তরঙ্গাণুকে শোষণ করে উচ্চ ঊর্জা স্তরে চলে যায় এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরায় কম ঊর্জা স্তরে ফিরে আসে।

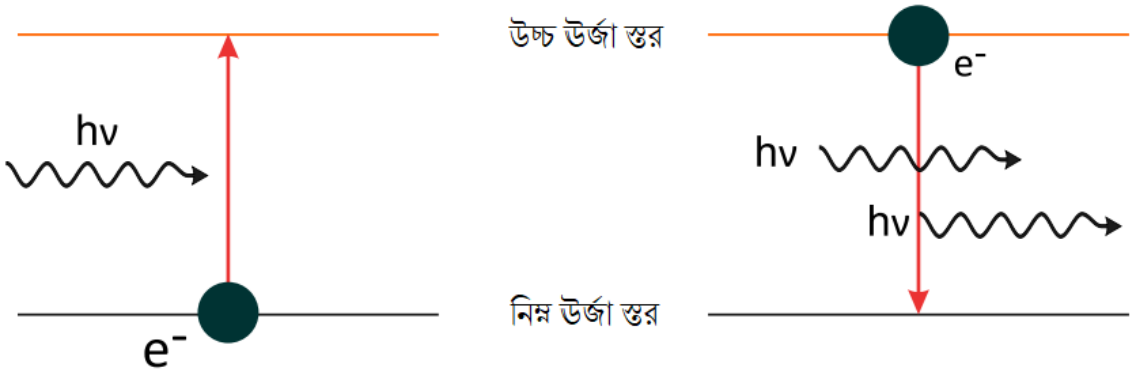

উদাহরণস্বরূপ, লেজার হল এমন একটি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ, যা উদ্দীপিত নিঃসরণ (Stimulated Emission) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। এতে ইলেকট্রন তরঙ্গাণুকে শোষণ করে উচ্চ ঊর্জা স্তরে চলে যায় এবং প্রায় 10^{-9} সেকেন্ড থেকে 10^{-12} সেকেন্ড পশ্চাৎ তরঙ্গাণুকে নিঃসরণ করে পুনরায় কম ঊর্জা সম্পন্ন কক্ষে ফিরে আসে, কিন্তু এমন কেন হয় ? বর্তমান বিজ্ঞান এই বিষয়ে অজ্ঞাত। আসুন, বৈদিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে এটি সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করি। যখন তরঙ্গাণু এবং ইলেকট্রনের সংযোগ ঘটে, তখন তিনটি রশ্মির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

থাকে। তাদের মধ্যে প্রথমটি হল —

অগ্নে বীহি হবিষা য়ক্ষি দেবান্‌ৎস্বধবরা কৃণুহি জাতবেদঃ॥ (ঋগ্বেদ 7.17.3)

এর কারণে অগ্নি পরমাণু(ঊর্জা কণা) কোনো কণায় ব্যাপ্ত হয়ে যায় এবং তাকে গতি প্রদান করে। এরপর দ্বিতীয় ছন্দ রশ্মির উৎপত্তি হয় —

য়দুস্ত্রিয়াস্বাহুতম্‌ ঘৃতম্‌ পয়োঽয়ম্‌ স বামশ্বিনা ভাগ আ গতম্‌।
মাধবী ধর্তারা বিদথস্য সত্‌পতী তপ্তম্‌ ঘর্মম্‌ পিবতম্‌ রোচনে দিবঃ॥ (অথর্ববেদ 7.73.4)

এর প্রভাবে প্রাণ-অপান সক্রিয় হয়ে তরঙ্গাণুকে ইলেকট্রনে শোষিত হতে সহায়তা করে। এবং তৃতীয়টি হল —

অস্য পিবতমশ্বিনা য়ুবম্‌ মদস্য চারুণঃ।
মধ্বো রাতস্য ধিষ্ণ্যা॥ (ঋগ্বেদ 8.5.14)

এর প্রভাবে বায়ুবিদ্যুৎ অর্থাৎ ভ্যাকিউম ঊর্জা তীক্ষ্ণ হয়ে ইলেকট্রন ও তরঙ্গাণু থেকে নির্গত প্রাণগুলোকে শোষণ করে নেয়, যার ফলে এই দুই ছন্দ রশ্মি মিলে তাদের দুই সংযুক্ত রূপকে আবৃত করে ফেলে। উপরোক্ত তৃতীয় ছন্দ রশ্মি দ্বারা যে দুটি কণার সংযোগ হয়, তা তৎক্ষণাৎ বিয়োগে রূপান্তরিত হয় এবং কণাগুলো পৃথক হওয়ার সময় পূর্বোক্ত 'অগ্নে বীহি' ছন্দ রশ্মি উৎপন্ন হয়ে উত্তর বা দক্ষিণ দিক থেকে কণা দুটিকে পৃথক-পৃথক করে। কোনো তরঙ্গাণু যখন ইলেকট্রনের ওপর পড়ে, তখন তা ইলেকট্রনের উত্তর বা দক্ষিণ অংশ দিয়েই প্রবেশ করে এবং যখন পুনরায় ইলেকট্রন থেকে নির্গত হয়, তখন সেই দিক থেকেই নির্গত হয়। দিকের এই নিয়ম প্রথম ছন্দ রশ্মির কারণে হয়। বাকি দুটি রশ্মি তরঙ্গাণুকে ইলেকট্রনের মাধ্যমে পূর্ণরূপে শোষণ করতে সাহায্য করে, যার ফলে তরঙ্গাণুর ঊর্জা ইলেকট্রন, যা স্বয়ং সূক্ষ্ম কণার সমূহ হয়, তাতে ব্যাপ্ত হয়ে যায় আর যখন ইলেকট্রন থেকে সেই তরঙ্গাণু পুনরায় নির্গত হয়, তখন এই দুই ছন্দ রশ্মির প্রভাবে সেই ঊর্জা একত্রিত হয়ে প্রথম রশ্মির সহায়তায় ইলেকট্রনের সেই নির্দিষ্ট দিক থেকেই ঘনীভূত রূপে বাইরে নির্গত হয়ে যায়।

যখন কোনো ইলেকট্রন ও তরঙ্গাণুর পরস্পর সংযোগ হয়, সেই সময় ওই তরঙ্গাণু সেই ইলেকট্রন আদি কণার উপর সূক্ষ্ম মরুৎ রশ্মিগুলোকে প্রক্ষিপ্ত করে এবং সেই মরুৎ রশ্মিগুলোর উপরও সূক্ষ্ম প্রাণ রশ্মিগুলো মৌমাছির মতো গুনগুন করতে থাকে। এগুলো সেই মরুৎ রশ্মিগুলোকে পরস্পরের সাথে সংগত ও সমন্বিত রাখে। এই মরুৎ রশ্মিগুলো ডার্ক এনার্জির সূক্ষ্ম

স্তরে বাধক প্রহারকে নষ্ট বা নিয়ন্ত্রিত করে। ইলেকট্রনকে এভাবে বিভিন্ন স্তরের ঊর্জা প্রদান করে বিভিন্ন প্রকারের আয়নের পরস্পরের অনেক প্রকার বিক্রিয়া ঘটায়। এই মরুৎ রশ্মিগুলোই বিভিন্ন ঊর্জা স্তরের তরঙ্গাণুগুলোকে কোনো ইলেকট্রন আদি কণার সাথে সংযুক্ত করার জন্য প্রধানত প্রেরিত করে ও সেই কণাগুলোকে খুঁজে বের করে। যখন কোনো তরঙ্গাণু কোনো কণার দিকে সংগত হওয়ার জন্য গমন করে, তখন সেটি সেই কণার কাছে এসে তাকে পরিক্রমা করতে-করতে সংযুক্ত ও ব্যাপ্ত হয়ে যায়, তা সরাসরি ও হঠাৎ করে পড়ে গিয়ে নয়। ঊর্জা ও দ্রব্যের এই সংগতীকরণ এই সৃষ্টিতে নিরন্তর চলতে থাকে। এদের সংগতীকরণের অভাবে সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলতেই পারবে না। বস্তুতঃ ঊর্জা ও দ্রব্য উভয়ই পৃথক-পৃথক হলেও মূলত একই হয়, কারণ এরা উভয়ই মূলত একই উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে। এর সাথে আকাশ তত্ত্বও এই দুটি থেকে ভিন্ন নয় এবং দ্রব্য ও ঊর্জাও আকাশতত্ত্ব থেকে ভিন্ন নয়। বস্তুতঃ এই সমস্ত প্রাণ ও লঘু ছন্দাদি রশ্মি রূপ সূক্ষ্ম পদার্থ থেকে উৎপন্ন হওয়ার কারণে এদের মধ্যে অনেকত্ব থাকা সত্ত্বেও একত্ব আছে। বৈদিক বিজ্ঞানে এই সবকিছুর নামই হল দ্রব্য।

এখানে কোনো ইলেকট্রন আদি কণা এবং কোনো তরঙ্গাণুর সংযোগের আলোচনা করা হয়েছে। যখন এদের পরস্পর সংযোগ ঘটে, তখন সেই ইলেকট্রন আদি কণা একটি নিচৃত অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মিকে তরঙ্গাণুর ওপর ছেড়ে দেয় এবং সেই তরঙ্গাণু এক প্রকারের বৃহতী ছন্দ রশ্মিকে ইলেকট্রন আদি কণার ওপর ছেড়ে দিয়ে সেই কণায় লীন হয়ে যায়। এই ছন্দ রশ্মি সেই তরঙ্গাণুসহ ইলেকট্রন আদিকে সব দিক থেকে আবৃত করে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কোনো ইলেকট্রন থেকে তরঙ্গাণুর (কোয়ান্টা) নিঃসরণের সময়ও একইভাবে ক্রিয়া ঘটে অর্থাৎ ছন্দ রশ্মির আদান-প্রদান হয়। যখন তরঙ্গাণু কোনো কণায় সংযুক্ত হয়, তখন অনুষ্টুপ ছন্দ রশ্মির কারণে একটি দীপ্তি উৎপন্ন হয়।

কোনো তরঙ্গাণু (কোয়ান্টা) একা বা অনেক বিকিরণ সমূহ রূপেও ততক্ষণ পর্যন্ত দীপ্তি উৎপন্ন করে না, যতক্ষণ না সেটি কোনো দ্রব্য কণার সংস্পর্শে আসে। এইভাবে তরঙ্গাণু যুক্ত ইলেকট্রন কিংবা ঊর্জাতে বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ইলেকট্রন কোনো এটম থেকে নিঃসৃত হয়ে অন্য কোনো আয়নের সাথে সংযুক্ত হয় বা এমন করার চেষ্টা করে। এদের পৃথক হওয়ার প্রক্রিয়াতে ইলেকট্রন আদি কণা নিচৃত অনুষ্টুপ এবং তরঙ্গাণু উপরোক্ত বৃহতী ছন্দ রশ্মিকে মুক্ত করে। যখন এই দুই প্রকারের কণার সংযোগ তথা বিয়োগ হয়, সেই সময় ইলেকট্রন আদি কণা নিজেও কম্পিত হয় এবং তরঙ্গাণুকেও কম্পিত করে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যেই কম্পন হয়। যখন তরঙ্গাণু

কোনো ইলেকট্রন আদি কণার সাথে সংযুক্ত হয়, তখন সেটি এমনভাবে সেই কণার মধ্যে মিশে যায় যেমন বৃষ্টির জল মাটি শোষণ করে নেয়।

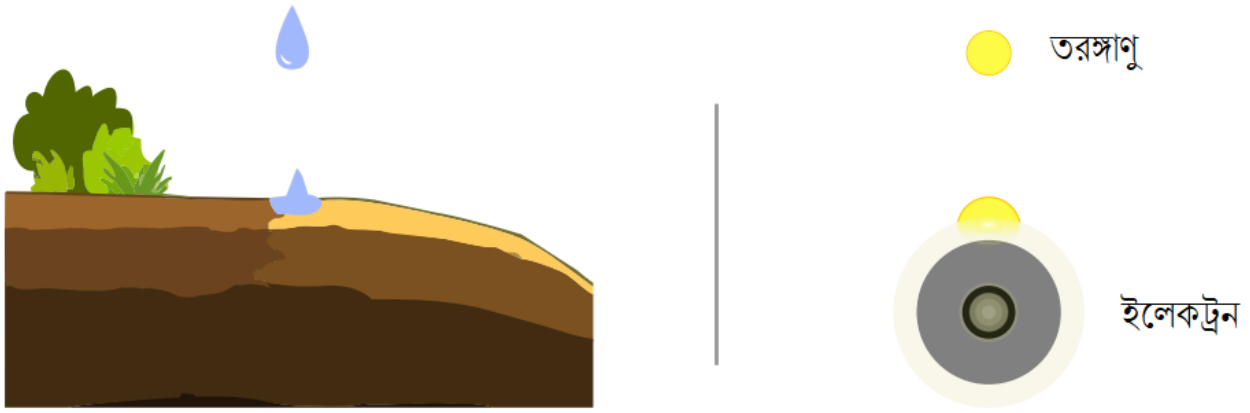

ইলেকট্রন দ্বারা তরঙ্গাণুর শোষণ

এই ধরণের ক্রিয়াকলাপে অনেক ধরণের প্রাণ ও মরুৎ রশ্মির একে-অপরের মধ্যে স্থানান্তর ঘটে। এই রশ্মিগুলো ইলেকট্রন এবং তরঙ্গাণুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যখন কোনও ইলেকট্রনাদি কণা থেকে কোনো তরঙ্গাণু মুক্ত হয়, তখন তা সম্পূর্ণ কণা থেকে সংকুচিত হয়ে ঠিক সেভাবেই বাইরে নির্গত হয় যেমন মেঘ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে। কিন্তু বাইরে বের হওয়ার সময় সেই তরঙ্গাণু বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সুদূর যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। একইভাবে যখন সেটি পুনরায় অন্য কোনও কণার উপর পড়ে, তখন প্রথমে ফোঁটার মতো আকার ধারণ করে সেই কণার ওপর পড়ে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই আকার ত্যাগ করে ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ কণার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।

এই সৃষ্টিতে ঊর্জা ছাড়া কোনও দ্রব্য কখনও কোনও প্রকার সংযোগ-বিয়োগ ক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে পারবে না। এমনকি ঊর্জার অভাবে কোনো কণাকে কখনও কোনো প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখাই সম্ভব নয়। এই প্রক্রিয়াগুলোতে সমান যোজ্যতা সম্পন্ন কণাগুলোর সংযোগই স্থায়ী হয়, অসমানগুলোর নয়। এই কারণে এই ধরণের সংযোগই প্রাথমিকতার আধারে হয়।

16.4 বিভিন্ন কণা ও তরঙ্গাণুসমূহের গতিবিধি

বিভিন্ন প্রকাশাণু, ইলেকট্রন আদির উপরে এমন একটি দীপ্তিময় তীব্র আবরণ থাকে, যা একদিকে যেমন সেই কণাগুলোর স্বরূপ ও মাত্রা রক্ষা করে, অন্যদিকে এর কারণেই কণাগুলো একে-অপরের চারদিকে ঘোরে বা স্বয়ং নিজের অক্ষের ওপর আবর্তন ও কম্পন করতে-করতে এগিয়ে চলে। এই আবরণ যেমন বিশেষ ছন্দ রশ্মির দ্বারা গঠিত, তেমনই এর মূল কারণ সূত্রাত্মা বায়ু হয়। এই আবরণ সেই কণাগুলোর সবদিকে থাকে। এর ফলে সেই কণাগুলো যেমন বাইরের

ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে সুরক্ষিত থাকে, তেমনি তাদের ভেতরে থাকা বিভিন্ন প্রাণাদি সূক্ষ্ম পদার্থও বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না। এই বাইরের আবরণে বিদ্যুৎ-বায়ুরও সমাবেশ থাকে, যার ফলে কণাগুলো কম্পিত হতে-হতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এক জায়গায় আবদ্ধ কঠিন বা দ্রব্য আদি পদার্থের মধ্যে সব কণা এই কারণেই কম্পন বা অবিরাম গতিশীল থাকে, যাকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় কম্পনশীল গতি বলা যেতে পারে।

যখন কোনো ইলেকট্রন বা নিউক্লিয়াস থেকে কোনো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গাণু নির্গত হয়, তখন সেই তরঙ্গাণু অনিয়মিত এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কম্পিত হয়। এর গতি ও দিশা কী হবে, তা অনিশ্চিত থাকে। সেই সময় কিছু গায়ত্রী রশ্মি তার সাথে যুক্ত হয়ে এবং ধনঞ্জয় প্রাণকে সাথে নিয়ে সেই তরঙ্গাণুকে তৎক্ষণাৎ আকাশ তত্ত্বের সাথে যুক্ত করে অত্যন্ত দ্রুত গতি (3 লক্ষ কিমি/সেকেন্ড) প্রদান করে দেয়। এরপর সেই তরঙ্গাণুটি ব্রহ্মাণ্ডের সুদূর বা অনন্ত যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। এখানে জানার বিষয় হল, যখন তরঙ্গাণু ইলেকট্রন আদির সাথে যুক্ত হয়, তখন তারা ইলেকট্রনের গতি ও ঊর্জাতে নিজেদের গতি ও ঊর্জা বিলীন করে দেয়। আবার যখন সেই ইলেকট্রন কোনো গতিশীল তরঙ্গাণুকে গ্রহণ করে, সেই সময়েও উপরোক্ত গায়ত্রী রশ্মিগুলো তার সাথে যুক্ত হয়ে তাকে ইলেকট্রনের চারদিকে বিদ্যমান আকাশ তত্ত্বের সাথে সংগত করে দেয়, যার ফলে সেটি ইলেকট্রনের কাছাকাছি চলে আসে এবং পুনরায় তার গতি ও দিশা অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এরপর সেটি ইলেকট্রন দ্বারা শোষিত হয়।

16.5 প্রকাশাণু (ফোটন)-এর গঠন

সব ধরণের সূক্ষ্ম কণা, প্রকাশাণু বা বল-রশ্মি আদি পদার্থ নিজেদের সূক্ষ্ম শক্তি অর্থাৎ 'ভূঃ', 'ভুবঃ', 'স্বঃ' আদি দৈব গায়ত্রী ছন্দের সাথে সর্বদা যুক্ত থেকে কাজ করে এবং বাধক রশ্মিগুলো অর্থাৎ তথাকথিত ডার্ক ঊর্জাকে দূর করতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশাণু গায়ত্রী আদি সাত প্রকারের ছন্দ রশ্মি, মন ও বাক্ তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি এবং প্রাণ অপান আদি প্রাথমিক প্রাণসমূহ দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন মরুৎ রশ্মি বড় ছন্দ রশ্মি, প্রকাশাণু, ইলেকট্রন, আদি কণা অথবা অন্য মধ্যস্থ কণা (mediator particles) সবাইকে তাদের স্বরূপ প্রদানে সহায়ক হয়। প্রকাশাণু ধনঞ্জয় প্রাণের সাথে আকাশ তত্ত্বের ওপর গমন করে। যেকোনো তরঙ্গ আকাশ তথা বায়ুর বিভিন্ন রশ্মির সংযুক্ত রূপ হয়। এরমধ্যে সূক্ষ্ম প্রাণ থেকে শুরু করে ছন্দ রশ্মি পর্যন্ত সব তত্ত্ব বিদ্যমান থাকে। এটি সাধারণত সৃষ্টি কাল পর্যন্ত নষ্ট হয় না। এটি নিজের গতির দিশাতে চিত্রের মধ্যে দেখানো আকারের মতো হয়।

তরঙ্গাণু

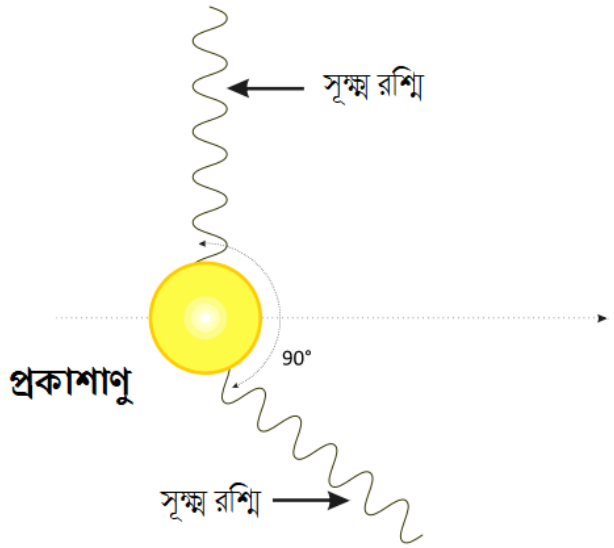

এর দুটি সমকোণ দিশাতে কিছু বিশেষ সূক্ষ্ম রশ্মির ধারা নির্গত হতে থাকে, সেই দিকগুলোতে ঐ তরঙ্গাণুগুলোর ভিতরে কিছু বিশেষ প্রাণ আদি দেব পদার্থ অব্যক্ত রূপে লুকিয়ে থাকে। এই উভয় ধারাই কোনো তরঙ্গাণুর গতিকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে। সেই দুটি ধারাকে যুক্ত করার জন্য তরঙ্গাণুগুলোর মাঝখানে সূক্ষ্ম প্রাণ দিয়ে তৈরি কেন্দ্র থাকে এবং সেই কেন্দ্রটি আবর্তিত হয়ে ঐ উভয় ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

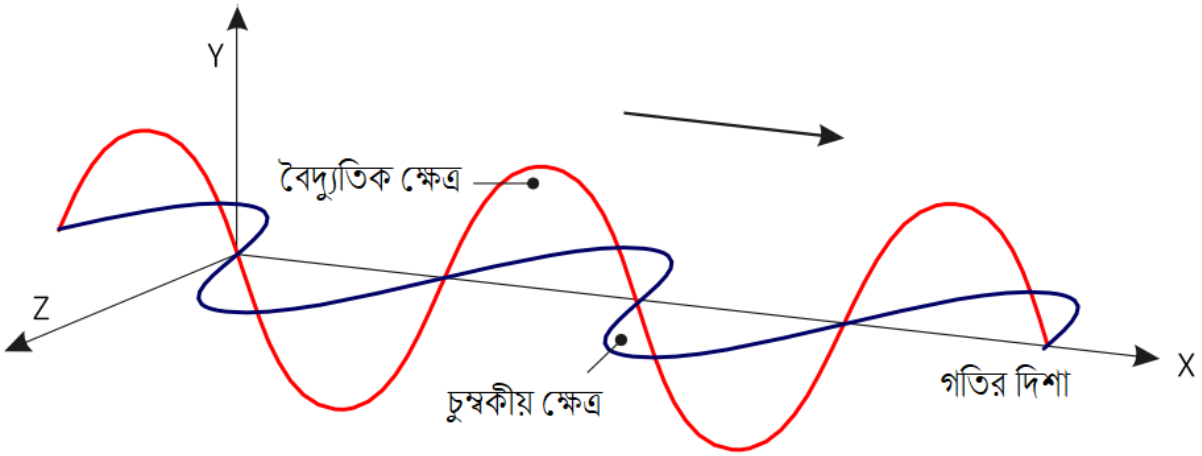

আধুনিক বিজ্ঞান যেকোনো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের উভয় দিকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তথা চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উপস্থিতি এবং এদের যথাক্রমে একে-অপরের সাথে লম্বভাবে দিশাতে পরিবর্তিত হয়ে অগ্রসর হওয়াকে স্বীকার করে। এই উভয় প্রকার ক্ষেত্র বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্তের সাথে মিল রাখে ঠিকই, কিন্তু এই ক্ষেত্রগুলো কেন একে-অপরের সাথে লম্বভাবে দিশাতে উৎপন্ন হয়, তার উত্তর আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে নেই।

16.6 কম্পটন প্রভাব

আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে, যখন উচ্চ আবৃত্তির বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ (অর্থাৎ তরঙ্গাণু) পদার্থের সাথে মিথস্ক্রিয়া হয়, তখন মুক্ত ইলেকট্রন থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে তরঙ্গাণুর ঊর্জাতে কিছুটা হ্রাস ঘটে এবং তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়াকে কম্পটন প্রভাব বলা হয়।

এখন এখানে এই প্রশ্ন ওঠে যে, তরঙ্গাণুর দ্বারা ইলেকট্রনকে ঊর্জা প্রদান করার ক্রিয়াবিজ্ঞান কী ? সেটি নিজের কিছু ঊর্জা ইলেকট্রনকে কীভাবে দেয় ?

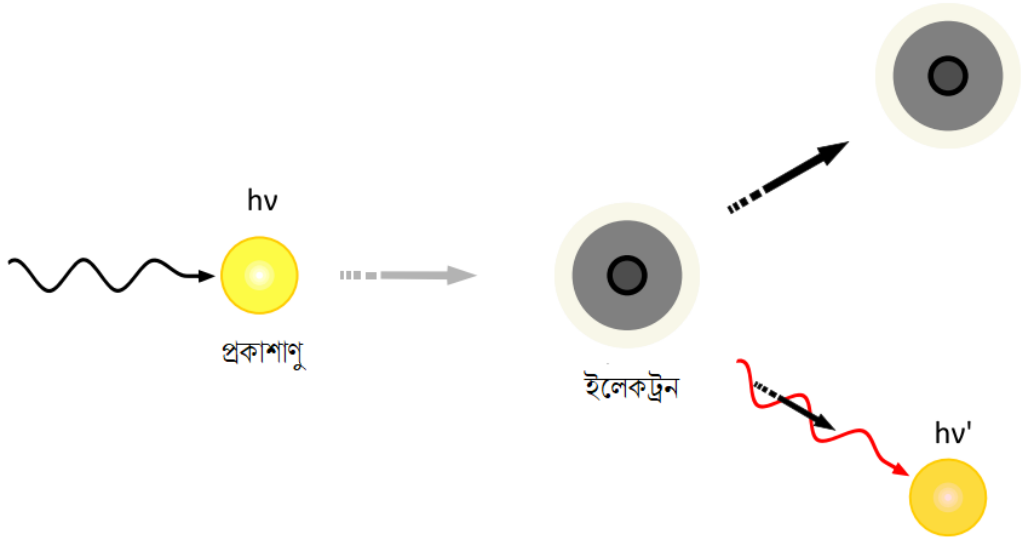

প্রকাশাণু দ্বারা ইলেকট্রনকে সূক্ষ্ম রশ্মি প্রদান করা

আসুন, এবার জেনে নিই যে এই বিষয়ে বৈদিক বিজ্ঞান কী বলে ? বাক্ তত্ত্ব (ওম রশ্মি) যা অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং সূক্ষ্ম মরুৎ রশ্মি সর্বদা দ্রব্য ও ঊর্জার সাথেই যুক্ত থাকে। প্রকাশাণু অতি সূক্ষ্ম রশ্মিগুলোকে ধারণ করে। যখন প্রকাশাণু কোনো ইলেকট্রন আদির সাথে সংঘর্ষ করে, তখন তারা এই সূক্ষ্ম রশ্মিগুলোকে সেই কণাগুলোর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে। কারণ যেকোনো তরঙ্গাণু স্বয়ং 360 প্রকারের রশ্মি যুক্ত থাকে, এই কারণেই কোনো তরঙ্গাণু যখন অন্য কোনো কণার সাথে সংঘর্ষ করে, তখন কিছু ঊর্জা তাকে দিয়ে অবশিষ্টাংশ ঊর্জার রূপে আগে বেরিয়ে যায়। কমে যাওয়া ঊর্জা সম্পন্ন তরঙ্গাণুগুলোর ভেতরে বিদ্যমান ছন্দ ও প্রাণ রশ্মির সংখ্যা খণ্ডিত হয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছন্দ রশ্মিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই কারণেই সেই তরঙ্গাণুর ঊর্জা হ্রাস পায়। এই কারণে কোনো তরঙ্গাণুই ন্যূনতম ঊর্জার একক হয় না।

যখন কোনো ফোটন কোনো ইলেকট্রন দ্বারা শোষিত হয়ে পুনরায় ফিরে নির্গত হয়, তখন ঊর্জার খুব সূক্ষ্ম অংশ ইলেকট্রন নিজের কাছে রেখে দেয় এবং অধিকাংশ অংশই নির্গত হয়ে

যায়। এই কারণেই সূর্যের কেন্দ্রীয় ভাগে উৎপন্ন গামা (γ) কিরণ সূর্যের পৃষ্ঠে আসতে-আসতে দৃশ্যমান আলোক, অবলোহিত কিরণ, অতিবেগুনি কিরণ আদিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঊর্জার এই সূক্ষ্ম শোষণ একটি জগতী ছন্দ রশ্মির কারণে হয়।

16.7 ফটো ইলেকট্রিক প্রভাব

মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস আজ থেকে প্রায় 7000 বছর আগে নিজের গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, ত্রিষ্টুপ ছন্দ রশ্মি ঊর্জাকে তরঙ্গাণুর রূপে বেঁধে রাখে, যার ফলে বিভিন্ন প্রকাশাণু ঊর্জার একটি বিশেষ পরিমাণকেই ধারণ করে। বিশেষ করে যখন প্রকাশাণু কোনো ইলেকট্রনের ওপর পড়ে, তখন ঊর্জার একটি বিশেষ পরিমাণের সাথেই ইলেকট্রনের সাথে সংযুক্ত হতে পারে, কোনো নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহমান ঊর্জার সাথে নয়। এই ছন্দ রশ্মি কোনো ইলেকট্রনের সাথে সংযুক্ত হতে চলা অন্য ছন্দ আদি প্রাণের মধ্যে স্থিত হয়ে চলে, যা মুক্ত অবস্থায় ঊর্জার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে বাধক হয় না, কিন্তু নির্গমন ও শোষণের সময় ঊর্জাকে বেঁধে কণার রূপে বদলে দেয়।

এই কথাই আইনস্টাইন 1905 সালে প্রস্তাব করেছিলেন যে, আলো বাস্তবে ঊর্জার আলাদা-আলাদা প্যাকেজ রূপে চলাচল করে। এর সাথেই আইনস্টাইনের ফটো ইলেকট্রিক সমীকরণ —

$$hf = hf^1 + K_{max}$$

এর অনুসারে, যখন আলোকে কোনো বিশেষ পদার্থের ওপর ফেলা হয় এবং যদি তার ঊর্জা hf^1 এর অধিক হয়, তাহলে K_{max} গতিজ ঊর্জার সাথে ইলেকট্রন সেই পদার্থ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

16.8 তরঙ্গাণুর অভ্যন্তরে সূত্রাত্মা বায়ুর ব্যাপ্তি

যখন কোনো কণার সাথে কোনো তরঙ্গাণুর সংযোগ ঘটে, তখন সেই তরঙ্গাণুর ঊর্জা সেই সম্পূর্ণ কণার অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এইভাবে তার ব্যাপ্তি সেই কণার সীমা পর্যন্ত হয়, কিন্তু যখন সেই কণা সূত্রাত্মা বায়ু দ্বারা ঘেরা থাকে, তখন সেই সূত্রাত্মা বায়ুর ব্যাপ্তির এক ভাগ সেই কণার সীমার ভেতরে থাকে এবং তিন ভাগ সেই কণার পরিধির চারদিকে থাকে। **এইভাবে সূত্রাত্মা বায়ুর ব্যাপ্তি তরঙ্গাণুর ব্যাপ্তির চার গুণ হয়।**

16.9 কণার সংযোগের নিয়ম

এই সৃষ্টিতে যখনই কোনো কণা বা তরঙ্গাণুর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ঘটে, তখন এক

সময়ে মাত্র দুটি কণা বা তরঙ্গাণুরই সংযোগ হতে পারে, তার বেশি নয়। এই সৃষ্টিতে অনেক অণুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যাটম দেখা যায়, তাদের বিষয়েও আমাদের মত হল, তারা সব অ্যাটম একসাথে সংযুক্ত হতে পারে না, বরং শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে ক্রমশঃ দুই, তিন আদি বর্ধমান ক্রমে সংযুক্ত হয়। অ্যাটম গঠনের সময়েও এই একই নিয়ম কার্যকর হয়। একইভাবে একটি ইলেকট্রন থেকে যখন কোনো তরঙ্গাণু সংযুক্ত বা নির্গত হয়, তখনও একসাথে কেবল একটিরই নির্গমন বা শোষণ হতে পারে, একসাথে অনেকগুলো হওয়া সম্ভব নয়।

ক্রিয়াকলাপ

আপনি ব্যতিকরণ (interference) সম্পর্কে নিশ্চয়ই শুনেছেন, এর প্রক্রিয়াকে বৈদিক রশ্মি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করুন।

স্মরণীয় তথ্য

1. বৈদিক বিজ্ঞান অনুসারে তরঙ্গাণু তরঙ্গ রূপে গমনের সময় ছড়িয়ে থাকে এবং যখনই কোনো কণা দ্বারা সেগুলো শোষিত হয়, তখনই সেগুলো তৎক্ষণাৎ ঘনীভূত হয়ে যায় এবং শোষিত হয়ে ওই কণার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।
2. তরঙ্গাণু কেবল শোষণ এবং নির্গমনের সময় কণার রূপ ধারণ করে।
3. কণার চারদিকে দুটি আবরণ বিদ্যমান থাকে, যার মধ্যে একটি আবরণ তাদের গতি, তীব্রতা প্রভৃতি নিশ্চিত করে এবং দ্বিতীয় অতিসূক্ষ্ম আবরণটি ওপরের আবরণকে গ্রহণ করতে বা ত্যাগে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
4. যখন কোনো তরঙ্গাণু কোনো কণার দিকে সঙ্গতীকরণ হওয়ার জন্য গমন করে, তখন সেটি ওই কণার কাছে এসে তাকে প্রদক্ষিণ করতে-করতে সংযুক্ত ও ব্যাপ্ত হয়, সরাসরি ও অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে হয় না।

5. ঊর্জা এবং দ্রব্য উভয় ভিন্ন-ভিন্ন হলেও মূলত এক, কারণ এগুলো মূলত একই কারণ-পদার্থ দ্বারা গঠিত।
6. বিভিন্ন প্রকাশাণু, ইলেকট্রনাদির উপরে এমন একটি দীপ্তিযুক্ত তীব্র আবরণ থাকে, যা সেই কণাগুলোর স্বরূপ ও মাত্রাকে রক্ষা করে।
7. এই আবরণটি বিশেষ ছন্দ রশ্মি দ্বারা গঠিত হয়, এর ফলে একদিকে যেমন সেই কণাগুলো বাইরের বাধক রশ্মি থেকে রক্ষা পায়, তেমনি তাদের ভেতরে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রাণাদি সূক্ষ্ম পদার্থ বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না।
8. যখন তরঙ্গাণু ইলেকট্রন আদির সাথে সংযুক্ত হয়, তখন এটি সেই ইলেকট্রনের গতি ও ঊর্জাতে নিজের গতি ও ঊর্জাকে বিলীন করে দেয়।
9. বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশাণু গায়ত্রী আদি সাত প্রকারের ছন্দ রশ্মি, মন ও বাক্ তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি এবং প্রাণ-অপান আদি প্রাথমিক প্রাণের সাথে যুক্ত থাকে।
10. তরঙ্গাণু থেকে দুটি সমকোণ দিশাতে কিছু বিশেষ সূক্ষ্ম রশ্মির ধারা নির্গত হতে থাকে। এই দুটি ধারা যেকোনো তরঙ্গাণুর গতিকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে।
11. যেকোনো তরঙ্গাণু স্বয়ং 360 প্রকারের রশ্মি দ্বারা যুক্ত থাকে।
12. ত্রিষ্টুপ ছন্দ রশ্মি ঊর্জাকে তরঙ্গাণুরূপে আবদ্ধ করে, যার ফলে বিভিন্ন প্রকাশাণু ঊর্জার একটি বিশেষ মাত্রাকেই ধারণ করে।
13. যখনই কোনো কণা বা তরঙ্গাণুর পারস্পরিক সংযোগ ঘটে, তখন এক সময়ে কেবল দুটি কণা বা তরঙ্গাণুরই সংযোগ হতে পারে, তার বেশি নয়।

অনুশীলনী

1. আলোর দ্বৈত প্রবৃত্তির বর্তমান ভৌতিকী এবং বৈদিক ভৌতিকীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।
2. প্রকাশাণু এবং ইলেকট্রনের পারস্পরিক সংযোগ ও বিয়োগের ক্রিয়া-বিজ্ঞান বুঝিয়ে বলুন।
3. কোনো প্রকাশাণু কি কোনো ইলেকট্রন থেকে নির্গত হয়েই নিজের সর্বোচ্চ বেগ প্রাপ্ত করে, নাকি অন্য কোনো পদার্থের কারণে সেটি এমন করতে পারে ?
4. যদি কণাগুলোর চারপাশে দুই প্রকারের আবরণ না থাকে, তাহলে কী হবে ?

5. তরঙ্গাণুর গঠন চিত্রসহ বুঝিয়ে বলুন।

6. বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কম্পটন প্রভাব বুঝিয়ে বলুন।

7. কণাগুলোর সংযোগের নিয়ম কী ?

8. ঊর্জার শোষণ কোন ছন্দ রশ্মি দ্বারা ঘটে ?

(অ) ত্রিষ্টুপ (ব) অনুষ্টুপ

(স) জগতী (দ) গায়ত্রী

9. কোন ছন্দ রশ্মির কারণে তরঙ্গাণু একটি নির্দিষ্ট ঊর্জার হয় ?

(অ) জগতী (ব) বৃহতী

(স) ত্রিষ্টুপ (দ) গায়ত্রী

* * * * *

17 অধ্যায়

নক্ষত্রের নির্মাণ

অমাবস্যার রাতে ঝিকিমিকি করা নক্ষত্রদের সৌন্দর্য অত্যন্ত অদ্ভুত দেখায়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়তো চিন্তাই করতে পারেন না যে এই নক্ষত্রগুলো কত বড় হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে, অনেক নক্ষত্র সূর্যের সমান আয়তনের, কিছু ছোট, আবার কিছু অত্যন্ত বিশাল আকারের হয়। এই বিশাল আকাশে প্রায় দুই বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে এবং প্রতিটি গ্যালাক্সিতে প্রায় দুই-তিন বিলিয়ন নক্ষত্র আছে। এই আকার তো বর্তমান বিজ্ঞানীদের দ্বারা দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের মানা হয়েছে। বাস্তবে ব্রহ্মাণ্ড কত বিশাল, তা কেউ জানে না এবং জানাও সম্ভব নয়। এই সব নক্ষত্র কীভাবে তৈরি হয়? বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে এই বিষয়ে গবেষণা করছেন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা এগুলো তৈরির প্রক্রিয়াকে খুব সামান্যই বুঝতে পেরেছেন।

17.1 দুই ধরণের জগৎ

এই ব্রহ্মাণ্ডে মহাকাশ ছাড়াও প্রধানত দুই প্রকার জগত আছে। এদের মধ্যে প্রথম জগত হল সেগুলো, যা অত্যন্ত তেজ এবং তাপের পুঞ্জ হয়, যাদের আমরা নক্ষত্র বলি। এই নক্ষত্রগুলো যখন তৈরি হতে থাকে, তখন সেগুলোতে আলো এবং তাপের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের কেন্দ্রে যখন নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন তাপ ও আলো উভয়ের পরিমাণই অনেক বেড়ে যায়। যতক্ষণ সেগুলো জীবিত থাকে, ততক্ষণ সেগুলো এই রূপেই থাকে। এই নক্ষত্রগুলো নিজ-নিজ আকাশ গঙ্গার (গ্যালাক্সি) কেন্দ্রে অবস্থিত কোনো বিশাল এবং শক্তিশালী নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে।

দ্বিতীয় জগত হল সেগুলো, যা নির্মাণাধীন অবস্থায় আগুনের গোলক রূপে থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে ঠান্ডা হয়ে গ্রহ-উপগ্রহ আদিতে রূপান্তরিত হয়। এদের কেন্দ্রীয় ভাগে সবসময় তীব্র তাপমাত্রা থাকে, কিন্তু সেই তীব্রতা এত বেশি নয় যে সেখানে নিউক্লীয় সংযোজন ঘটতে পারে। সব গ্রহ তাদের নিকটস্থ কোনো নক্ষত্রের গুরুত্বাকর্ষণ বল দ্বারা আবদ্ধ থেকে তাকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করে। বিভিন্ন নক্ষত্র, গ্রহ এবং উপগ্রহ আদি জগত তাদের উৎপত্তির সময় থেকে কিছুকাল পর্যন্ত নিজ-নিজ নিকটস্থ বিশাল জগতগুলোকে নির্দিষ্ট গতিতে এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে পারে না; বরং তাদের গতি এবং পথ উভয়ই অনিশ্চিত, বিশৃঙ্খল এবং অস্থির

থাকে। তবে এই সব জগত ধীরে-ধীরে নির্দিষ্ট কক্ষপথ এবং নির্দিষ্ট গতি প্রাপ্ত করার জন্য ক্রমাগত সচেষ্ট থাকে।

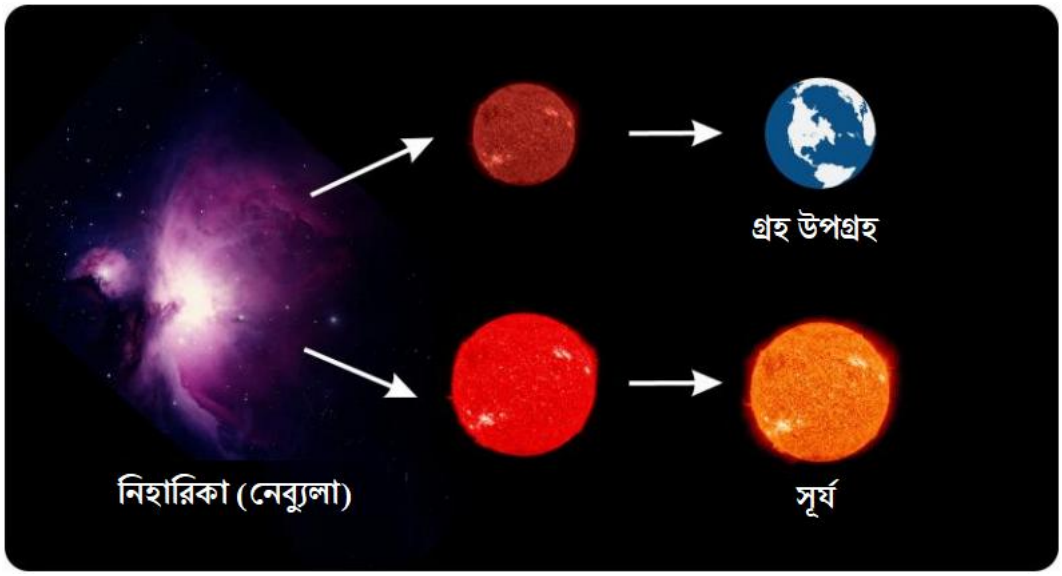

17.2 নক্ষত্রের গঠন

নক্ষত্রের প্রধান পাঁচটি অংশ থাকে। সেই পাঁচটি অংশের নাম হল লোম, ত্বক, মাংস, অস্থি ও মজ্জা।

1. লোম — নক্ষত্রের বৈদিক বৈজ্ঞানিক স্বরূপে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মিই হল নক্ষত্রের লোম। এগুলো নক্ষত্রের বহির্ভাগে ক্রমাগত বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়ে অগ্নিশিখা উৎপন্ন করতে থাকে।

2. ত্বক — এর ভেতরে করোনা, তাদেরও আধার স্বরূপ অন্য ছন্দ রশ্মি রূপ প্রাণ ও সূত্রাত্মা বায়ু আদি প্রাণের আবরণ সম্পূর্ণ নক্ষত্রকে ঢেকে রাখে। এটিই নক্ষত্রের ত্বকের মতো কাজ করে। এই অংশের মধ্যে অসুর তত্ত্ব, যা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় আকাশ তত্ত্বের সাথে মিশ্রিত থাকে, তাও এই ছন্দাদি রশ্মির নিকটে অবস্থান করে। এই সবগুলো মিলে নক্ষত্রের পরিধি নির্মাণ করে। এখানে ছন্দ ও প্রাণাদির ঘনত্বের কারণে নক্ষত্রের পরিধি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়।

3. মাংস — এরপরে নক্ষত্রের ভেতরের অংশ (যা কেন্দ্রীয় অংশের ওপর ক্রমাগত পিছলে যেতে থাকে) অবস্থিত। এই অংশটি মাংস রূপ হয় অর্থাৎ এখানেই নক্ষত্র নির্মাণের সম্পূর্ণ উপাদান (প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস অত্যধিক মাত্রায় ভরা থাকে তথা ইলেকট্রনও সেই অনুপাতে থাকে, তবে মুক্তাবস্থায়) অবস্থান করে। নক্ষত্রের অধিকাংশ বল এই অংশেই কাজ করে। এই অংশেই মাস ও ঋতু সংজ্ঞক রশ্মিগুলো অনেক ছন্দাদি প্রাণের সাথে বিদ্যমান থাকে।

নক্ষত্রের নির্মাণ

4. অস্থি — উপরোক্ত অংশে বিভিন্ন প্রক্ষেপণশীল রশ্মি অস্থিরূপ হয়, যা যেন সম্পূর্ণ নক্ষত্রটিকে ধারণ করে থাকে। ত্রিষ্টুপ্ এবং জগতী রশ্মি এই কার্য সম্পন্ন করে।

5. মজ্জা — নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অংশ, যা বিভিন্ন প্রাণ ও কণার ভাণ্ডার হয় এবং জ্যোতির্ময় সংযোজক রশ্মিতে পূর্ণ থাকে, তাকে মজ্জা বলা হয়। এই অংশই সম্পূর্ণ নক্ষত্রের শক্তির কেন্দ্র এবং জ্যোতির কেন্দ্র। এই অংশে বাইরের পদার্থ, বিশেষ করে হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস প্রবাহিত হতে থাকে, যা সংযোজিত হয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং ঊর্জা উৎপন্ন করতে থাকে। অনেক নক্ষত্রে হিলিয়াম আদিও সংযোজিত হয়ে আরও বড় নিউক্লিয়াস গঠন করে।

এইভাবে পাঁচ প্রকার পদার্থ দিয়ে নক্ষত্র গঠিত হয়। এখানে অগ্নিই সমস্ত প্রকাশিত ও আকর্ষণযুক্ত পদার্থের উৎপত্তি ও নিবাস স্থান হয়। যদিও সমস্ত নক্ষত্র মূলত অগ্নি এবং সোম, এই দুই প্রকারের পদার্থ দিয়ে গঠিত, যখন সোমও অগ্নির সমান হয়ে যায়, তখনই নক্ষত্রের স্বরূপ নির্মিত হতে শুরু করে। বিভিন্ন প্রকারের কণা, যা নক্ষত্রের বিভিন্ন অংশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে, নক্ষত্রের অতি তেজস্বী কেন্দ্রীয় অংশের দিকে পৌঁছাতে থাকে। সেখানে পৌঁছে সেগুলো বিভিন্ন প্রকার প্রাণের সাথে সংযুক্ত হয়ে পরস্পর সঙ্গত হয়ে বিভিন্ন তত্ত্বের নির্মাণ করতে থাকে।

17.3 নক্ষত্রের পাঁচটি ক্ষেত্র

এখানে আমি কোনো নক্ষত্রের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর অন্যভাবে কিছু স্থূল ব্যাখ্যা করবো —

1. ঐন্দ্রী (কেন্দ্রীয় ভাগ) — এরমধ্যে নিউক্লীয় সংযোজনের ক্রিয়া হয়ে তীব্র ঊর্জার বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং বিদ্যুৎ আবেশযুক্ত তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এরমধ্যে সর্বাধিক প্রবল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল বিদ্যমান থাকে। এটি যেকোনো নক্ষত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়।

2. য়ামী — কেন্দ্রীয় ভাগের বাইরের সেই ক্ষুদ্র অংশ, যেখানে অগ্নি এবং বায়ুর এমন এক মিশ্রণ থাকে যা কেন্দ্রীয় ভাগ এবং বাইরের ভাগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। এই ভাগের উপরেই নক্ষত্রের উভয় অংশ পরস্পরের উপর পিছলে যেতে থাকে। এই ভাগের পদার্থকে কোনো চাকার বিয়ারিং হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

3. বারুণী — এটি বেয়ারিং সদৃশ অংশের উপরের একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র, যেখানে তাপ অত্যন্ত উচ্চ অবস্থায় থাকে। এটি সংলয়নীয় কণাগুলোকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এবং কেন্দ্রীয় ভাগ থেকে আসা বিভিন্ন তরঙ্গকে বাইরের দিকে নিক্ষেপ করে।

4. সৌমী — এটি হল নক্ষত্রের সবচেয়ে বিশাল অংশ, যার ব্যাসার্ধ পুরো নক্ষত্রের ব্যাসার্ধের প্রায় 75% হয়। এই অংশে বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ আয়ন রূপে বিদ্যমান থাকে। এখান থেকেই বিভিন্ন

কণা কেন্দ্রীয় ভাগে পৌঁছে একত্রিত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের পদার্থে পরিবর্তিত হয়। এই অংশের তাপমাত্রা অন্যান্য অংশের তুলনায় সবচেয়ে কম হয়।

5. ঊর্ধ্বা — এটি হল যেকোনো নক্ষত্রের সবচেয়ে বাইরের পরিধি, যেখানে আগুনের উঁচু শিখা প্রতিনিয়ত উঠতে থাকে। এই অংশে বিভিন্ন ধরণের তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকে, যেগুলোর অবস্থানও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে।

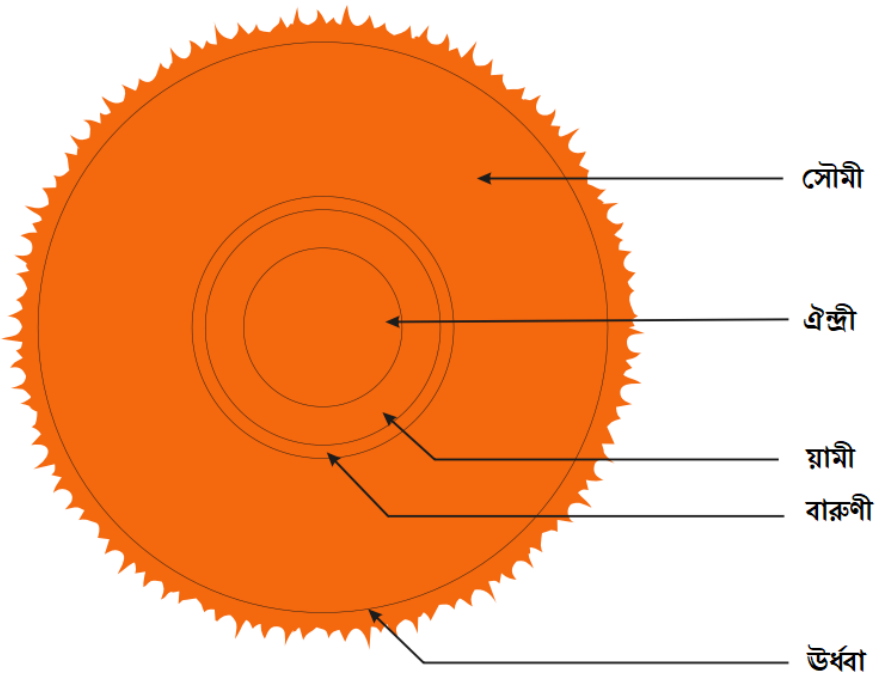

নক্ষত্রের পাঁচটি ক্ষেত্র

17.4 নক্ষত্রের ভেতরে পাঁচ প্রকারের বল এবং পদার্থ

নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অংশ তৈরির সময় পদার্থের সংকোচন হওয়ার সাথে-সাথে গুরুত্বাকর্ষণ বল এবং বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে পদার্থ কেন্দ্রের যত কাছে থাকে, সেখানে এই বল ততই অধিক প্রবল হয়। এই সময় নক্ষত্রের ভেতরে প্রধানত পাঁচ প্রকার বল কাজ করে —

1. প্রাণ এবং সূক্ষ্ম বাক্ রশ্মির মধ্যে ক্রিয়াশীল বল
2. প্রাণ এবং বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির মধ্যে ক্রিয়াশীল বল
3. বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির মধ্যে ক্রিয়াশীল বল
4. বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল
5. গুরুত্বাকর্ষণ বল

এই নক্ষত্রগুলোর অভ্যন্তরে বিদ্যমান পদার্থেরও পাঁচটি শ্রেণি আছে —

1. প্রাণ রশ্মি

2. ছন্দ রশ্মি

3. আকাশ রশ্মি

4. বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ

5. বিভিন্ন প্রকারের কণা

এই সমস্ত প্রকারের বল এবং পদার্থ নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে অত্যন্ত সক্রিয় থাকে। বিভিন্ন প্রকারের রশ্মি নক্ষত্রের ভেতরে বিভিন্ন প্রকারের বল উৎপন্ন করে উচ্চ তাপ এবং চাপ সৃষ্টি করে, আবার কিছু ছন্দ রশ্মি এই তাপ ও চাপকে নিয়ন্ত্রণও করতে থাকে, যার ফলে নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকে। কিছু ছন্দ রশ্মি কেন্দ্রীয় ভাগের পরিধিতে নিরন্তর সঞ্চারিত হয়ে সেই পরিধিকে সুনির্দিষ্ট রাখে, যার ফলে কেন্দ্রীয় ভাগ অন্য অংশ থেকে পৃথক থেকেও তার সাথে যুক্ত থাকে।

নক্ষত্রের নির্মাণ প্রক্রিয়া বোঝার আগে, আমরা এটি জানার চেষ্টা করবো যে, কণা এবং প্রতিকণার সংযোগে ঊর্জা উৎপন্ন হওয়ার ক্রিয়বিজ্ঞান কী? বর্তমান বিজ্ঞান কণা ও প্রতিকণার মিলনে তরঙ্গাণু তৈরির কথা তো বলে, কিন্তু এর প্রকৃত ক্রিয়াবিজ্ঞান কী, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য তাদের কাছে নেই। লক্ষণীয় যে, নক্ষত্র নির্মাণের পূর্বেই বিভিন্ন কণা এবং তাদের প্রতিকণা তৈরি হয়ে যায়। নির্মাণাধীন নক্ষত্রদের কেন্দ্রের নির্মাণে এদের সংযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই কারণে এদের ক্রিয়াবিজ্ঞান বোঝা অত্যন্ত আবশ্যক।

17.5 কণা ও প্রতিকণার সংযোগে ঊর্জা উৎপাদনের ক্রিয়াবিজ্ঞান

নেব্যুলার নির্মাণাধীন কেন্দ্রগুলোতে কণা ও প্রতিকণার মিলনে ঊর্জার উৎপত্তি এবং বাইরের পদার্থের কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হওয়ার গভীর বিজ্ঞান এখানে দেওয়া হয়েছে। ইলেকট্রন ও পজিট্রন, কোয়ার্ক ও অ্যান্টিকোয়ার্ক আদির সংযোগে ঊর্জা কেন এবং কীভাবে উৎপন্ন হয়? এই বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞান প্রায় নীরব। এখানে সেই গূঢ় বিজ্ঞানকেই উন্মোচিত করা হয়েছে। যখন কোনো কণা এবং প্রতিকণা উদাহরণস্বরূপ ইলেকট্রন এবং পজিট্রন পরস্পর নিকটে আসে, তখন নিম্ন ঘটনা ঘটিত হয় —

পজিট্রন আগ্নেয় তত্ত্ব (প্রাণ) প্রধান হওয়ার কারণে প্রাণের অপেক্ষাকৃত ঘন এবং মরুৎ রশ্মিগুলোর বিরল রূপ হয় এবং অন্যদিকে ইলেকট্রন সোম তত্ত্ব প্রধান হওয়ার কারণে প্রাণের বিরল এবং মরুৎ রশ্মিগুলোর ঘন রূপ হয়। যখন এই দুই কণা নিকটে আসে, তখন তাদের মধ্যে

প্রবল আকর্ষণ ক্রিয়া ঘটে। যখন দুটি কণার পরিমাণ সমান হয়, কিন্তু বিপরীত গুণযুক্ত আবেশ ছাড়া দ্রব্যমান আদি গুণের মধ্যেও অসমান হয়, তখন সেই কণা একে-অপরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি অপেক্ষাকৃত স্থূল ও সংযুক্ত কণার নির্মাণ করে। যেমন ইলেকট্রন ও প্রোটন সংযুক্ত হয়ে হাইড্রোজেন নির্মাণ করে। এই ধরণের কণাকে পরস্পর কণা ও প্রতিকণা বলা হয় না।

যখন ইলেকট্রন ও পজিট্রনের মতো সমান পরিমাণ কিন্তু বিপরীত বিদ্যুৎ আবেশ ছাড়া অন্য সমস্ত গুণ সমান হয়, তখন সেই কণা পরস্পর কণা-প্রতিকণা হিসেবে গণ্য করা হয়। এগুলোর মিলনের প্রক্রিয়া ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংযোগ প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন হয়। যখন কোনো ইলেকট্রন পজিট্রনের নিকটে যায়, তখন তাদের আকর্ষণের প্রক্রিয়া এতটাই তীব্র হয় যে তারা পরস্পর সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। সেই দুটির মাঝখানে কোনো অবকাশ বা আকাশ তত্ত্ব বিদ্যমান থাকে না। সেই সময় ইলেকট্রনের মরুৎ রশ্মি এবং পজিট্রনের ধনঞ্জয় আদি প্রাণ রশ্মিগুলো একে-অপরের দিকে দ্রুত প্রবাহিত হয়ে সম্পূর্ণ পদার্থকে মিশ্রিত করে দেয়। প্রাণ-অপান এবং বাক্ তত্ত্বের দ্বারা গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি থেকে এমন তীব্র ভেদক খদির রূপ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, যা ইলেকট্রন ও পজিট্রন অথবা যেকোনো কণা ও প্রতিকণার পূর্ণ মিশ্রিত পদার্থকে একসাথে আবৃত করে তরঙ্গাণু রূপ প্রদান করে। এই তরঙ্গাণু অত্যধিক শক্তি ও গতি সম্পন্ন হয়। এই তরঙ্গগুলোর অনুপস্থিতিতে কোনো কণা এবং প্রতিকণাই তরঙ্গাণুর রূপ ধারণ করতে পারে না।

যখন আবেশহীন নিউট্রন আদি কণাগুলো তাদের প্রতিকণার সাথে মিলিত হয়, তখন তাদের বিপরীত ঘূর্ণনের ফলে উৎপন্ন বল তাদের পরস্পরকে জুড়ে দেয়। এরপর তাদের থেকে তরঙ্গাণু তৈরির প্রক্রিয়াও পূর্বোক্ত নিয়মে ঘটে। এইভাবে গামা কিরণ উৎপন্ন হয়ে অতিশয় ভেদন ক্ষমতার সাথে নির্গত হয়।

এই প্রক্রিয়াকে নিচের চিত্রের মাধ্যমে বুঝুন —

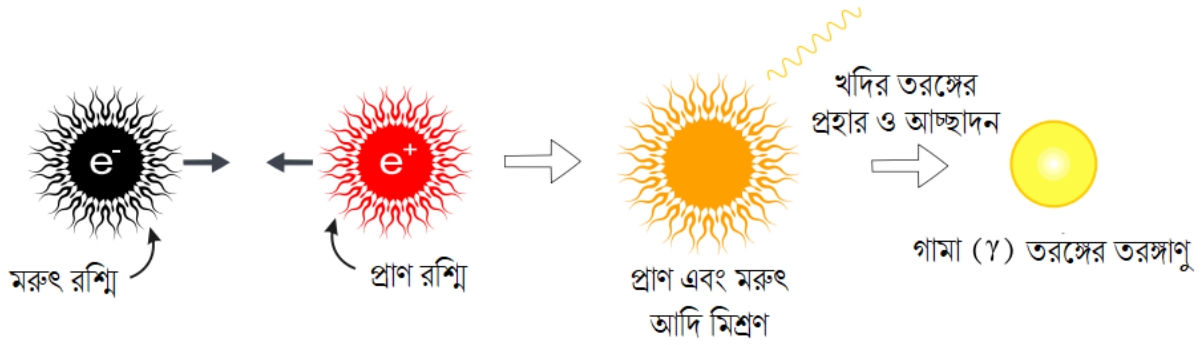

প্রতিকণার সংযোগ থেকে তরঙ্গাণুর উৎপত্তি

নক্ষত্রের নির্মাণ

এর পরে, নেব্যুলাগুলোর সম্পূর্ণ অংশে মন, বাক্ বা প্রাণগুলো থেকে এক প্রকারের পলাশ নামক তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এগুলো উৎপন্ন হওয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যুৎ আবেশিত কণা তৈরি হতে শুরু করে। বিল্ব তরঙ্গের সাথে এদের সংযোগের ফলে সূক্ষ্মতম বৈদ্যুতিক আবেশিত কণাগুলো মিলিত হয়ে অন্য স্থূল আবেশিত কণার নির্মাণ হতে শুরু করে। এই সময়েই সূক্ষ্ম নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক তৈরি হতে শুরু করে। এর কারণে নেব্যুলা বা নক্ষত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ আবেশিত কণার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। কণাগুলো প্রতিকণার সাথে মিলিত হয়ে ঊর্জা উৎপন্ন করার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং বড়-বড় বৈদ্যুতিক-ক্ষেত্র উৎপন্ন হতে থাকে। এসব কারণে সম্পূর্ণ পদার্থ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেকোনো নেব্যুলা বা নক্ষত্রের পৃথক-পৃথক পরিচয় তাদের দ্বারা নির্গত রশ্মির মাধ্যমেই জানা যায়। এখন পর্যন্ত নাভিকীয় (নিউক্লীয়) সংযোজনের মতো প্রক্রিয়াগুলো শুরু হতে পারে না। এই তরঙ্গগুলোর প্রভা ব নেব্যুলা বা নক্ষত্রের আকর্ষণ বলের উপরেও হয়।

নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে দুই প্রকারের ঊর্জা থাকে। একটি হল সেই ঊর্জা, যা নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই ঊর্জা নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য অপরিহার্য হয়। এর পরে যে ঊর্জা নিউক্লীয় সংযোজন থেকে উৎপন্ন হয়, সেই নতুন ঊর্জাও আগে থেকে বিদ্যমান ঊর্জার সাথে মিশতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সীমার পরে অতিরিক্ত ঊর্জা নক্ষত্র থেকে বাইরে নির্গত হয়ে যায়। এই কাজে একটি গায়ত্রী ছন্দ রশ্মির বিশেষ অবদান থাকে।

নিউক্লীয় সংযোজন থেকে উৎপন্ন ঊর্জা নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে বিদ্যমান ঊর্জার চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ হয়। এই ঊর্জা আগে থেকে বিদ্যমান ঊর্জার ক্ষেত্রে ক্রমাগত গমন করে এবং পরে সেই ঊর্জাকে ভেদ করে নক্ষত্রের অন্য অংশে সঞ্চারিত হয়ে মহাকাশে নির্গত হয়ে যায়। এই সম্পূর্ণ কাজে একটি সান্নী ত্রিষ্টুপ ছন্দ রশ্মি বিশেষভাবে উপযোগী হয়। এটি এই দুই প্রকারের ঊর্জার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অংশে বিদ্যমান উভয় প্রকারের ঊর্জা নিজ-নিজ সীমার মধ্যে থেকে প্রতিটি কণাকে আলোকিত করে। উভয় প্রকারের ঊর্জার মধ্যে এই সমতা বিদ্যমান আছে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হল — সংযোজনের পূর্বে উৎপন্ন ঊর্জা নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে এবং সেখানে বিদ্যমান প্রতিটি পদার্থকে পরিব্যাপ্ত করে রাখে, অথচ সংযোজন থেকে উৎপন্ন ঊর্জা কেবল কেন্দ্রীয় ভাগেই নয়, বরং সমগ্র নক্ষত্র মণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করে। এই

উভয় ঊর্জাকে সমৃদ্ধ করার জন্য একটি গায়ত্রী ছন্দ রশ্মি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

17.6 নক্ষত্রের নির্মাণ

বস্তুত, বিভিন্ন গ্যালাক্সির কেন্দ্র এবং সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান নক্ষত্রগুলো একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়ার পরেই নির্মিত হয়, তারপর সেগুলো তাদের স্থায়ী কক্ষপথ ও গতি প্রাপ্ত করতে পারে। এই প্রক্রিয়াতে লক্ষ-লক্ষ বছর সময় লাগে; এই প্রক্রিয়াটি কোনো অলৌকিক ঘটনা নয় যে হঠাৎ করে ঘটে যাবে। কোনো লোক যত বড় হয় অথবা নিজের কেন্দ্রীয় নক্ষত্র থেকে যত দূরে থাকে, তার স্থায়ী কক্ষপথ প্রাপ্ত হতে তত বেশি সময় লাগে। এদের মধ্যে যেগুলো কেন্দ্রীয় এবং আধার রূপ নক্ষত্র হয়, সেগুলো তাদের অধীনস্থ লোকগুলোর তুলনায় আকার, তাপ, আলো এবং দ্রব্যমানের দিক থেকে অনেক বড় হয়।

যখন ব্রহ্মাণ্ডে অগ্নি ও সোম পদার্থ কিংবা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণা সর্বত্র উৎপন্ন হয়ে যায়, তখন কোনো বিশেষ অংশে অথবা ভবিষ্যৎ কেন্দ্রীয় ভাগে হঠাৎ এমন কিছু বজ্র রূপ রশ্মি উৎপন্ন হয়, যা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আবেশযুক্ত কণাগুলোর ঊর্জাকে সেই স্তর পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে সেগুলো একে-অপরের সাথে মিশে ঊর্জাতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। অন্য কণা এবং প্রতিকণাও একত্রে এই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে। যখন এই ঊর্জা সেই নবনির্মিত কেন্দ্রীয় ভাগ থেকে বাইরের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে, তখন সেই বজ্র রূপ কিরণগুলোও তার সাথে নির্গত হতে থাকে। এরপর মনুষ্য নামক কণা, যাদের গতি অনিয়মিত এবং যারা স্বল্প আলো ও স্বল্পায়ু বিশিষ্ট হয়, সেগুলো এবং বিভিন্ন ঋষি প্রাণ বজ্র রূপ কিরণের প্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে সেই কিরণগুলোকে পুনরায় কেন্দ্রীয় ভাগের দিকে প্রতিফলিত করে দেয় এবং এরপর সেগুলো তাদের সাথেই পুনরায় কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ব্রহ্মাণ্ডে নেব্যুলা কীভাবে জন্ম নেয়? কীভাবে ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা পদার্থ ঘনীভূত হতে শুরু করে? কীভাবে গুরুত্বাকর্ষণ বল হঠাৎ এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হতে শুরু করে? এই অত্যন্ত গম্ভীর প্রশ্নগুলোর অত্যন্ত গভীর সমাধান এখানে দেওয়া হয়েছে। কণা ও প্রতিকণা মিলে ঊর্জাতে রূপান্তরিত হওয়া এবং পরবর্তীতে সেই ঊর্জার নির্গমনের ফলে তৈরি হওয়া রিক্ত স্থানই সমস্ত পদার্থকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রক্রিয়াতে সর্বপ্রথম তাদের কেন্দ্রগুলো নির্মাণের কাজ শুরু হয়। নক্ষত্রের কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া বিভিন্ন ধাপে সম্পন্ন হয়, যারমধ্যে সর্বপ্রথম সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ এবং তার থেকেও সূক্ষ্ম ধনঞ্জয়, ব্যান এবং সূত্রাত্মা বায়ুর দ্বারা কোনো একটি বিশেষ স্থানে আকাশের সংকোচন শুরু হয়।

এরপর সেই কেন্দ্রের চারপাশে বিদ্যমান পদার্থের মধ্যে হালকা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, যার ফলে বিভিন্ন কণা কম্পিত হতে থাকে। পরবর্তী ধাপে আকর্ষণের প্রক্রিয়া তীব্র হয়, তারপর সেগুলো পরস্পর বিভিন্ন মরুৎ, ছন্দ এবং প্রাণ রশ্মির কারণে আবেশিত হয়ে ওঠে এবং তাদের পরস্পর সঙ্গম শুরু হয়। ধীরে-ধীরে গুরুত্বাকর্ষণ বলের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় পদার্থগুলো আরও দ্রুত ঘনীভূত হতে থাকে এবং গুরুত্বাকর্ষণ বলের চাপের কারণে সেই অঞ্চলে তাপ ও চাপ এতটাই বেড়ে যায় যে বিভিন্ন নিউক্লিয়াস পরস্পর একত্রিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে ঊর্জা উৎপন্ন করতে শুরু করে। এই সময়ে নক্ষত্রের নির্মাণাধীন কেন্দ্রের চারপাশে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয় এবং সম্পূর্ণ পদার্থ দ্রুত সেই কেন্দ্রীয় পদার্থের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। ডার্ক এনার্জি এবং ডার্ক ম্যাটারের বাধক প্রভাব ধীরে-ধীরে প্রায় শেষ হয়ে যায়। এই সময়ে অত্যন্ত গভীর ধ্বনি তরঙ্গও উৎপন্ন হয়। বাইরের দিক থেকে প্রবাহিত পদার্থ গ্যাসীয় রূপে এবং জলধারার মতো দ্রুত গতিতে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়। এই সময়ে বিভিন্ন ছন্দাদি রশ্মিও তেজ যুক্ত হয়ে পরস্পর সঙ্গত ও একত্রিত হতে থাকে। এই প্রক্রিয়াতে অনেক ধরণের নতুন কণা ও তরঙ্গ তথা নিউক্লিওসিন্থেসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের নিউক্লিয়াস বা অণুর নির্মাণও দ্রুত গতিতে হয়। এই সময়ে সূত্রাত্মা বায়ু এবং মনস্তত্ত্বের কারণে বিদ্যুৎ বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে কেবল নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়াই ঘটে না, বরং বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির সংকোচনের ফলে বিভিন্ন ধরণের মূল কণিকারও উৎপত্তি হয়।

নক্ষত্র নির্মাণের সময় কেন্দ্রীয় ভাগে ঘটা নিউক্লীয় সংযোজনের প্রক্রিয়াগুলোও এই পদ্ধতির মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে বিভিন্ন কণার সংযোজনের জন্য পৃথক-পৃথক বিশেষ উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। এই নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কম তাপমাত্রা হলে কেন্দ্রীয় ভাগে নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন বা শুরু হতে পারে না এবং প্রয়োজনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি তাপমাত্রা হলে নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত হওয়ার ফলে বিকিরণের চাপ অত্যধিক বেড়ে যেতে পারে। এর ফলে নক্ষত্রে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এই কারণে এই ব্রহ্মাণ্ডে অনেক শ্রেণির নক্ষত্র বিদ্যমান আছে, যাদের কেন্দ্রীয় ভাগে ভিন্ন-ভিন্ন ধরণের কণার সংযোজন ঘটে এবং এর জন্য তাদের কেন্দ্রে তাপ ও চাপের মাত্রাও ভিন্ন-ভিন্ন হয়।

নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে অথবা সেদিকে ধাবমান বিভিন্ন ধরণের কণা অনেক তীব্র ঊর্জা সম্পন্ন রশ্মিকে শোষণকারী হয়। যখন কোনো কোস্মিক মেঘের মধ্যে কোনো নক্ষত্রের জন্ম হয়, তখন সর্বপ্রথমে একটি বিন্দু-সদৃশ কেন্দ্রীয় অংশে বিভিন্ন প্রাণ ও বাক্ রশ্মি তীব্র বলের সাথে যুক্ত

হয়ে দ্রুত সঙ্গত হতে থাকে। ধীরে-ধীরে সেই বিন্দুরূপ স্থানটি বিস্তার লাভ করে কোস্মিক মেঘকে নিজের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতে শুরু করে। এর সাথে-সাথেই কোস্মিক মেঘ থেকে নিঃসৃত অনেক প্রকার রশ্মি সেই কেন্দ্রীয় অংশের দিকে আসতে থাকে। ধীরে-ধীরে এই অংশটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে একটি নক্ষত্রের জন্ম দেয়।

17.7 কণা এবং নক্ষত্রের মধ্যে সাদৃশ্য

যেকোনো বিদ্যুৎ আবেশযুক্ত কণা অভ্যন্তরীণ কাঠামোর দিক থেকে একটি নক্ষত্রের মতোই হয়, যদিও এই সাদৃশ্য সম্পূর্ণ নয়, বরং আংশিকই হয়। উভয়ের মধ্যেই উত্তর ও দক্ষিণ মেরু চুম্বকীয় মেরুর মতো আচরণ করে। নক্ষত্র তথা কণার পূর্ব দিকে প্রাণ-অপান আদি প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি মৃদুরূপে বিদ্যমান থাকে, যেখানে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ মেরুর দিকে এই প্রাণ রশ্মিগুলো অত্যন্ত তীব্র অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। পশ্চিম দিকে সংযোজক বল সমৃদ্ধ বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি বিদ্যমান থাকে। উত্তর দিকে কিছু এমন ছন্দ রশ্মি থাকে, যার কারণে সেই কণাটি এই দিকে বিশেষ ক্রিয়াশীলতা এবং ধারণ শক্তিকে প্রকাশ করে।

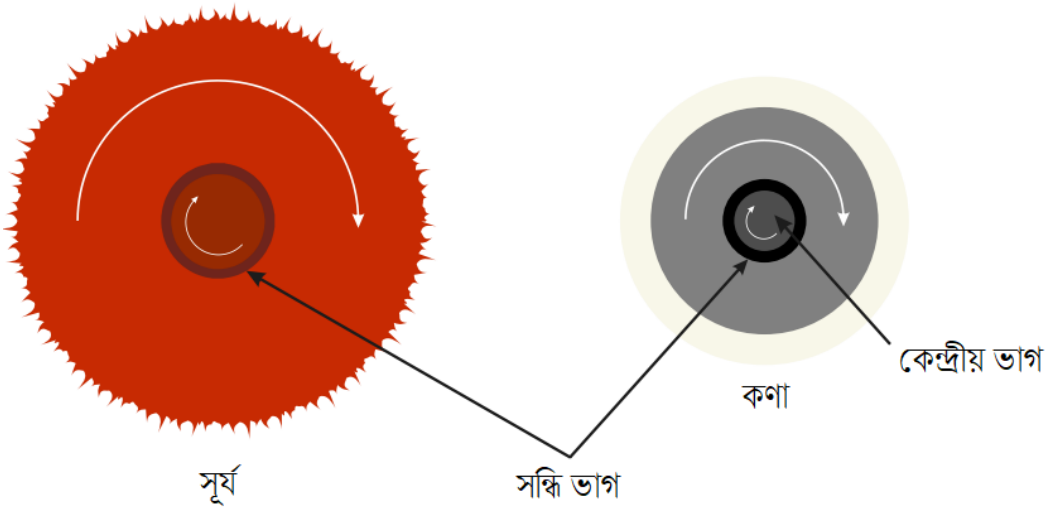

নক্ষত্রের উত্তর দিকে এই গুণসম্পন্ন কণা ও তরঙ্গের আধিক্য থাকে। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়াযুক্ত কেন্দ্রীয় অংশ তথা অবশিষ্ট বিশাল অংশের মাঝখানে যে সন্ধি ভাগ বিদ্যমান থাকে, তার উপর উভয় অংশ পিছলে-পিছলে গতি করতে থাকে, এমনই গঠন প্রত্যেক বিদ্যুৎ আবেশযুক্ত কণারও হয়। সেই কণা ইলেকট্রন বা কোয়ার্ক যেকোনো হতে পারে। বর্তমান বিজ্ঞান ইলেকট্রনকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ আবেশযুক্ত কণার মেঘরূপে মানতে শুরু করেছে, কিন্তু তারা কোয়ার্কের গঠন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আছে। বৈদিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই উভয় কণার গঠন নক্ষত্রের মতোই হয়। এদের মধ্যেও কেন্দ্রীয় অংশ এবং অবশিষ্ট বিশাল

অংশের মাঝে একটি সন্ধি ভাগ বিদ্যমান থাকে, যার উপর উভয় অংশ পিছলে-পিছলে ঘুরতে থাকে। এই সন্ধি অংশটি স্থির অথবা অত্যন্ত ধীর গতিসম্পন্ন হয়। এই অংশের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ রশ্মি এই কণা অথবা নক্ষত্র, উভয়ের মধ্যেই বিদ্যমান থাকে। এই রশ্মিগুলোর দৃঢ় বল উভয় অংশকে একত্রে ধরে রাখে। উভয়ের কেন্দ্রীয় অংশ বিভিন্ন প্রাথমিক প্রাণ এবং মরুৎ রশ্মি দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়।

17.8 আমাদের সূর্যের কেন্দ্রের ব্যাসার্ধ

মহর্ষি ঐতরেয় মহীদাস আমাদের সূর্যের কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাসার্ধের পরিমাপ বর্ণনা করেছেন — **সহস্রমনূচ্যম্ স্বর্গকামস্য সহস্রাশ্বীনে বা ইতঃ স্বর্গো লোকঃ।**

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ 2.17.3)

অর্থাৎ সূর্যের কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাসার্ধ হল এক অশ্বিন এবং সূর্যের কেন্দ্রের বাইরের অংশ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হল এক হাজার অশ্বিন। এইভাবে পৃথিবী থেকে সূর্যের কেন্দ্রের দূরত্ব 1001 অশ্বিন হবে।

অর্থাৎ, সূর্যের কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাসার্ধ $ব্র_{সূর্য} = \frac{দ_{পৃথ্বী \rightarrow সূর্য}}{1001}$

এখানে $দ_{পৃথ্বী \rightarrow সূর্য}$ = পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে সূর্যের কেন্দ্রের দূরত্ব আছে।

উদাহরণ — যদি সূর্যের উপরিপৃষ্ঠ এখান থেকে প্রায় 15 কোটি কিমি দূরে অবস্থিত এবং সূর্যের ব্যাসার্ধ 6,96,000 কিমি হয়, তবে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের কেন্দ্রের দূরত্ব হবে

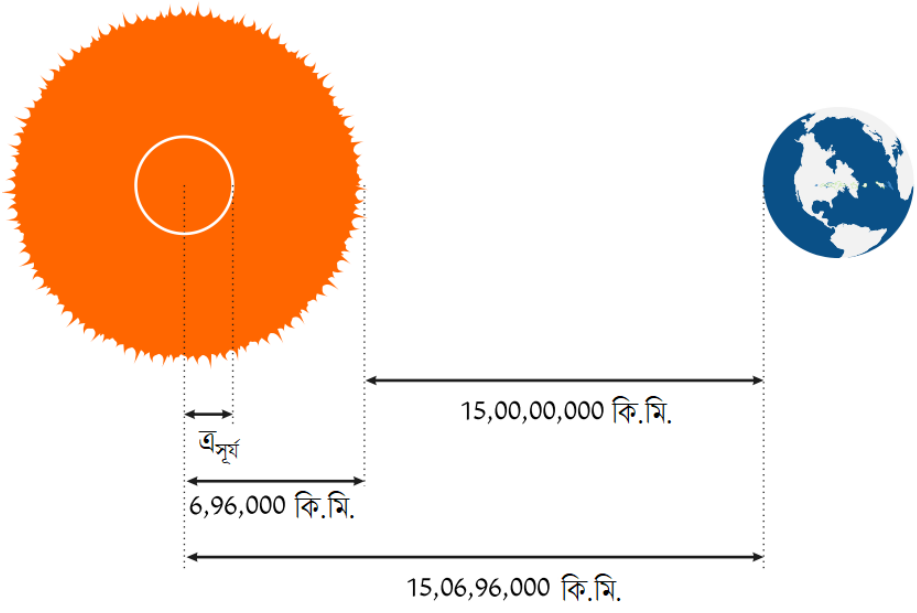

নক্ষত্রের নির্মাণ

15,06,96,000 কিমি। উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী **সূর্যের কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাসার্ধ** $ত্র_{সূর্য}$ = 1,50,545 কিমি.

17.9 ব্রহ্মাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ সপ্তক

ব্রহ্মাণ্ডে নক্ষত্রের মোট সাতটি শ্রেণী আছে। বর্তমান বিজ্ঞানীরাও নক্ষত্রের অনেক শ্রেণী স্বীকার করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের কণাগুলোকেও সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থ প্রাথমিক প্রাণ, ছন্দ প্রাণ, আকাশ তত্ত্ব, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী রূপে আছে, যা হল বর্তমান বিজ্ঞানের মূলকণার বিভাজনের তুলনায় অধিক ব্যাপক এবং মৌলিক। এই ব্রহ্মাণ্ডে গ্যালাক্সিও সাত প্রকারের হয়, যাদের ওপর বর্তমান বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করা উচিত। এই ব্রহ্মাণ্ডে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতুর মতো লোকও সাত প্রকারের আছে। এই সবকিছুর নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ ও সঞ্চালনে প্রধানত সাত প্রকারের ছন্দ প্রাণ এবং সাত প্রকারের প্রাথমিক প্রাণ যেমন — প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, ধনঞ্জয় এবং সূত্রাত্মা বায়ুর ভূমিকা থাকে।

স্মরণীয় তথ্য

1. নক্ষত্রের প্রধান পাঁচটি ভাগ আছে, এই পাঁচটি ভাগের নাম হল — লোম, ত্বক, মাংস, অস্থি ও মজ্জা।
2. বিভিন্ন প্রকারের রশ্মি নক্ষত্রের ভেতরে বিভিন্ন ধরণের বল সৃষ্টি করে উচ্চ তাপ ও চাপ উৎপন্ন করে।
3. কিছু ছন্দ রশ্মি এই তাপ ও চাপকে নিয়ন্ত্রণও করে, যার ফলে নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকে।
4. কিছু ছন্দ রশ্মি কেন্দ্রীয় অংশের পরিধিকে সুনিশ্চিত বজায় রাখে, যার ফলে কেন্দ্রীয় অংশ অন্য অংশ থেকে পৃথক থেকেও তার সাথে যুক্ত থাকে।
5. যখন দুই প্রকারের কণা সমান মাত্রা, কিন্তু বিপরীত গুণযুক্ত আবেশ ছাড়া দ্রব্যমান আদি গুণাবলীতেও অসমান হয়, তখন সেই কণাগুলো একে-অপরের সাথে আবদ্ধ হয়ে অপেক্ষাকৃত একটি স্থূল ও সংযুক্ত কণা তৈরি করে।
6. যখন দুই কণার মধ্যে সমান মাত্রা কিন্তু বিপরীত বিদ্যুৎ আবেশ ছাড়া অন্য সব গুণাবলী সমান

হয়, তখন তাদের আকর্ষণের প্রক্রিয়া এতটাই তীব্র হয় যে সেই দুটি কণা পরস্পর পূর্ণ রূপে মিশ্রিত হয়ে পদার্থকে একসাথে আবৃত করে তরঙ্গাণু রূপ প্রদান করে।

7. যখন আবেশহীন নিউট্রন আদি কণা তাদের প্রতিকণার সাথে সংযোগ হয়, তখন তাদের বিপরীত ঘূর্ণনের ফলে উৎপন্ন বল উভয়কে পরস্পর জুড়ে দেয়।
8. নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় ভাগে দুই ধরণের ঊর্জা থাকে। একটি হল যা নিউক্লীয় সংযোজন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে উৎপন্ন হয় এবং দ্বিতীয়টি যা নিউক্লীয় সংযোজন থেকে উৎপন্ন হয়।
9. নক্ষত্র একটি দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়ার পশ্চাৎই নির্মিত হয়, তারপর সেটি নিজের স্থায়ী কক্ষপথ ও গতি প্রাপ্ত করে। এই প্রক্রিয়াতে লক্ষ-লক্ষ বছর সময় লাগে।
10. যে জগত যত বড় হয় অথবা নিজের কেন্দ্রীয় নক্ষত্র থেকে যত দূরে থাকে, তার স্থায়ী কক্ষপথ প্রাপ্ত হতে তত বেশি সময় লাগে।
11. মনুষ্য নামক কণা স্বল্প প্রকাশবান্, অল্পায়ু এবং অনিয়মিত গতিযুক্ত হয়।
12. সূর্যের কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাসার্ধ $ত্র_{সূর্য} = \frac{দ_{পৃথ্বী \rightarrow সূর্য}}{1001}$ (এখানে $দ_{পৃথ্বী \rightarrow সূর্য}$ = পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে সূর্যের কেন্দ্রের দূরত্ব।)

অনুশীলনী

1. কণা ও প্রতিকণার সংযোগে ঊর্জা উৎপত্তির ক্রিয়াবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করুন।
2. নক্ষত্রের কেন্দ্রে দুই প্রকার ঊর্জা কী কী ?
3. যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে সূর্যের উপরিভাগের দূরত্ব 10 কোটি হয়, তবে সূর্যের কেন্দ্রের ব্যাসার্ধ কত হবে ?
4. নক্ষত্রের প্রধান পাঁচটি অংশ কী কী ? বিস্তারিত বুঝিয়ে বলুন।
5. বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিতে নক্ষত্রের অভ্যন্তরে কোন-কোন বল কাজ করে ?
6. কণা এবং নক্ষত্রের মধ্যে কী সাদৃশ্য আছে ?
7. নিউক্লীয় সংযোজনের ভিত্তিতে নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে পার্থক্য কী ?
8. নক্ষত্রের কেন্দ্র গঠনের প্রক্রিয়াটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন।

* * * * *

18 অধ্যায়

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ

সৃষ্টির উৎপত্তি প্রক্রিয়াতে তরঙ্গাণুর উৎপত্তির ঘটনা হল বর্তমান ভৌতিকীর দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বৈদিক ভৌতিকীর দৃষ্টিতে এই ঘটনা অনেকগুলো ধাপের পশ্চাৎ ঘটে, তবুও এই ঘটনা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ, নক্ষত্র নির্মাণের পূর্বেই বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির সংকোচনের ফলে উৎপন্ন হয়। তারপরে তিন প্রকারের ছন্দ রশ্মিসমূহ উৎপন্ন হয়ে নক্ষত্র নির্মাণের প্রক্রিয়াকে জন্ম দেয়। এই তিনটি ছন্দ রশ্মি উৎপত্তিরও একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে। সৃষ্টির শুরুতে বিভিন্ন মূলকণার উৎপত্তির পূর্বে ছন্দ রশ্মি এবং প্রাণ রশ্মির সংকোচনের ফলে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। এরপর এই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ থেকেই বিভিন্ন মূলকণার উৎপত্তি হয়।

18.1 তরঙ্গের বিভাগ

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় এবং বিদ্যুৎ আবেশিত তরঙ্গের কিছু বিভাগের বর্ণনা নিচে দেওয়া হল —

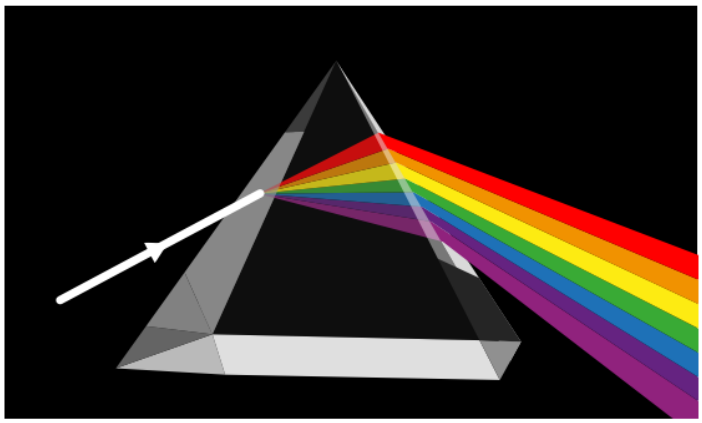

1. কালী — এগুলো হল শুক্লাদি রঙের প্রকাশ ঘটানো বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। এর অর্থ হল এই কিরণগুলো দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ, যারমধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান সাতটি রঙ — বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল রঙের অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই সবগুলো মিলে সাদা রঙের রূপ ধারণ করে তথা সমস্ত রঙ শোষিত হলে কালো রঙের উৎপত্তি হয়।

2. করালী — এই কিরণগুলো অত্যন্ত ঊর্জাযুক্ত এবং ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। গামা কিরণ, বিশেষ করে কোস্মিক গামা কিরণকে এই শ্রেণির কিরণে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। অন্য গামা ও এক্স-রে-ও এই শ্রেণিতে গণ্য করা যেতে পারে।

3. মনোজবা — অর্থাৎ মনের সমান গতিসম্পন্ন কিরণ। আমরা জানি যে মনের রশ্মি কোনো

বাধা ছাড়াই সর্বত্র গতিবিধি করতে পারে। এদের কোনো প্রকার বাধা দিয়ে আটকানো সম্ভব নয়। ব্রহ্মাণ্ড থেকে আসা নিউট্রিনোকে এই শ্রেণিতে রাখা যেতে পারে।

4. সুলোহিতা — অর্থাৎ সুন্দর লাল রঙের কিরণ। আমরা পূর্বে কালী কিরণের মধ্যে লাল রঙের দৃশ্যমান আলোক কিরণগুলোও গ্রহণ করেছি। এতে অবলোহিত তরঙ্গকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই কিরণগুলোর রঙও লাল হয়, কিন্তু এদের খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। সব রঙ ও রূপ প্রকাশযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃশ্যমান আলোর সীমার মধ্যে আসে না বলে এদের দেখা যায় না। এর অর্থ এই নয় যে তাদের কোনো রঙ নেই।

5. সুধূম্রবর্ণা — অর্থাৎ সুন্দর ধোঁয়ার রঙের মতো। অতিবেগুনি কিরণ এই শ্রেণিতে আসতে পারে। সম্ভবত এদের রঙ সুন্দর বেগুনি হয়, কিন্তু দৃশ্যমান আলোর শ্রেণিতে না আসায় এদের দেখা যায় না। এই বেগুনিতে নীল, সাদা, কালো আদিরও কিছু মিশ্রণ থাকতে পারে।

6. স্ফুলিঙ্গিনী — অর্থাৎ যারমধ্যে অনেক প্রকারের কণা তরঙ্গ রূপে প্রবাহিত হয়। আমার মতে ব্রহ্মাণ্ডে বা যেকোনো নক্ষত্র থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন আদি বিদ্যুৎ আবেশিত কণাও প্রতিনিয়ত এই মহাকাশে নির্গত হতে থাকে। এগুলোও নিজস্ব এক প্রকার আলো উৎপন্ন করে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে মেরুজ্যোতি (Aurora) রূপে যে সুন্দর আলো দেখা যায়, তা এদেরই রূপ বলে পরিচিত।

7. বিশ্বরূপী — এগুলোতে উপরোক্ত কিরণগুলোর সমস্ত গুণ কিছু-কিছু অংশে বিদ্যমান থাকে। রেডিও তরঙ্গকে এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতে পারে।

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ

18.2 তিন প্রকারের অতি দ্রুতগামী পদার্থ

এই সৃষ্টিতে নিম্নোক্ত তিন প্রকারের পদার্থ অতি দ্রুতগামী এবং প্রকাশযুক্ত হয় —

1. বিভিন্ন ছন্দ ও প্রাণ রশ্মি

2. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ

3. অন্য ব্রহ্মাণ্ডীয় বিকিরণ

বর্তমান বিজ্ঞান বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে সর্বাধিক দ্রুতগামী মনে করে, কিন্তু আমার মত হল, কিছু ছন্দ ও প্রাণ রশ্মি বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তুলনায় অধিক দ্রুতগামী হয়। বর্তমান বিজ্ঞান কোনো প্রযুক্তির মাধ্যমেই এই রশ্মিগুলোকে সরাসরি অনুভব করতে পারে না এবং তাদের গতি পরিমাপ করতেও সক্ষম নয়। তবে বিজ্ঞান যখন অতি উন্নত হবে, তখন তা ছন্দ ও প্রাণ রশ্মির স্থূল প্রভাবগুলোকে অবশ্যই জানতে পারবে। এই সকল পদার্থ বিভিন্ন প্রকারের সূক্ষ্ম প্রাণ রশ্মির জাল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। সেই প্রাণ-জালই ওই বিকিরণ ও রশ্মিগুলোকে গতি প্রদান করে এবং একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে রাখে। এদের মধ্যে প্রথম সর্বাধিক গতিশীল রশ্মিগুলোর সাথে মনস্তত্ত্ব পূর্ণরূপে সংযুক্ত থাকে, কিন্তু প্রাণাদি প্রাথমিক প্রাণ তত্ত্বের সাথে আচ্ছাদন পূর্ণ রূপে থাকে না। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে ছন্দ রশ্মি এবং প্রাণাদিরও সংযোগ থাকে। ধনঞ্জয় প্রাণের কারণে এদের গতি অতি তীব্র হয়। এই তিন প্রকারের পদার্থ বিভিন্ন সূক্ষ্ম কণাকে বহন করতে, সংযোগাদি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে এবং তাদের বল ও তেজ প্রদান করতে সক্ষম হয়।

18.3 বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তি

এই ব্রহ্মাণ্ডে যখন বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ রশ্মি, বিভিন্ন প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি এবং আকাশ তত্ত্ব দ্বারা সংকুচিত হয়, তখন বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সর্বপ্রথম দুর্বল তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, যাকে আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানের ভাষায় রেডিও তরঙ্গ বলা যেতে পারে। এর পরে তাপ ও আলোক তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, যাতে বিভিন্ন বর্ণ (রঙ) বিদ্যমান থাকে। সবশেষে এক্স-রে এবং গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়, যা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। এই কিরণের তরঙ্গাণু প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি এবং আকাশ তত্ত্বের দ্বারা বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির সংকোচনের ফলে উৎপন্ন হয়।

সব ধরণের তরঙ্গাণু প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, বিশেষ করে প্রাণ, অপান এবং উদান নামক রশ্মি দ্বারা। আর এগুলো ধনঞ্জয় প্রাণের দ্বারা গতিশীল হয়। এই ধনঞ্জয় প্রাণের কারণেই বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সর্বাধিক গতিশীল হয়। বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের

ঊর্জা অর্থাৎ আবৃত্তি এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, সেই তরঙ্গের তরঙ্গাণুগুলো কোন ছন্দ রশ্মির সংকোচন থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, প্রাণ, অপান, উদান আদি রশ্মির সাথে সেই ছন্দ রশ্মিগুলোর সমূহ কীভাবে তৈরি ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বিভিন্ন আবৃত্তির ভিত্তিতে আলো, তাপ, অতি-বেগুনি, গামা, রেডিও আদি তরঙ্গের বিভাজন মেনে চলে এবং এদেরও অসংখ্য স্তরগুলোকে স্বীকার করে। আলোর মূলত সাতটি রঙ, বস্তুতঃ অসংখ্য রঙ এই তরঙ্গগুলোর আবৃত্তির উপরই নির্ভর করে, কিন্তু আবৃত্তিগুলোর ভেদ এবং তরঙ্গাণুগুলো নির্মাণের কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের জানা নেই, তবে বৈদিক বিজ্ঞান এরথেকে অনেক এগিয়ে বিভিন্ন ছন্দ রশ্মির সংকোচনের মাধ্যমে নানা ধরনের তরঙ্গের উৎপত্তি, বিশেষ করে তরঙ্গাণু উৎপত্তির গভীর বিজ্ঞান উপস্থাপন করে।

18.4 তরঙ্গের সুপার পজিশনের ক্রিয়াবিজ্ঞান

ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণকারী তরঙ্গ বা কণা একটি নির্দিষ্ট এবং সুরক্ষিত পথেই গমন করে। এটমের ভেতরে ইলেকট্রন বা ব্রহ্মাণ্ডে গতিশীল বিভিন্ন তরঙ্গ বা কিরণ যেকোনো অন্য তরঙ্গের সাথে ধাক্কা খেয়েও নিজেদের পথ থেকে বিচ্যুত হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান তরঙ্গের এই ক্ষণস্থায়ী মিলনকে সুপারপজিশন নাম দেয়, এই সুপারপজিশনের ঠিক পরেই তরঙ্গগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজেদের আগের পথেই এগিয়ে চলে। যদি এমনটা না হতো, তাহলে সারা ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বনি সঞ্চার ব্যবস্থা স্থবির হয়ে যেত।

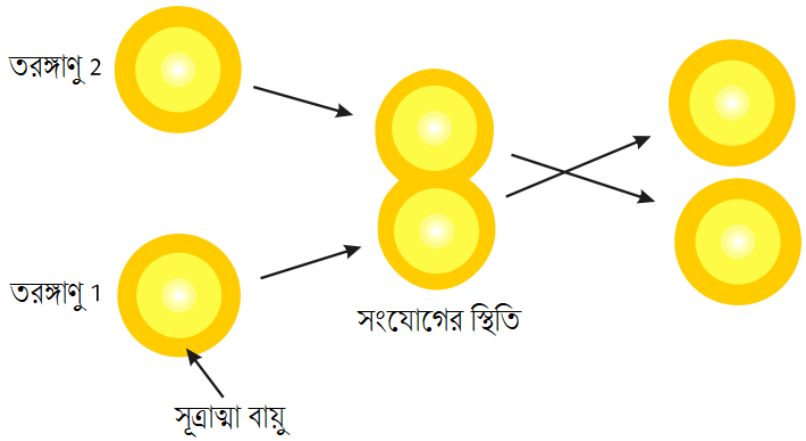

সুপার পজিশনের প্রক্রিয়া

বিভিন্ন প্রকাশ তরঙ্গের বাধিত হওয়ার কারণে কোনো কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না এবং অন্য ভয়াবহ উপদ্রব সৃষ্টি হয়, কিন্তু সর্বনিয়ন্তা চেতন তত্ত্বের সুব্যবস্থার কারণে সকলের পথ নিরাপদ থাকে। এই নিরাপত্তার কারণ হল প্রাণযুক্ত সূত্রাত্মা বায়ু।

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ

উপরোক্ত চিত্রের মধ্যে প্রথম স্থিতিতে তরঙ্গাণু 1 ও তরঙ্গাণু 2 নির্দিষ্ট দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সূত্রাত্মা বায়ু তরঙ্গ রূপে সবাইকে ব্যাপ্ত করে আছে বলে মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে তরঙ্গাণুগুলোর পরিধিরূপেও সূত্রাত্মা বায়ু বিশেষভাবে বিদ্যমান আছে। ধনাঞ্জয় প্রাণ উভয় কণাকেই নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় স্থিতিতে উভয় তরঙ্গাণু অত্যন্ত নিকটে পৌঁছে যায়, কিন্তু তারা পরস্পরকে পূর্ণরূপে স্পর্শ করতে পারে না। উভয়ের মাঝে সূত্রাত্মা বায়ু ও অন্য কিছু প্রাণের আবরণ অবশ্যই কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখে, কিন্তু সূত্রাত্মা বায়ুর অন্য একটি আবরণ উভয় তরঙ্গাণুকে সংযুক্তভাবে আচ্ছাদিত করে ফেলে, যার ফলে উভয় তরঙ্গাণুর আকৃতি সংযুক্ত হয়ে ক্ষণিকের জন্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে ধনাঞ্জয় প্রাণ উভয়ের দিক পরিবর্তন হতে দেয় না, এই সংযুক্ত আকৃতিই সুপার পজিশন রূপে দেখা যায়। এরপর তৃতীয় স্থিতির উৎপত্তি হয়, যেখানে উভয় কণা পূর্বের ন্যায় আকৃতি ও দিক ফিরে পেয়ে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সামনে এগিয়ে যায়। এজন্যই বলা হয়েছে যে এদের পথ সুরক্ষিত থাকে। এই পথ অনন্ত দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সর্বত্র এই নিয়মই কাজ করে।

স্মরণীয় তথ্য

1. যখন বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ রশ্মিগুলো বিভিন্ন প্রাথমিক প্রাণ রশ্মি এবং আকাশ তত্ত্ব দ্বারা সংকুচিত হয়, তখন বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।
2. কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরূপী — এগুলো হল বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ও বিদ্যুৎ আবেশিত তরঙ্গের সাতটি বিভাগ।
3. কিছু ছন্দ ও প্রাণ রশ্মি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের চেয়েও অধিক দ্রুতগামী হয়।
4. বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গে ছন্দ রশ্মিরও সংযোগ থাকে এবং প্রাণাদিরও। ধনঞ্জয় প্রাণের কারণে এদের গতি অত্যন্ত তীব্র হয়।
5. সর্বপ্রথম দুর্বল তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, এরপর তাপ ও আলোক এবং সবশেষে এক্স-রে এবং গামা রশ্মি উৎপন্ন হয়।
6. বিভিন্ন ধরণের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উর্জা অর্থাৎ আবৃত্তি এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে, সেই তরঙ্গগুলোর তরঙ্গাণু কোন ছন্দ-রশ্মির সংকোচনের ফলে উৎপন্ন হয়েছে।

7. ব্রহ্মাণ্ডে সঞ্চারিত তরঙ্গ বা কণা একটি নির্দিষ্ট এবং সুরক্ষিত পথেই চলাচল করে এবং এই সুরক্ষার কারণ হল — প্রাণযুক্ত সূত্রাত্মা বায়ু।

8. সূত্রাত্মা বায়ুর বেষ্টনীর কারণে, দুটি তরঙ্গাণু একে-অপরকে কখনোই সম্পূর্ণভাবে স্পর্শ করতে পারে না।

9. সূত্রাত্মা বায়ুর বেষ্টনী দুটি তরঙ্গাণুকে যৌথভাবে আচ্ছাদিত করে ফেলে, যার ফলে উভয় তরঙ্গাণুর আকৃতি সংযুক্ত হয়ে কিছু মুহূর্তের জন্য পরিবর্তিত হয়ে যায়, যাকে আধুনিক ভৌতকীর ভাষায় সুপার পজিশন বলা যেতে পারে।

অনুশীলনী

1. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কয়টি বিভাগ আছে ? নামসহ উল্লেখ করুন।

2. সুপার পজিশনের কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বুঝিয়ে লিখুন।

3. সৃষ্টিতে তিনটি অতি দ্রুতগামী পদার্থ কী কী ? ব্যাখ্যা করুন।

4. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের উৎপত্তি কীভাবে হয় ?

5. এদের মধ্যে বিদ্যুৎ আবেশিত কণা বিদ্যুৎ তরঙ্গের কোন বিভাগের অন্তর্গত হয় ?

(অ) করালী (ব) সুলোহিতা

(স) স্ফুলিঙ্গিনী (দ) সুধূম্রবর্ণা

* * * * *

19 অধ্যায়

মহাপ্রলয়

এটি একটি চিরন্তন সত্য যে, যে বস্তুই উৎপন্ন হয়, তার কোনো-না-কোনো সময় বিনাশ অর্থাৎ কারণরূপ পদার্থে লয় অবশ্যই ঘটে। এই সৃষ্টিরও একদিন বিনাশ হবে এবং এটি নিজের মূল উপাদান কারণে বিলীন হয়ে যাবে। এই অধ্যায়ে আমরা এটাই জানবো যে সৃষ্টির বিনাশ কীভাবে হয় ?

এই সৃষ্টিতে বিদ্যমান বর্তমান বিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত মূলকণা, প্রকাশাণু (ফোটন), আকাশ তত্ত্ব এবং ডার্ক পদার্থ প্রায় সম্পূর্ণ সৃষ্টিকাল জুড়ে বিদ্যমান থাকে। কিছু মূল কণা উৎপন্ন বা নষ্ট হতে থাকে, কিন্তু এই প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ সৃষ্টিকাল জুড়ে একইভাবে চলতে থাকে। সম্পূর্ণ সৃষ্টি এগুলো দিয়েই তৈরি হয়, কিন্তু এই তত্ত্বও মন, বাক্, প্রাণাদি পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয় এবং এই কারণ-কার্য (cause and effect) শৃঙ্খলা মূল উপাদান প্রকৃতির স্তরে শেষ হয়। এই ব্রহ্মাণ্ডে সাধারণত সৃজন-বিনাশের চক্র চলতে থাকে। যেমন — নক্ষত্রের বিস্ফোরণ হয়ে পদার্থের ছড়িয়ে পড়া, কোথাও নতুন নক্ষত্রের সৃষ্টি, গ্রহ-উপগ্রহের সৃজন-বিনাশ, বিভিন্ন তথাকথিত মূলকণার উৎপত্তি-প্রলয় আদি ক্রম ক্রমাগত চলতে থাকে। বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী-শরীর, নদী, পর্বত, দ্বীপ আদির সৃজন ও বিনাশ, অণু ও কোষেরও একইভাবে সৃজন-বিনাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সবকিছু হওয়া সত্ত্বেও এই খেলা তথাকথিত মূল কণা, ঊর্জা ও আকাশের অন্তর্গত এগুলোর মধ্যেই এবং এগুলোর মাধ্যমেই চলে। পরিশেষে এই খেলা মহাপ্রলয় কালেই বন্ধ হয়।

19.1 সৃষ্টি-প্রলয়ের প্রবাহমান চক্র

এই সমস্ত ক্রিয়া হল পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি ও প্রলয়েরই ক্ষুদ্র রূপ, যা চক্রের মতো সর্বদা চলতে থাকে। পূর্বে আমরা দুটি কণার আকর্ষণের প্রক্রিয়া বোঝার সময় বিকর্ষণ বলের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। এক সময় এমনও আসে, যখন বিনাশের প্রক্রিয়াই প্রধান থাকে, বিশেষ করে কেবল বিনাশের প্রক্রিয়াই চলতে থাকে। আকর্ষণ বলের ক্ষয় এবং বিকর্ষণ বলের বৃদ্ধি হতে থাকে। অন্যদিকে যখন সৃষ্টির নির্মাণ শুরু হয়, তখন সেই সময় আকর্ষণ বলেরই অস্তিত্ব থাকে, বিকর্ষণ বলের উদয় কিছু সময় পশ্চাৎ হয়। যে গায়ত্রী রশ্মিগুলোর মাধ্যমে আকর্ষণ ও সৃজন কর্মের আলোচনা করা হয়েছে, সেই রশ্মিগুলোই কিছু বিকৃতির সাথে বিনাশ

কর্মকেও উৎপন্ন করে।

19.2 মহাপ্রলয়ের প্রক্রিয়া

অপান রশ্মিগুলো ছন্দ রশ্মি থেকে পৃথক থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রশ্মি ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যখন বিভিন্ন প্রাণ রশ্মিগুলো বিভিন্ন ছন্দ রশ্মি থেকে বিযুক্ত হতে শুরু করে, তখন আসুরী গায়ত্রী ও আসুরী ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ রশ্মির যুগ্মের উৎপত্তি হয়, এর ফলে প্রাণ ও ছন্দ রশ্মিগুলো একে-অপরের থেকে আলাদা হতে থাকে। এর ফলে সমস্ত ছন্দাদি রশ্মিও পরস্পর বিযুক্ত হতে শুরু করে। এর ফলে দৃশ্যমান পদার্থের পতন ঘটে এবং ডার্ক পদার্থ ও ডার্ক এনার্জির বিপুল বৃদ্ধি হতে থাকে। এর কারণ মূল কণা তথা তরঙ্গাণুগুলোর অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে শুরু করে বড়-বড় লোক-লোকান্তরের গঠনে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। ধীরে-ধীরে ওই সমস্ত লোক-লোকান্তর ভেঙে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অণু, এটম এবং তাদের থেকেও সূক্ষ্ম কণা ও তরঙ্গগুলোর প্রকৃতি ও গঠন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শক্তির স্বরূপ ও স্বভাব পরিবর্তিত হতে থাকে, যার ফলে আকর্ষণ ও ধারণ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ধীরে-ধীরে পূর্ণ বিনাশ ঘটে এবং বিকর্ষণ ও প্রক্ষেপক বলের নিরন্তর বৃদ্ধি হতে থাকে।

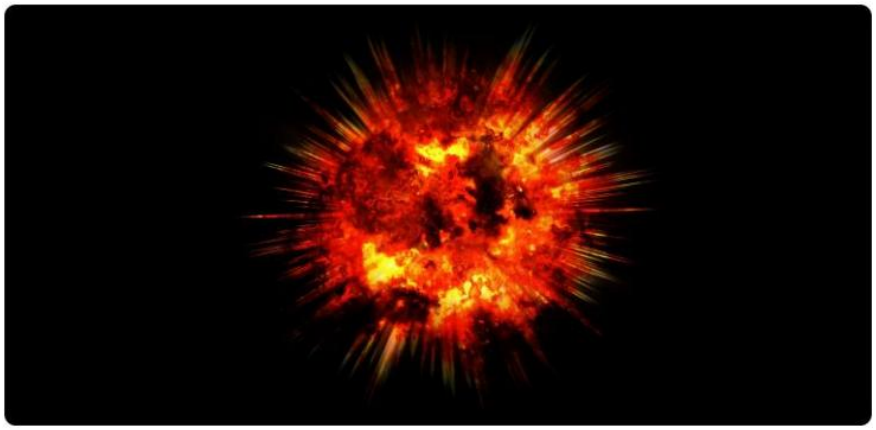

এগুলোর ফলে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ আদি থেকে শুরু করে সূক্ষ্ম কণা পর্যন্ত সমস্ত পদার্থে বিস্ফোরণ ও বিচ্ছুরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরিশেষে, সমগ্র সৃষ্টিতে ডার্ক পদার্থ ও ডার্ক এনার্জির রাজত্ব তৈরি হয়। এর ফলে সমগ্র দৃশ্যমান পদার্থ ছাড়াও সম্পূর্ণ ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জিও নিজেদের মূল উপাদান মনস্তত্ত্বে বিলীন হয়ে যায়।

সম্পূর্ণ সৃষ্টির আয়ুষ্কালে মনস্তত্ত্ব সর্বদা একরস তথা নির্দিষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এতে কোনো হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। মনস্তত্ত্বের একটি বিশাল অংশই সৃষ্টি রচনার প্রক্রিয়াতে ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি, দৃশ্যমান রূপের সমস্ত কণা বা বিকিরণে রূপান্তরিত হয়। সৃষ্টি কালে মনস্তত্ত্ব বিকৃত

হয়ে যেখানে পদার্থের অভাব পূরণ করতে থাকে, সেখানে অতিরিক্ত পদার্থকে নিজের মধ্যে বিলীনও করে নেয়। সৃষ্টির সমস্ত সূক্ষ্মতম কণা থেকে শুরু করে স্থূলতম লোকসমূহ এবং তরঙ্গের নির্মাণ ও বিনাশের কাজ মনস্তত্ত্বের প্রেরণাতে তার অভ্যন্তরেই ক্রমাগত চলতে থাকে। পরিশেষে, এই মনস্তত্ত্বও সমস্ত জড় জগতের সাথে নিজের বা সম্পূর্ণ জড় পদার্থের মূল উপাদান কারণ প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

এই সৃষ্টিতে সৃজন-বিনাশের চক্র সর্বদা চলতে থাকে। বিভিন্ন সংযোগ প্রক্রিয়াকে ডার্ক এনার্জি তার প্রবল বিকর্ষণ বল দ্বারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এই বাধা দূর করার জন্য অনেক রশ্মির উৎপত্তি সর্বদা হতে থাকে। যখন প্রলয়কাল আসে, তখন এই রশ্মিগুলোতে বাধা সৃষ্টি হয়। সেগুলো অনিয়মিতভাবে উৎপন্ন হয়, যার ফলে তাদের সংযোগকারী প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে তারা ডার্ক এনার্জির বাধক প্রভাবকে আর আটকাতে পারে না। এর ফলে আবেশিত কণাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল সমাপ্ত হয়ে যায় অথবা আমরা বলতে পারি যে আবেশও সমাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ উদাসীনতা প্রাপ্ত হয়। বিদ্যুৎ আবেশ যে রশ্মিগুলোর কারণে উৎপন্ন হয়, সেগুলো নিজেদের প্রভাব হারিয়ে ফেলে। এর ফলে বিভিন্ন পদার্থের সৃজন কর্ম সমাপ্ত হয়ে বিনাশের ক্রম শুরু হয়। আবেশিত কণাগুলোর মধ্যবর্তী বল সমাপ্ত করার জন্য সেই রশ্মিগুলোকে বাধা দেওয়া হয়, যা তার উৎপাদনে সহায়ক হয়।

যখন প্রাণ-অপান আদির মধ্যবর্তী কার্যরত বল সমাপ্ত করতে হয়, যখন কোনো তরঙ্গাণু ও ইলেকট্রন আদির মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল অথবা বিভিন্ন কণার মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখার বল সমাপ্ত করতে হয়, যখন কোনো তরঙ্গাণুর নির্গমন ও শোষণের প্রক্রিয়া থামাতে বা সমাপ্ত করতে হয় (এর ফলে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের নিঃসরণ, শোষণ বা গমনাগমন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে অন্ধকারময় অবস্থার সৃষ্টি হয়), যখন ঊর্জার বিকিরণ রূপকে সমাপ্ত করতে হয়, যখন এদের শক্তি (আবৃত্তি) কমিয়ে দিতে হয়, তখন সেই বলগুলোর উৎপাদক গায়ত্রী রশ্মিগুলোকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়। এর ফলে প্রাণ ও অপান অথবা প্রাণ ও উদানের মধ্যে কার্যরত সূত্রাত্মা বায়ু তথা মনস্তত্ত্ব নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, আকাশ তত্ত্ব দুই সংযোগকারী কণার (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) মধ্য থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং বল সমাপ্ত হয়ে যায়। এমনটা হলে সেই রশ্মিগুলোর যে প্রভাবই থাকুক না কেন, তা আর অবশিষ্ট থাকে না।

এই সৃষ্টিতে যখন প্রলয় কাল আসে অথবা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রবল ও ব্যাপক বিনাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তখন এমন কিছু রশ্মি উৎপন্ন হয় যা বিভিন্ন কণার চারদিকে বিদ্যমান বিভিন্ন

ছন্দাদি রশ্মির আবরণকে ধ্বংস বা আলাদা করে দেয়। ডার্ক এনার্জির অত্যধিক প্রক্ষেপক বা বিকর্ষণ বলকে যে রশ্মিগুলো নিয়ন্ত্রণ বা ধ্বংস করে বিভিন্ন প্রকারের সংযোগাদি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সাহায্য করে, এই রশ্মিগুলো সেগুলোকেও ধ্বংস করে দেয়। এর ফলে সমস্ত কণা বা তরঙ্গ অসুরক্ষিত হয়ে ডার্ক এনার্জির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হতে শুরু করে। বিভিন্ন পরমাণু বা মূলকণার আকর্ষণ বল নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, যার ফলে সমস্ত প্রকারের সংযুক্ত কণা বা জগত বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড মূল সাম্যাবস্থায় বিলীন হয়ে যায় অথবা কোথাও ক্ষেত্রীয় স্তরে খণ্ড প্রলয়ের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সুপারনোভা আদির বিস্ফোরণের সময়ও স্বল্প সময়ের জন্য এই রশ্মিগুলোর প্রাধান্য থাকে। এই রশ্মিগুলো অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হয়।

এখানে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে **মহাপ্রলয় বা খণ্ড প্রলয়ের প্রক্রিয়া ঠিক সেইভাবে সুশৃঙ্খল, পর্যায়ক্রমিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, যেভাবে সৃষ্টি নির্মাণের প্রক্রিয়া সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘটে। এই কারণে এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার উপর এক চেতন সত্তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে; এটি কোনো আকস্মিক বা উদ্দেশ্যহীন প্রক্রিয়া নয়।**

স্মরণীয় তথ্য

1. সৃষ্টিতে উৎপন্ন পদার্থ কোনো-না-কোনো সময় তার মূল উপাদানে অবশ্যই বিলীন হয়ে যায়।
2. এমন এক সময় আসে যখন আকর্ষণ বল ক্ষয় হতে শুরু করে এবং বিকর্ষণ বল বৃদ্ধি পেতে থাকে।
3. সৃষ্টি উৎপত্তির সময় শুধুমাত্র আকর্ষ বলেরই অস্তিত্ব থাকে এবং বিকর্ষণ বলের উদয় কিছু সময় পরে হয়।
4. যে গায়ত্রী রশ্মিগুলো আকর্ষণ ও সৃজন কর্ম উৎপন্ন করে, সেই রশ্মিগুলোই কিছু বিকৃতির সাথে বিনাশের কাজও সম্পন্ন করে।
5. অপান রশ্মিগুলো ছন্দ রশ্মি থেকে আলাদা হয়ে গেলে বিভিন্ন রশ্মি ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।
6. সৃষ্টির শেষে মনস্তত্ত্ব-ও তার মূল উপাদান কারণ প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যায়।

7. যখন প্রলয়কাল আসে, তখন রশ্মিগুলোতে বাধার সৃষ্টি হয়। সেগুলো বিশৃঙ্খলভাবে উৎপন্ন হতে থাকে। এই কারণে —

i. সেগুলো ডার্ক এনার্জির বাধক প্রভাবকে আটকাতে পারে না।

ii. আবেশিত কণাগুলোর মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল শেষ হয়ে যায়।

iii. আবেশ সমাপ্ত হয় অথবা উদাসীনতা প্রাপ্ত হয়।

iv. যে রশ্মিগুলোর কারণে বিদ্যুৎ আবেশ উৎপন্ন হয়, সেগুলো তাদের প্রভাব হারিয়ে ফেলে।

8. বিভিন্ন বলের উৎপাদিকা গায়ত্রী রশ্মিগুলোকে তছনছ বা বিশৃঙ্খল করে দেওয়া হয়। এর ফলে বলগুলো সমাপ্ত হয়ে যায়।

9. সুপারনোভা আদির বিস্ফোরণের সময় অল্প সময়ের জন্য ধ্বংসাত্মক রশ্মির প্রাধান্য থাকে।

10. মহাপ্রলয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘটে, এটি কোনো উদ্দেশ্যহীন প্রক্রিয়া নয়।

অনুশীলনী

1. প্রলয় বলতে আপনি কী বোঝেন ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
2. সৃষ্টির বিভিন্ন কণাগুলোর মধ্যে বল সমাপ্ত করার প্রক্রিয়াটি কী ?
3. আবেশিত কণাগুলোর মধ্যে বল কীভাবে শেষ হয়ে যায় ?
4. প্রলয়কালে অসুর পদার্থ বা অসুর ঊর্জার ভূমিকা কী থাকে ?

* * * * *

ঈশ্বর (চেতন তত্ত্ব) সচ্চিদানন্দস্বরূপ,
নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু,
অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম,
সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী,
অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র এবং
সৃষ্টিকর্তা হন, তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য।

— মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

আধুনিক বিজ্ঞান এবং বৈদিক বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

ক্র.	আধুনিক বিজ্ঞান	বৈদিক বিজ্ঞান
1.	এটি প্রায় 400 বছর পূর্বে শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে এটি চরম পর্যায়ে আছে।	এটি সৃষ্টির শুরু থেকে শুরু হয়ে মহাভারত পর্যন্ত (প্রায় 5000 বছর আগে) পূর্ণ বিকশিত ছিল, পরে ধীরে-ধীরে হ্রাস পায় এবং বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে।
2.	প্রথমে অনুমানের ভিত্তিতে প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তারপর সৃষ্টিকে জানার চেষ্টা করা হয়।	বৈদিক বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম ঊহা, তর্ক এবং সমাধির শক্তিতে সৃষ্টিকে পূর্ণরূপে জানা হয়, তারপর প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়।
3.	আধুনিক বিজ্ঞান তার পরীক্ষামূলক সম্পদের নির্দিষ্ট সীমার বাইরের বিজ্ঞানকে জানতে অসমর্থ।	বৈদিক বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং স্থূল থেকে স্থূলতর পদার্থ সম্পর্কে কোনো সীমা ছাড়াই জানা সম্ভব।
4.	আধুনিক বিজ্ঞানে পদার্থকে পূর্ণরূপে না জেনেই প্রযুক্তি তৈরি করার কারণে কিছু-না-কিছু দুষ্প্রভাব অবশ্যই থাকে।	বৈদিক বিজ্ঞানে পদার্থের গভীর জ্ঞান থাকার কারণে এর উপর ভিত্তি করে তৈরি প্রযুক্তি দুষ্প্রভাব মুক্ত থাকে।
5.	আধুনিক বিজ্ঞান কেবল জড় পদার্থের জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।	বৈদিক বিজ্ঞানের দ্বারা জড় ও চেতন — উভয় প্রকার পদার্থের জ্ঞান লাভ করা যায়।
6.	আধুনিক বিজ্ঞান একতরফা হওয়ার কারণে মানুষকে ভোগবাদী পশুতে পরিণত করে।	বৈদিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় বিষয়ের শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে মানুষ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য জেনে বিশ্বের কল্যাণ করতে পারে।
7.	আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য কোটি - কোটি ডলারের প্রয়োজন হয়।	বৈদিক বিজ্ঞানের জন্য শুদ্ধ এবং পবিত্র অন্তঃকরণের প্রয়োজন হয়।
8.	আধুনিক বিজ্ঞান কেবল 'কীভাবে' প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।	বৈদিক বিজ্ঞান 'কীভাবে'-এর পাশাপাশি 'কেন', 'কার জন্য' এবং 'কে' — এই প্রশ্নগুলোরও উত্তর দেয়।
9.	আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক সমস্যার সাথে কোনো যোগসূত্র নেই।	বৈদিক বিজ্ঞান এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম।
10.	আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।	বৈদিক বিজ্ঞানের মাধ্যমেই বর্তমান পৃথিবীকে রক্ষা করা সম্ভব।

আমি বৈদিক ভৌতিকীর পুনরুত্থানের মতো মহান উদ্দেশ্যের জন্য কীভাবে সহায়তা করতে পারি?

1. **সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করে** — আমাদের পোস্ট, ভিডিও বা লেখ আদিকে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে অধিক মাত্রায় প্রচারিত করতে পারেন।
2. **স্বয়ং আর্থিক সহায়তা করে এবং অন্যকে দিয়ে করিয়ে** — আপনি আপনার সামর্থ্য অনুসারে এবং ন্যাসের অনৈতিক ব্যবসা থেকে অর্জিত ধন না নেওয়ার শর্তকে মাথায় রেখে দান করতে পারেন আর নিজের আত্মীয় পরিজনদেরও এই রাষ্ট্রীয় এবং বৈদিক যজ্ঞতে আহুতি দেওয়ার জন্য প্রেরিত করতে পারেন।
3. **আমাদের সাহিত্যের প্রচার করে** — আপনি পূজ্য আচার্য শ্রীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকগুলো অধিক মাত্রায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।
4. **বৈদিক ভৌতিকীর উপর কার্যক্রম আয়োজিত করিয়ে** — আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক করে আপনার নিকটবর্তী অতি প্রবুদ্ধ, বিশেষ করে বিজ্ঞানের উচ্চস্তরীয় ছাত্রদের মাঝে কার্যক্রম করাতে পারেন।
5. **সোশ্যাল মিডিয়া, পত্রিকা আদিতে আমাদের কর্মের উপর লিখন লিখে অথবা ভিডিও বানিয়ে** — আমাদের কাজকে সঠিকভাবে জেনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরল ভাষাতে জনসাধারণের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং পত্রিকা আদিতে লিখন লিখতে পারেন অথবা ভিডিও বানাতে পারেন।
6. **বৌদ্ধিক সহায়তা দিয়ে** — নতুন মৌলিক অনুসন্ধানের সংবাদ বা আমাদের অনুসন্ধানের কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মেল দ্বারা আপনার পরামর্শ আমাদের পাঠাতে পারেন।
7. **সরকারি সহায়তার জন্য চেষ্টা করে** – আমাদের কাজের সংবাদ ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে এই কাজের জন্য সেখান থেকে সহায়তা আর সংরক্ষণের নিবেদন করতে পারেন।
8. **বেদবিজ্ঞানের অন্তিম লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছে** — ভারত আর বিশ্বকে বেদোক্ত আদর্শে চালিয়ে সম্পূর্ণ মানবজাতির সাথে-সাথে প্রাণীমাত্রের কল্যাণের জন্য নিজের জীবনের দোষগুলোকে ত্যাগ করে আর শুভকর্মকে গ্রহণ করে।

9. **বৈদিক ভৌতিকীর উপর টেকনিক এবং গণিতের বিকাশ করে** — বৈদিক সৈদ্ধান্তিক ভৌতিকীকে জনোপয়োগী বানানোর জন্য এর আধারে টেকনিক এবং গণিতের বিকাশ করার চেষ্টা করে।

10. **বেদবিরোধী অথবা জিজ্ঞাসুদের উত্তর দিয়ে** — আপনি যাকিছু এ পর্যন্ত জেনেছেন, তার আধারে বেদাদি শাস্ত্রের উপর হতে চলা মিথ্যা আক্ষেপ অথবা বাস্তবিক জিজ্ঞাসুদের উত্তর দিয়ে আচার্য শ্রীর বহুমূল্য সময় বাঁচাতে পারেন।

* * * * *

বিনম্র নিবেদন

মান্যবর! আশা করি, আপনি আচার্যজীর কাজ আর গুরুত্বকে ভালো ভাবে জেনে গেছেন। যদি আপনার হৃদয় আর মস্তিষ্ক বেদের এই অপূর্ব কাজের জন্য উৎসুক হয়েছে আর আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে চান, তাহলে আপনি আমাদের যজ্ঞতে নিম্ন প্রকারে সহযোগী হতে পারেন —

1. প্রতিবর্ষ ন্যূনতম 12,000/- টাকা দান করে ট্রাস্টের সহযোগী সংরক্ষক হতে পারেন অথবা একবার ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা দান করে আজীবন সহযোগী সংরক্ষক হতে পারেন।
2. প্রতিবর্ষ ন্যূনতম 6,000/- টাকা দিয়ে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হতে পারেন অথবা একসাথে ন্যূনতম 50,000/- টাকা দিয়ে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হতে পারেন।
3. বার্ষিক ন্যূনতম 1,000/- টাকা দিতে থেকে সহযোগী সদস্য হতে পারেন।

নোট — উপরোক্ত সকল সহযোগী মহানুভাবকে ন্যাসের সি.এ. দ্বারা করা বার্ষিক ওডিট রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যে মহানুভাব স্বয়ং দান করতে পাবেন না, সেই মহানুভাব অন্যদের প্রেরিত করে অন্ততঃ 8 সদস্য আদি বানিয়ে স্বয়ং নিঃশুল্ক সেই শ্রেণীর সদস্য বা সহযোগী সংরক্ষক আদি হতে পারেন।

4. বয়োবৃদ্ধ বিদ্বান, সন্ন্যাসী, সাধু, মহান বৈজ্ঞানিক মহানুভাব নিজেদের আশীর্বাদ তথা বৌদ্ধিক সহায়তা দিতে পারেন।
5. বিদ্যার্থী, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী আদি নিজেদের পবিত্র আহুতি শ্রদ্ধা ও সামর্থ্য অনুসারে প্রদান করতে পারেন।

* * * * *

বিশেষ নিবেদন

এই কাজ অত্যন্ত পবিত্র, এই কারণে আচার্য শ্রীর ভাবনানুসারে বিনম্র নিবেদন যে, যাদের আজীবিকা কোনো ধরণের হিংসা, চুরি, চোরাচালান, অশ্লীলতাবর্ধক সাধন, নেশা জাতীয় বস্তুর বিক্রি, প্রতারণা, শোষণ আদির উপর নির্ভর করে তথা যে সকল নির্ধন ভাই নিজের সামর্থ্যের অধিক (অথবা নিজের পরিবারের ক্লেশ করে) দান দিতে চাইছেন, এমন মহানুভাবদের সদ্ভাবনার ধন্যবাদ করেও আমরা তাদের দান নিতে সক্ষম নই। দয়া করে এমন করার চেষ্টা করে আমাদের লজ্জিত করবেন না। তবে হ্যাঁ, যে বন্ধু এমন কাজকে ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে জুড়তে চান, তাহলে তাদের সাদর আমন্ত্রন জানাই। সংস্থানের সঞ্চালন হেতু দয়া করে এই দুটো খাতায় দান করতে পারেন —

Bank Name	**Punjab National Bank**
A/c Holder	Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	4474000100005849
Branch	Bhinmal
IFS Code	PUNB0447400

অথবা

Bank Name	**State Bank of India**
A/c Holder	Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	61001839825
Branch	Khari Road, Bhinmal
IFS Code	SBIN0031180

জ্ঞাতব্য হল, বৈদিক বিজ্ঞানের অগ্রিম এবং উচ্চ স্তরীয় বিশাল শোধ সংস্থান হেতু 30 বিঘা ভূমি সিরোহী (রাজস্থান) নগর থেকে রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ–62 থেকে প্রায় সোয়া কি.মি. দূর পালড়ী (এম) রাজস্ব গ্রামের মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে। এই সংস্থানের নির্মাণের আনুমানিক বাজেট হল 10 কোটি টাকা। যে মহানুভাব এই মহান যজ্ঞতে নিজের পবিত্র আহুতি (বড় রাশি) দিতে ইচ্ছুক, তারা নিম্ন লিখিত খাতায় ধন দান করতে পারেন।

Bank Name	Axis Bank
A/c Holder	Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	921010017739651
Branch	Bhinmal
IFS Code	UTIB0003757

আপনি আপনার চেক/ড্রাফ্ট/ধনাদেশ, **‘শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস’** PAN No. AAATV7229A এর নাম (কেবল খাতায় দিবেন) দেওয়ার কষ্ট করবেন, তার সঙ্গে দয়া করে নিজের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখে অবশ্যই পাঠিয়ে দিবেন। আপনি অনলাইনেও ধন জমা করতে পারেন, কিন্তু এমন করা মহানুভাব নিজের নাম ও ঠিকানা দুর্ভাষ দ্বারা তৎকাল সূচিত করার কষ্ট করবেন যাতে সঠিক সময়ে রশিদ পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে, অন্যথা আমাদের অনেক কঠিন হয়ে যায়।

নোট — ন্যাসকে দেওয়া দান আয়কর অধিনিয়ম 1961 ধারা 80–জি অন্তর্গত কর মুক্ত আছে।

* * * * *

The Ved Science Publication

We are dedicated to the publication, promotion and sale of texts covering Vaidic knowledge and Science

Available on

- Amazon
- thevedscience.com

FREE Home Delivery

Flat 50% OFF on
Ved Vigyan Alok

For more info call us :
+ 9530363300

Order Now

Free Delivery (above ₹500)	Payment Options	Customer Support
Delivery happens within 5-10 days	Online Payment	thevedscience@gmail.com

পরিচয়
বৈদিক ভৌতিকী
(বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ গ্রন্থের সার)

এই বইটি সেইসব পাঠকদের জন্য যারা 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' নামক বিশাল গ্রন্থটি কিনতে, পড়তে বা বুঝতে অসমর্থ অথবা যারা আগে সেই গ্রন্থের সারসংক্ষেপ বুঝতে চান; তাঁরা এই বইটির মাধ্যমে 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ'-এর বিজ্ঞানকে সারসংক্ষেপ রূপে বুঝতে পারবেন।

এই বইটি সেইসব গবেষকদের জন্য যারা আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানের গভীর ও অমীমাংসিত সমস্যাগুলো বোঝেন এবং সেগুলো সমাধানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি আধুনিক ভৌতিক বিজ্ঞানকে এক নতুন বৈপ্লবিক ও নিরাপদ দিশা দিতে চান।

এই বইটি সেইসব পাঠকদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ যারা প্রাচীন সনাতন বৈদিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর পরিচয় পেতে চান এবং বিশ্বের মধ্যে বেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চান।

শ্রী বিশাল আর্য 1991 সালে মুজাফফরনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রী চৌধুরী যশবীর সিংহ আর্য এবং মাতা শ্রীমতী গীতা আর্যা। তিনি বৈদিক বিজ্ঞানী পূজ্য আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিকের শিষ্য এবং বর্তমানে 'বৈদিক ও আধুনিক ভৌতিকী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে' উপাচার্য পদে প্রায় পাঁচ বছর ধরে কর্মরত আছেন। সেখানে তিনি বৈদিক ভৌতিকীর উপর গবেষণা করছেন এবং নিজের প্রাচীন বিজ্ঞান, যা বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে আচার্য শ্রী-কে সহায়তা করছেন। তাঁর উচ্চশিক্ষা ভারতের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হয়েছে, যেখান থেকে তিনি অত্যন্ত কঠিন বিষয়সহ তাত্ত্বিক ভৌতিকীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি GATE এবং JEST-এর মতো রাষ্ট্রীয় স্তরের পরীক্ষায় ভালো পদ নিয়ে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু আচার্য শ্রী-র কিছু ভিডিও দেখার পর তিনি ভারতের প্রসিদ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে PhD-র সুযোগ ত্যাগ করে বৈদিক ভৌতিকীর ক্ষেত্রে কাজ করার সংকল্প নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ সমর্পণের সাথে যুক্ত হন। তিনি ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর 2800 পৃষ্ঠার বৈজ্ঞানিক ভাষ্য (বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ)-এর সম্পাদনা ও ডিজাইনিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তিনি স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত পরিশ্রমী, ধনের মোহমুক্ত, বেদ-রাষ্ট্র-ঋষিভক্ত, গুরুভক্ত এবং বিদ্যা অনুরাগী এক যুবক। আচার্য শ্রী তাঁর উপর অনেক আশা রাখেন।

— প্রকাশক

দ্য বেদ সায়েন্স পাবলিকেশন

ISBN 978-81-950133-9-1